সিরিজ ॥
নারীর ফাঁদ-২
ঐতিহাসিক উপন্যাস
ঈমানদীপ্ত দাস্তান
আলতামাস

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

২

নারীর ফাঁদ-২

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

আলতামাস

অনুবাদ
মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

আবাবীল পাবলিকেশন্স

নারীর ফাঁদ-২
ঈমানদীপ্ত দাস্তান
আলতামাস

প্রকাশক
মাওলানা আবদুল করীম
চেয়ারম্যান, আবাবীল পাবলিকেশন্স
১৩/১, কারকুন বাড়ী লেন, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ
জুলাই-২০০১
তৃতীয় প্রকাশ (সংশোধিত ও পরিমার্জিত)
জুলাই-২০০৩

কম্পিউটার মেকআপ
মুজাহিদ গওহার
জি গ্রাফ কম্পিউটার, ঢাকা

মুদ্রণ
কালার সিটি

গ্রাফিক্স
কালার ক্রিয়েশন

মূল্য ঃ একশত টাকা মাত্র

IMANDIPTO DASTAN-2 : BY ALTAMAS. PUBLISHED BY MAULANA ABDUL KARIM, ABABIL PUBLICATIONS, 13/1, KARKONBARI LANE, DHAKA-1100. 1ST EDITION : JULY 2001, 3RD EDITION JULY 2003

PRICE : TAKA 100.00 ONLY

প্রকাশকের কথা

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর শাসনকাল। পৃথিবী থেকে–বিশেষতঃ মিসর থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলে ক্রুশ প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃস্টানরা। তারা সালতানাতে ইসলামিয়ার উপর নানামুখী সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনার পাশাপাশি বেছে নেয় নানারকম কুটিল ষড়যন্ত্রের পথ। গুপ্তচরবৃত্তি, নাশকতা ও চরিত্র-বিধ্বংসী ভয়াবহ অভিযানে মেতে উঠে তারা। মুসলমানদের নৈতিক শক্তি ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যে তারা ব্যবহার করে অর্থ, মদ আর ছলনাময়ী রূপসী মেয়েদের। তারা সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে একদল ঈমান-বিক্রেতা গাদ্দার তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়।

ইসলামের মহান বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী পরম বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, দুঃসাহসিকতা ও অনুপম চরিত্র মাধুরী দিয়ে সেইসব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে ছিনিয়ে আনেন বিজয়।

সুলতান আইউবী ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে অস্ত্র হাতে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ লড়েছিলেন, খৃস্টানরা মুসলমানদের উপর যে অস্ত্রের আঘাত হেনেছিল, ইতিহাসে 'ক্রুসেড যুদ্ধ' নামে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সালতানাতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত খৃস্টানদের নাশকতা, গুপ্তহত্যা ও ছলনাময়ী রূপসী নারীদের লেলিয়ে দিয়ে মুসলিম শাসক ও আমীরদের ঈমান ক্রয়ের হীন ষড়যন্ত্র এবং সুলতান আইউবীর তার মোকাবেলা করার কাহিনী এড়িয়ে গেছেন অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ। সেইসব অকথিত কাহিনী ও সুলতান আইউবীর দুঃসাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী নিয়ে রচিত হল সিরিজ উপন্যাস 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'।

বইটির মূল লেখক পাকিস্তানের প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ্ আলতামাস। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত মূল বইটির নাম 'দাস্তান ঈমান ফোরোশূ কী'। আল্লাহ তাআলার পরম অনুগ্রহে অন্তত ৭-৮ খণ্ডে সমাপ্য অনূদিত সিরিজ উপন্যাস 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'-এর এটি দ্বিতীয় খণ্ড। একে একে অপর খণ্ডগুলোও যাতে আমরা যথাসময়ে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারি, আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করেন।

ভয়াবহ সংঘাত, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও সুলতান আইউবীর ঈমানদীপ্ত কাহিনীতে ভরপুর এই সিরিজ বইটি ঘুমন্ত মুমিনের ঝিমিয়েপড়া ঈমানী চেতনাকে উজ্জীবিত ও শাণিত করে তুলতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পাশাপাশি বইটি পূর্ণমাত্রায় উপন্যাসের স্বাদও যোগাবে। আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

বিনীত
মাওলানা আবদুল করীম
চেয়ারম্যান
আবাবীল পাবলিকেশন্স

সূচীপত্রঃ

বিষ

১১৭১ সালের ঘটনা।

কায়রোর একটি মসজিদ। মসজিদটি বেশী বড়ও নয়, তেমন ছোটও নয়। জুমার জামাত অনুষ্ঠিত না হলেও পাঞ্জেগানা জামাতে মুসল্লি হয় প্রচুর।

শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত এ মসজিদ-এলাকায় বাস করে মধ্যম ও নিম্নবিত্তের মানুষ। ধর্মের প্রতি এখনো তারা বেশ অনুরাগী। আবেগপূর্ণ আকর্ষণীয় কথায় সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তবে তারা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী মিসর এসে যেসব নতুন সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন, তাতে এই এলাকার লোকেরাই ভর্তি হয়েছিল বেশী। তার কারণ ছিল দু'টি। প্রথমতঃ এটি জীবিকা নির্বাহের একটি মাধ্যম। সালাহুদ্দীন আইউবী তার সৈন্যদের আকর্ষণীয় বেতন-ভাতা ও নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতেন। দ্বিতীয়তঃ জিহাদ যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ আমল, তা তাদের ভাল করেই জানা ছিল। ইসলামের জন্য জীবন দিতে তারা প্রস্তুত থাকত সর্বক্ষণ। সে যুগে তাদের মত চেতনাসম্পন্ন মর্দে মুমিনের প্রয়োজন ছিল অপরিসীম। সরকারীভাবে তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছিল, খৃষ্টজগত ইসলামী দুনিয়ার নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে মাঠে নেমেছে। বীর বিক্রমে তাদের মোকাবেলা করে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে। অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে জিহাদের ময়দানে।

ছয়-সাত মাস হল, অখ্যাত এ মসজিদটির সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিক। এই খ্যাতির কারণ নতুন ইমাম, যিনি প্রতিদিন ঈশার নামাযের পর আকর্ষণীয় দরস প্রদান করছেন।

আগের ইমাম তিনদিন আগে মারা গেছেন। তিনি দুঃসহ পেটব্যাথা আর অম্ল জ্বালায় ভুগছিলেন। অভিজ্ঞ ডাক্তার-হেকিম কেউ-ই তার এ রোগের কারণ উদ্ঘাটন করতে পারেননি। অবশেষে এ রোগেই তিনি মারা যান। তিনি একজন সাধারণ মৌলভী ছিলেন। শুধু পাঞ্জেগানা জামাতের ইমামতি করতেন। এর অতিরিক্ত কোন যোগ্যতা তার ছিল না।

ইমামের মৃত্যুর ঠিক আগের দিন অচেনা এক মৌলভী এসে হাজির হন মসজিদে। লোকটির গৌরবর্ণ চেহারা। সুঠাম দেহ। মুখজোড়া ঘন লম্বা দাড়ি। সঙ্গে আপাদমস্তক

কালো বোরকায় আবৃতা দু'জন মহিলা। সম্পর্কে তার স্ত্রী। দুই স্ত্রী নিয়ে তিনি এতদিন কোন এক ঝুপড়িতে বাস করতেন।

আলাপ-পরিচয়ের পর আগন্তুক অত্র মসজিদের ইমামতির দায়িত্ব পালন করার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বেতন-ভাতার প্রয়োজন নেই। মুসল্লিদের খাতির-সমাদরও তার নিষ্প্রয়োজন। কারো হাদিয়া-নজরানাও গ্রহণ করবেন না। প্রয়োজন শুধু মানসম্পন্ন প্রশস্ত একটি বাসস্থান, যেন তিনি সেখানে দুই স্ত্রীসহ সম্মান ও পর্দার সাথে বাস করতে পারেন।

মুসল্লিরা তার প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করে নেয়। তারা মসজিদের সন্নিকটে একাধিক কক্ষবিশিষ্ট একটি বাড়িও তাকে খালি করে দেয়। দুই স্ত্রীকে নিয়ে সেই বাড়িতে এসে উঠেন নতুন ইমাম। স্ত্রী দু'জন কালো বোরকায় আবৃতা। হাতে-পায়ে কালো মোটা মোজা। দেহের কোন অংশ পর-পুরুষের চোখে পড়ার জো নেই। এমন পর্দানশীল মহিলা এ যুগে কমই চোখে পড়ে। মুসল্লিরা ঘরের জরুরী আসবাব-পত্রের ব্যবস্থাও করে দেয়। বাহ্যিক আচার-আচরণ দেখে তাদের মনে নতুন ইমামের প্রতি বেশ শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে একজন যোগ্য ইমাম পেয়ে গেছি, এই তাদের বিশ্বাস।

প্রথমবারের মত মিনারে দাঁড়িয়ে আযান দেন নতুন ইমাম। সে কি যাদুমাখা সুরেলা কণ্ঠ! যতদূর পর্যন্ত তার আযানের আওয়াজ পৌছে, সর্বত্র যেন নেমে আসে এক স্বর্গীয় নিস্তব্ধতা। গোটা প্রকৃতিকে মাতাল করে তুলছে যেন তার আযানের মধুর আওয়াজ। তার যাদুময় আযানের চুম্বকার্ষণে তারাও মসজিদপানে ছুটে আসে, ইতিপূর্বে যারা নামায পড়ত ঘরে, কিংবা আদৌ নামাযে অভ্যস্থ ছিল না।

প্রথম রাতেই তিনি ঈশার নামাযের পর মসজিদে দর্‌স প্রদান করেন। পরে ঘোষণা দেন যে, এভাবে প্রতি রাতেই তিনি দর্‌স প্রদান করবেন। নতুন ইমামের বয়ান শুনে মুসল্লিরা বেজায় খুশি।

ছয়-সাত মাস সময়ে নতুন ইমাম মুসল্লিদেরকে তার নিবেদিতপ্রাণ ভক্তে পরিণত করেন। অনেকে তার মুরীদও হয়ে যায়।

কায়রোর সেই মসজিদে এতকাল জুমার নামায অনুষ্ঠিত হত না। নতুন ইমাম এবার জুমার নামাযও চালু করেন।

দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সেই অখ্যাত মসজিদ এবং নতুন ইমামের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। শহর থেকেও কিছু লোক ইমামের দর্‌সে যোগ দিতে শুরু করে।

ইমাম ইসলামের যে দু'টি মৌলিক বিষয়ের উপর জোরালো বক্তব্য দিতেন, তাহল, ইবাদত ও সম্প্রীতি। দর্‌সে তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহের বিপক্ষে সবক দিতেন। মানুষের চিন্তা-চেতনায় তিনি এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেন যে, মানুষের ভাল-মন্দ

সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে। ভাগ্য পরিবর্তনে মানুষের কোন দখল নেই। মানুষ দুর্বল প্রকৃতির একটি প্রাণী মাত্র।

বড় ক্রিয়াশীল ইমামের বয়ান। তিনি কুরআন হাতে নিয়ে বয়ান করতেন। যে কোন বিষয়ে বয়ান করার সময় কুরআনের কোন না কোন আয়াত বের করে তার আলোকে বিষয়টি বিস্তারিত বুঝিয়ে দিতেন। তিনি সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর ভূয়সী প্রশংসা করতেন। প্রায় সময়-ই তিনি বলতেন, মিসরের বড় খোশনসীব যে, সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর মত এক মহান নেতা তার রাজত্ব করছেন।

ইমাম জিহাদের এমন দর্শন ও ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যা সেখানকার লোকদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন। তবু বিনা বাক্যব্যয়ে অবলীলায় তারা তার সেই ব্যাখ্যা মেনে নেয়।

এক রাতে ইশার নামাযের পর ইমাম দর্স দিচ্ছেন। হঠাৎ এক কোণ থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'মুহতারাম! আল্লাহ আপনাকে কবুল করুন। আপনার বিদ্যার আলো জিন-পরী এবং আমরা চোখে দেখি না এমন মাখলুক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিন। আমরা আট বন্ধু বহু দূর থেকে আপনার মূল্যবান বয়ান শুনতে এসেছি। এসেছি আপনার সুনাম-সুখ্যাতি শুনে। যদি গোস্তাখী না হয় এবং যদি আপনি বিরক্তিবোধ না করেন, তাহলে আমাদেরকে জিহাদ সম্পর্কে আরো কিছু বলুন। জিহাদের ব্যাপারে আমরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছি। মানুষ বলছে, জিহাদ সম্পর্কে নাকি আমাদেরকে ভুল ধারণা দেয়া হচ্ছে।'

মসজিদের বিভিন্ন স্থান থেকে আরো সাতটি কণ্ঠ সমস্বরে বলে উঠে, 'আমরা এমন ওয়াজ জীবনে আর কখনো শুনিনি। দয়া করে আপনি আরো বলুন। জিহাদ বিষয়টি আমাদের খোলাসা করে বুঝিয়ে দিন।

'মহামান্য ইমাম যা বললেন, তা-ই নির্ভুল এবং সময়োপযোগী বক্তব্য। অন্যরা আমাদেরকে বিকৃত ধারণা দিয়ে বিভ্রান্ত করেছে। আমরা সঠিক বক্তব্য শুনতে চাই।' বলল একজন।

ইমাম বললেন, এটি কুরআনের আওয়াজ। ইনশাআল্লাহ, কেউ একে বিকৃত করতে পারবে না। যা সত্য, যা সঠিক, তা আমি বলব-ই। প্রয়োজনে একই কথা হাজার বার বলতে হলেও আমি তা প্রতিটি মানুষের কানে পৌঁছিয়ে দেব। অন্যের ভূখন্ড দখল করার উদ্দেশ্যে মানুষ খুন করার নাম জিহাদ নয়। জিহাদ অর্থ হত্যা-লুণ্ঠন বা খুন-খারাবীও নয়।

ইমাম কুরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করে তার এরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন–

'আমার নিজের কথা নয়– স্বয়ং আল্লাহই বলেছেন যে, তোমরা পাপাচারের বিরুদ্ধে লড়াই কর। এর-ই নাম জিহাদ। এই জিহাদ-ই আমাদের সকলের উপর

ফরজ। কেন, আপনারা কি শুনেননি যে, ইসলাম তরবারীর জোরে নয়- মমতার জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? জিহাদের রূপ বিকৃত হয়েছে পরে। আর তা করেছে রাজা-বাদশাহদের তল্পিবাহক আলেমরা। আজ খৃষ্টানরা যেমন অন্যের দেশ দখল করে নিজেদের সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করার জন্য লড়াই করাকে 'ক্রুসেড' বলছে, তেমনি মুসলমানরাও একই উদ্দেশ্যে হত্যা-লুণ্ঠন করাকে 'জিহাদ' আখ্যা দিচ্ছে। মূলতঃ এ-সব ক্ষমতা দখলের একটি কৌশল মাত্র। নিরীহ জনসাধারণকে ধর্মের নামে উত্তেজিত করে যুদ্ধে নামিয়ে রাজা-বাদশাহরা তাদের ক্ষমতার ভিত্তি পাকাপোক্ত করছে মাত্র। আমি জাতিকে এই অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে চাই।'

'তবে কি মিসরের আমীর সালাহুদ্দীন আইয়ুবী আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে যুদ্ধে নামিয়েছেন?' প্রশ্ন করলেন একজন।

'না, সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। বড়রা তাকে যা করতে বলেছে, একজন খাঁটি মুসলমানের ন্যায় সম্পূর্ণ নেক নিয়তে তিনি তার-ই উপর আমল করছেন। তার অন্তরে খৃষ্টানদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা হয়েছে, তিনি সে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করছেন। আচ্ছা, খৃষ্টান আর মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য কী? দু'জনের নবী তো অভিন্ন! পরে না কিছুটা ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ) যেমন ভালবাসা ও শান্তির পয়গাম নিয়ে এসেছিলেন, তেমনি আমাদের রাসূল (সাঃ)-ও তো প্রেম-ভালবাসার পয়গাম দিয়ে গেছেন! তাহলে এই তরবারীগুলো আসল কোত্থেকে? আল্লাহ্র এই প্রিয় ভূমিতে– যেখানে একমাত্র তাঁর-ই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকার কথা– সেখানে যারা আপন প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা করতে এবং আল্লাহ্র বান্দাদেরকে নিজেদের গোলামে পরিণত করতে চায়, এসব তাদের-ই আবিষ্কার। আমি মিসরের আমীরের দরবারে যাব। তার সামনে জিহাদের সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরব। তিনি অবশ্য সঠিক জিহাদের কার্যক্রম শুরু করেও দিয়েছেন। তা হলো, অজ্ঞতার বিরুদ্ধে জিহাদ। জুমার খোতবা থেকে খলীফার নাম তুলে দিয়ে তিনি বিরাট জিহাদ করেছেন। মাদ্রাসা খুলেও তিনি জিহাদ করেছেন। তবে মাদ্রাসাগুলোয় ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি সামরিক প্রশিক্ষণ চালু করে তিনি ভাল করেননি। কোমলমতি শিশুদেরকে তিনি আল্লাহ্র নামে লুট-তরাজের সবক দিচ্ছেন। তার মাদ্রাসাগুলোতে অসি চালনা আর তীরান্দাজির প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আপনি যদি আপনার সন্তানের হাতে তরবারী আর তীর-ধনুক তুলে দেন, তাহলে তাদেরকে একথাও বলতে হবে যে, এর দ্বারা তুমি অমুককে খুন করে আস। কিছু লোককে দেখিয়ে আপনাকে বলতে হবে, অমুক তোমার দুশমন, তাকে হত্যা কর।'

ইমামের কণ্ঠে এত প্রভাব আর প্রমাণ-উপস্থাপনায় এত আকর্ষণ যে, তার বক্তব্য শুনে শ্রোতারা অভিভূত হয়ে পড়ে। তিনি বললেন–

'আপন সন্তানদেরকে তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। নতুবা তাদের সঙ্গে তোমাদেরও জাহান্নামে যেতে হবে। কারণ, সন্তানদেরকে ভুল পথে তুলে দেয়ার জন্য তোমরাও দায়ী। তোমাদের রাজা-বাদশাহ আর সেনাপতিরা তোমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। নিবেন সেই আলেমে দ্বীন, যাঁর হাতে ধর্ম ও ইলমের প্রদীপ। দুনিয়ার জীবনে যদি তোমরা আলেমের পিছনে চল, তাহলে কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। কিয়ামতের দিন যার হাত মানুষের রক্তে রঞ্জিত থাকবে, হাজারো নেক আমল এবং নামায-রোযা ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

আরো একটি সূক্ষ্ম কথা বুঝে নাও। তোমরা যাকাত দাও কাকে? বাইতুল মালকে তো? যখন যিনি দেশের শাসক থাকেন, বাইতুল মালের মালিক হন তিনি। আর যাকাত হল গরীব-অসহায়ের হক। শাসক তো গরীব হন না। বাইতুল মালে তোমরা যে যাকাত জমা দাও, তা দ্বারা ঘোড়া আর অস্ত্র ক্রয় করা হয়। অস্ত্রের কাজ হল মানুষ ধ্বংস করা। তার মানে, যে ফরজ আদায় করে তোমরা জান্নাতে যেতে পারতে, সেই ফরজ আদায় করে তোমরা জাহান্নামে ঠিকানা করে নিচ্ছ। তাই বলছি, তোমরা যাকাত আর বাইতুল মালে দিও না।'

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ইমাম আরো বললেন–

'অনেক কথা সাধারণ মানুষের বুঝে আসে না। কেউ তাদেরকে বলেও না। তোমরা কি দেখছ না যে, তোমাদের মধ্যে একটি পশুবৃত্তি আছে? কেন, তোমরা কি নারীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব কর না? এই পশুবৃত্তি-ই কি তোমাদেরকে পাপের অন্ধগলিতে নিয়ে যায় না? মানুষের এই বৃত্তিটা মানুষ সৃষ্টি করেনি– করেছেন স্বয়ং আল্লাহ। তোমরা এই পশুবৃত্তিকে দমন করতে পার। এর-ই জন্যে আল্লাহ তোমাদেরকে একত্রে ঘরে চারটি করে স্ত্রী রাখতে আদেশ করেছেন। অর্থের অভাবে যদি তোমরা একজন স্ত্রী রাখতেও সক্ষম না হও, তাহলে কোন নারীকে পারিশ্রমিক দিয়ে তোমরা এই পশুবৃত্তি নিবারণ করতে পার। আরে! মানুষ তো সেই পশুবৃত্তির-ই এক ফসল। তবু তোমরা পাপ থেকে বেঁচে থাক। ঘরে এক এক, দু' দু', তিন তিন ও চার চারজন করে স্ত্রী রাখ। আর স্ত্রী ও কন্যাদেরকে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে লুকিয়ে রাখ। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আজ যুবতী মেয়েদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ঘোড়সাওয়ারী ও উটসাওয়ারী শেখান হচ্ছে। মহিলা মাদ্রাসা স্থাপন করে সেখানে মেয়েদেরকে যুদ্ধাহতদের সেবার প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। শেখান হচ্ছে, কিভাবে তারা আহত মুজাহিদের জখমে পট্টি বাঁধবে। এ এক বেদআত কাজ। এই ঘৃণ্য বেদআত থেকে তোমরা তোমাদের বোন-কন্যাদেরকে হেফাজত কর। তোমাদের বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের যারা মসজিদে আসে না, আমার এ কথাগুলো তাদেরও কানে দাও। আল্লাহ্র বিধানে তোমরা হস্তক্ষেপ কর না। এটি মস্তবড় পাপ।'

ইমামের দর্‌স সমাপ্ত হয়। শ্রোতারা উঠে ইমামের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে যেতে শুরু করে। সেদিন বয়ানে এত বিপুলসংখ্যক লোকের সমাগম হয়েছিল যে, মসজিদের ভিতরে জায়গা না পেয়ে বহু লোক বাইরে দাঁড়িয়ে বয়ান শ্রবণ করে।

সুযোগ মত অনেকে ইমামের হাতে চুম্বনও করে। মাথা ঝুঁকিয়ে মোসাফাহা করতে বাদ দেইনি একজনও।

একজন একজন করে চলে গেছে সবাই। শুধু দু'জন লোক ইমামের সামনে বসা। তাদের একজন সেই ব্যক্তি, যে ইমামের কাছে জিহাদ বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য শুনতে আবদার করেছিল। গায়ে তার লম্বা জুব্বা। মাথায় ছোট্ট একটি পাগড়ী। পাগড়ীর উপর চওড়া ফুলদার রুমাল। মুখে লম্বা কালো দাড়ি। ঘন গোঁফ। পোশাকে তাকে মধ্যবিত্ত লোক বলে মনে হল। তার একটি চোখের উপর পট্টির মত সবুজ বর্ণের এক চিলতে কাপড়। কাপড় খন্ডটি দু'টি সুতা দিয়ে মাথার সঙ্গে বাঁধা।

ইমামের জিজ্ঞাসার জবাবে সে জানাল, তার এ চোখটি নষ্ট।

দ্বিতীয় ব্যক্তির পোশাকও ছিল সাধাসিধে। তারও লম্বা ঘন দাড়ি। তারা দু'জন-ই এখন মসজিদে ইমামের সামনে বসা। অপর ছয় সঙ্গী– যারা জিহাদের সবক নিতে এসেছিল– মসজিদের বাইরে দন্ডায়মান, যেন তারা সঙ্গীদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

'কেন, তোমাদের সন্দেহ এখনো দূর হয়নি?' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন ইমাম।

'হ্যাঁ, আমাদের সব সন্দেহ দূর হয়ে গেছে।' চোখে পট্টিওয়ালা ব্যক্তি জবাব দেয়।

'আমরা বোধ হয় আপনাকেই খুঁজে ফিরছি। আমরা মিসরের অর্ধেকটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে এসেছি। বোধ হয়, আমাদেরকে মসজিদের অবস্থান সম্পর্কে ভুল নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল।'

'কেন, মিসরের অর্ধেকেও আমার চেয়ে ভাল আলেম খুঁজে পাওনি বুঝি?'

'খুঁজছি যে শুধু আপনাকে-ই। আমরা কি সঠিক জায়গায় এসে পৌঁছিনি? আপনার দর্‌স বলছে, আমরা আপনাকেই খোঁজ করছি।' জবাব দেয় একজন।

ইমাম বাইরের দিকে তাকালেন এবং নির্লিপ্তের মত বললেন, 'জানি না, আজকের আবহাওয়া কেমন থাকবে!'

'বৃষ্টি আসবে।' পট্টিওয়ালা জবাব দেয়।

'আকাশ তো বিলকুল পরিস্কার।' ইমাম বললেন।

'আমরা মেঘ নিয়ে আসব।' বলেই পট্টিওয়ালা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

ইমাম মুচকি হাসলেন এবং চাপাকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথা থেকে এসেছ?'

'এক মাস ইসকান্দারিয়ায় ছিলাম। তার আগে শোবকে।'

'মুসলমান?'

'ফেদায়ী, তবে এখনো মুসলমান-ই মনে করুন।' বলে সঙ্গীর প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টিপাত করে বিকট শব্দে হেসে উঠে পট্টিওয়ালা।

'আমি আপনাকে ওস্তাদ মানছি। এ-যে আপনি, আমার বিশ্বাস-ই হতে চাচ্ছে না। আপনি ব্যর্থ হতে পারেন না।' বলল দ্বিতীয়জন।

'তবে সফলতা অত সহজও নয়। সালাহুদ্দীন আইয়ুবীকে হয়ত তোমরা জান না। আমি সর্বস্তরের মানুষের অন্তরে জিহাদ ও যৌনতা সম্পর্কে ইসলামী ধ্যান-ধারণার বিপরীত ধারা ঢুকিয়ে দিয়েছি। কিন্তু সালাহুদ্দীন যে মাদ্রাসা খুলেছে, তা সম্ভবতঃ আমাদের প্রচেষ্টাকে সহজে সফল হতে দিবে না। আচ্ছা, তুমি আমাকে জিহাদ সম্পর্কে বলতে বলেছিলে কেন?' ইমাম বললেন।

শোবকে আমাদেরকে বলা হয়েছিল, জিহাদ সম্পর্কীয় আলোচনা-ই আপনার সবচে' বড় পরিচয়। দর্সে আপনি যা বলেছেন, তা ওখানেই আমাদেরকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছিল। আমাদেরকে আরো বলা হয়েছিল, জিহাদের পর আপনি অবশ্যই যৌনতা নিয়ে আলোচনা করবেন। আপনি আপনার সবক বেশ ভাল করেই রপ্ত করেছেন।" বলল পট্টিওয়ালা।

'আমার নাম কি?' ইমাম জিজ্ঞেস করেন।

আপনি কি আমাদেরকে পরীক্ষা নিতে চাচ্ছেন? আমাদের উপর কি আপনার সন্দেহ হচ্ছে? নাম নয়– আমাদেরকে পরস্পরের সংকেত শেখান হয়।' পট্টিওয়ালার জবাব।

'তোমরা কী উদ্দেশ্যে এসেছ?' জানতে চান ইমাম।

'ফেদায়ী কেন আসে?' পট্টিওয়ালার পাল্টা প্রশ্ন।

'তোমাদেরকে আমার নিকট কেন পাঠান হয়েছে?' জিজ্ঞেস করেন ইমাম।

'একটি উষ্ট্রীর জন্য।' আপনার কাছে দু'টি আছে। আমাদেরকে আপনার নিকট পাঠান হত না। কিন্তু আপনি জেনে থাকবেন যে, সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর এক নায়েব সালার রজব সুদানীর সঙ্গে শোবক থেকে তিনটি উষ্ট্রী প্রেরণ করা হয়েছিল। তাদের একটি ছিল আমাদের জন্য। কিন্তু কী হয়েছে জানি না, তিনটি-ই মারা গেছে। রজবের বিচ্ছিন্ন মস্তক আর সবচে' রূপসী উষ্ট্রীটি সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর নিকটে পৌঁছে গেছে। সেটিও শেষ হয়ে গেছে।' বলল একজন।

বেদনার নিঃশ্বাস ছেড়ে ইমাম বললেন, 'হ্যাঁ, জানি। আমাদের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেল। আইয়ুবীর এই দক্ষ কমাণ্ডারকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে আমাদের বড় কাজ হত। কিন্তু জল্লাদ তাকে শেষ করে দিল। আচ্ছা, এবার ভিতরে চলুন, এ স্থান নিরাপদ নয়।'

দুই আগন্তুক ইমামের সঙ্গে উঠে মসজিদের বাইরে চলে আসেন। বাইরে অপেক্ষমান ছয় সঙ্গী অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

❁ ❁ ❁

তারা ইমামের ঘরে প্রবেশ করে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর। একাধিক কক্ষ। দু'তিনটি কক্ষ অতিক্রম করে ইমাম তাদের অপর একটি কক্ষের সামনে নিয়ে যান। কক্ষটির অবস্থান মাটির উপরে হলেও দেখতে তা মাটির নীচে বলে মনে হয়। কক্ষের সম্মুখে খড়-কুটো ছড়ানো। দরজা তালাবদ্ধ। বুঝা গেল, কয়েক বছর ধরে তালাটি খোলা-ই হয়নি, খোলা যাবেও না।

কক্ষের এক পার্শ্বে জানালা। জানালায় হাত লাগান ইমাম। খুলে যায় জানালা। ইমাম ভিতরে প্রবেশ করেন। পিছনে তারা দু'জন।

ভিতর দিক থেকে কক্ষটি বেশ সাজানো-গোছানো। দেয়ালে ঝুলছে একটি সোনার ক্রুশ। তার একদিকে হাতে আঁকা ঈসা (আঃ)-এর প্রতিকৃতি আর অপরদিকে মা মরিয়মের ছবি। ইমাম বললেন, 'এটি আমার গীর্জা, আমার আশ্রম।'

'তা বিপদের মুহূর্তে আপনার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কী?' জানতে চায় সবুজ পট্টিওয়ালা। 'ক্রুশ এবং ছবিগুলো এভাবে চোখের সামনে না রাখা উচিৎ' বলেও পরামর্শ দেয় সে।

'এ পর্যন্ত কারো আগমনের আশংকা নেই।' ইমাম জবাব দেন এবং হেসে বলেন, 'মুসলমান বড় সরল ও আবেগপ্রবণ জাতি। আবেগঘন জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনেই তারা জীবন দিতে শুরু করে। জৈবিক চাহিদা মানুষের সবচে' বড় দুর্বলতা। মুসলমানদের মধ্যে আমি এই দুর্বলতাকে উস্কে দিচ্ছি। তাদের আমি সবক দিচ্ছি যে, এক একজনের চারটি করে বিয়ে করা ফরজ। আমি ধীরে ধীরে তাদেরকে বিপথগামিতার প্রতি আগ্রহী করে তুলছি। ধর্মের নামে মুসলমানদের তোমরা ভালো-মন্দ দু-ই করতে পার। কুরআন হাতে নিয়ে কথা বললে এরা বোকামীসুলভ কথাও মেনে নেয়, মিথ্যাকেও সত্য বলে বিশ্বাস করে ফেলে। আমার পরীক্ষা সফল। এখানে আমি আমার-ই মত এমন একদল লোক তৈরি করে নেব, যারা মসজিদে বসে কুরআন হাতে নিয়ে মুসলমানদের জিহাদী জয্‌বা আর নৈতিকতাকে নিঃশেষ করে দেবে। আমি নারী সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিচ্ছি। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী নারীদেরকেও সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেছে। আমি তাদের বলছি, নারীদেরকে তোমরা ঘরে আবদ্ধ করে রাখ। এ জাতির অর্ধেক জনশক্তিকে আমি বেকার করে ছাড়ব।'

'সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে। সাধারণ মানুষ আর সেনা সদস্যদের এক করে তিনি বড় সাফল্য অর্জন করেছেন। এ মুহূর্তে যদি তিনি জেরুজালেম জয় করার ঘোষণা দেন, তাহলে মিসরের সব মানুষ তার পিছনে ঝাঁপিয়ে পড়বে।' বলল সবুজ পট্টিওয়ালার সঙ্গী।

'কিন্তু, এমন ঘোষণা তিনি দেবেন না। তিনি বুদ্ধিমান। আবেগপ্রবণ লোকদের

তিনি পছন্দ করেন না। তিনি একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিককে আবেগপ্রবণ অপ্রশিক্ষিত একশত লোকের উপর প্রাধান্য দেন। আইউবী একজন বাস্তববাদী মানুষ। অন্তঃসারশূন্য সস্তা শ্লোগানে তিনি জাতিকে ক্ষেপান না।

আমাদের কাজ, বাস্তবতা ও প্রশিক্ষণ থেকে এ জাতিকে দূরে রাখা এবং আরো আবেগপ্রবণ করে তোলা। হুঁশ বলতে তাদের কিছু-ই থাকবে না– থাকবে শুধু জোশ। জোশের বশবর্তী হয়ে তারা ভুলে যাবে বাস্তবতা আর বিবেক-বুদ্ধির কথা। দুশমনের প্রথম আঘাতেই তারা দমে যাবে। শুনেছ তো, দরসে আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর কেমন প্রশংসা করলাম? এটা আমার কূট-কৌশলের-ই অংশ।'

'এসব কথা আমরা পরে বলব। আগে আমাদেরকে উষ্ট্রী দু'টো দেখান এবং বলুন, এখানে কখন কিভাবে আমরা আশ্রয় পেতে পারি, এখানে আপনার অন্য কোন লোক থাকে কি?'

'না, এখানে আর কেউ থাকে না।' বললেন ইমাম।

আগন্তুকদের ব্যাপারে ইমাম এখন সন্দেহমুক্ত। গোপন সাংকেতিক শব্দ দ্বারা তিনি তাদের চিনে ফেলেছেন।

ইমাম কক্ষ থেকে বের হয়ে যান। খানিক পরে ফিরে আসেন। সঙ্গে তার চোখ ঝলসানো দু'টি অনুপম রূপসী যুবতী। এরা-ই সেই দু' মেয়ে, যাদেরকে তিনি নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। এনেছিলেন আপাদমস্তক কালো বোরকায় ঢেকে। কিন্তু এখন সেই পর্দা নেই। দেহের অর্ধেকটা-ই এখন তাদের অনাবৃত। ইমাম আগন্তুকদের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেন এবং আলমারী থেকে মদের বোতল বের করে আনেন। এক মেয়ে গ্লাস এনে তাতে মদ ঢেলে মেহমানদের সামনে রাখে।

'এসব পরে হবে, আগে কাজের কথা বলে নিই।' বলল সবুজ পট্টিওয়ালা ব্যক্তি।

'আমাদের দু' ব্যক্তিকে হত্যা করতে হবে। সালাহুদ্দীন আইউবীকে আর আলী বিন সুফিয়ানকে। কিন্তু সমস্যা হলো, আমরা তাদেরকে চিনি না। আপনি দেখিয়ে দেবেন। আপনি কি ওদের দেখেছেন কখনো?' বলল অপরজন।

'দেখেছি মানে? এত দেখেছি যে, ঘোর অন্ধকারেও আমি তাদেরকে চিনতে পারব। আমি যে অভিযান শুরু করেছি, তার সাফল্যের জন্য ওদেরকে চিনে রাখা ছিল অপরিহার্য। আলী বিন সুফিয়ান এত-ই বিচক্ষণ, এত-ই অভিজ্ঞ যে, কোন গোয়েন্দা না পাঠিয়ে তিনি নিজেই আমার এখানে চলে আসতে পারেন। তবে আমার সামনে ছদ্মবেশে এলেও আমি তাকে চিনে ফেলব।' বললেন ইমাম।

'আর সালাহুদ্দীন আইউবীর ব্যাপারে আপনার ধারণা কী?' পট্টিওয়ালা জিজ্ঞেস করে।

'তাকেও বেশ ভাল চিনি।' বললেন ইমাম।

চোখে সবুজ পট্টিওয়ালা ব্যক্তি তার হাত দু'খানা নিজের কান আর মাথার

মধ্যখানে নিয়ে আসে। দাড়ি ধরে ঝটকা টান মারে নীচের দিকে। লম্বা কৃত্রিম দাড়ি আর ঘন গোঁফ চেহারা থেকে আলগা হয়ে যায়। চোখের উপর রাখা সবুজ পট্টিও খুলে ছুড়ে ফেলে। ফুটে উঠে তার আসল রূপ।

ইমাম যেখানে বসা ছিলেন, সেখানেই মূর্তির মত বসে রইলেন। বিস্ফারিত অপলক নেত্রে মুখ হা করে তাকিয়ে রইলেন মুখোশহীন আগন্তুকের প্রতি। মেয়ে দু'টো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারা একবার লোকটির প্রতি, একবার ইমামের প্রতি দৃষ্টিপাত করছে। রক্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ইমামের দেহ। এবার দুনিয়া জোড়া বিস্ময় ও ভয়জড়িত ইমামের কাঁপা কণ্ঠ ঃ 'সালাহুদ্দীন আইউবী!'

'হ্যাঁ, দোস্ত! আমি সালাহুদ্দীন আইউবী। সুনাম শুনে আপনার দর্স শুনতে এসেছিলাম।'

আইউবী এবার তার সঙ্গীর দাড়ি মুঠি করে ধরে ঝটকা এক টান দেন। চেহারা থেকে পৃথক হয়ে আসে দাড়ি। বললেন, 'একেও বোধ হয় চিনেন?'

'হ্যাঁ চিনি। আলী বিন সুফিয়ান।' ভয়ার্ত কণ্ঠে জবাব দেন ইমাম।

হঠাৎ মেয়ে দু'টো এবং ইমাম পিছনে দৌড়ে গিয়ে আলমারী খুলে হাতে তরবারী তুলে নেয়। কিন্তু পিছনে মোড় ঘুরিয়েই তারা থমকে যায়। উদ্যত তরবারীগুলো আপসে অধঃনমিত হয়ে যায় তাদের। কারণ, ইতিমধ্যে আইউবী আর আলী বিন সুফিয়ানের জুব্বার ভিতরে লুকানো তরবারীও তাদের হাতে এসে গেছে। অসি চালনায় প্রশিক্ষণ দেয়া হলেও দুই পেশাদার যোদ্ধার মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারল না মেয়ে দু'টো। ছিনিয়ে নেয়া হল তাদের হাতের অস্ত্র।

আলী বিন সুফিয়ান বাইরে ছুটে যান। খানিক পর বাইরে অপেক্ষমান অপর ছয় সঙ্গীও উদ্যত তরবারী হাতে ভিতরে প্রবেশ করেন।

পরদিন মসজিদের সামনে এলাকাবাসীদের প্রচন্ড ভীড় জমে যায়। কয়েকজন সরকারী কর্মকর্তা পালাক্রমে তাদের নিয়ে যাচ্ছে ইমামের গোপন কক্ষে। জনতাকে ইমামের ঘর দেখান হল, দেখান হলো দেয়ালে ঝুলান ঈসা ও মরিয়মের প্রতিকৃতি আর সারি সারি সাজানো মদের বোতল। কর্মকর্তাগণ জনতার সামনে তুলে ধরেন ছদ্মবেশী ইমামের আসল রূপ।

খৃষ্টানরা সারা দেশে, বিশেষ করে কায়রোতে বিপুলসংখ্যক গুপ্তচর ও সন্ত্রাসী ছড়িয়ে দিয়েছিল। তার মোকাবেলায় সালাহুদ্দীন আইউবীর দিক-নির্দেশনায় আলী বিন সুফিয়ান দেশময় গোয়েন্দার জাল বিছিয়ে দেন। খৃষ্টানদের ইসলামী সভ্যতা ধ্বংসের অভিযান-ই আইউবীকে বেশী অস্থির করে তোলে।

আলী বিন সুফিয়ান যখন তাঁকে অবহিত করেন যে, এক মসজিদের পেশ ইমাম প্রতি রাতে মসজিদে দর্স দিচ্ছেন এবং ইসলামী চিন্তাধারাকে বিকৃত করছেন, তখন

আইউবী সঙ্গে সঙ্গে-ই তাকে গ্রেফতার করে আনার আদেশ দেননি। রিপোর্ট শুনে তিনি বলেছিলেন, 'আলী! ধর্ম নিয়ে ফের্কাবাজি শুরু হয়েছে। এই ইমামও কোন এক ফেরকার লোক হবেন হয়ত। এমনও হতে পারে যে, তিনি কুরআনের নিজস্ব ব্যাখ্যা-ই পেশ করছেন। ধর্মের ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না। আমি শাসক, আলেম নই। লোকটিকে যদি তুমি কুচক্রী মনে কর, তাহলে গ্রেফতার করার আগে উত্তমরূপে যাচাই করে দেখ। একজন ইমামের মর্যাদা আমার চেয়ে অনেক উঁচু।'

আলী বিন সুফিয়ান দর্স শুনতে নিজে সেই মসজিদে যাননি। তার সন্দেহ ছিল যে, যদি এই ইমাম সত্যি-ই দুশমনের নিয়োজিত কুচক্রী-ই হয়ে থাকে, তাহলে সে তাকে চিনে থাকবে নিশ্চয়। তাই তিনি কয়েকজন বিচক্ষণ গুপ্তচরকে মসজিদে প্রেরণ করেন। তারা দশ-বার বার মসজিদে যায় এবং যে দর্স শোনে, তা আনুপূর্বিক আলী বিন সুফিয়ানকে শোনায়। সর্বশেষ এক রাতে ইমাম জিহাদের উপর এক দর্স প্রদান করেন এবং জিহাদের ভিন্নধর্মী ব্যাখ্যা পেশ করেন। গুপ্তচররা আলী বিন সুফিয়ানের নিকট রিপোর্ট করে। আলী বিন সুফিয়ান রিপোর্টটি আইউবীকে শোনান এবং অভিমত পেশ করেন যে, এই লোকটি যদি ক্রুসেডারদের চর কিংবা সন্ত্রসী না-ও হয়, তবু তাকে গ্রেফতার করা কিংবা নিবৃত্ত করা জরুরী। কারণ, সে জিহাদের এমন দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করছে, যা কেবল সেই ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যে হয়ত শত্রুপক্ষের লোক অন্যথায় মাতাল।

সালাহুদ্দীন আইউবী বেশ মনোযোগ সহকারে রিপোর্টটি শ্রবণ করেন এবং বলেন, ঘটনা যা-ই হোক, বিষয়টি বড় স্পর্শকাতর। ধর্ম, মসজিদ ও ইমামের ব্যাপার। আমাদের ভেবে-চিন্তে পা ফেলতে হবে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, আলী বিন সুফিয়ানকে নিয়ে নিজেই ছদ্মবেশে ইমামের দর্স শুনতে যাবেন। 'জিহাদের সঙ্গে যৌনতার আলোচনা'র অভিযোগ আইউবীকে বেশী ভাবিয়ে তুলে। আলী বিন সুফিয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করেই তিনি একটি ছদ্মবেশ নির্ণয় করেন।

গোয়েন্দাবৃত্তি করা এবং গোয়েন্দাবৃত্তি প্রতিরোধে আলী বিন সুফিয়ান একজন ঝানু লোক। যে খৃষ্টান মেয়েকে দিয়ে তিনি ফয়জুল ফাতেমীকে গ্রেফতার করিয়েছিলেন এবং আহমাদ কামাল নামক এক কমাণ্ডারের হাতে যে মেয়ে মুসলমান হয়ে তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিল, সেই মেয়ে খৃষ্টান গোয়েন্দাদের সাংকেতিক ভাষা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছিল আলী বিন সুফিয়ানকে। তারই দেয়া নির্দেশনা অনুযায়ী আলী বেশ ক'জন মুসলমানকে গ্রেফতারও করেছিলেন, যারা অর্থ আর রূপসী নারীর বিনিময়ে ঈমান বিক্রি করে খৃষ্টানদের পক্ষে গোয়েন্দাবৃত্তিতে লিপ্ত ছিল। ধরা পড়ার পর চাপের মুখে তারাও স্বীকার করেছিল, হ্যাঁ খৃষ্টান গোয়েন্দাদের মধ্যে এসব ভাষা ও সংকেত ব্যবহৃত হয়।

খৃষ্টান গোয়েন্দারা অপরিচিত লোককে নিজের দলের লোক কিনা যাচাই করার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, 'জানি না, আজকের আবহাওয়া কেমন থাকবে।' কথাটা সে এমন নির্লিপ্তের মত বলবে, যেন এমনিতেই হঠাৎ তার আবহাওয়ার কথা মনে পড়ে গেছে। এখন অপরজন যদি তাদের দলের লোক হয়, তাহলে বলে 'বৃষ্টি আসবে'। তারপর প্রথমজন বলে, 'আকাশ তো বিলকুল পরিষ্কার'। দ্বিতীয়জন বলে, 'আমরা মেঘ নিয়ে আসব'। বলেই সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ার তাৎপর্য হলো, যেন পাশের মানুষও শুনতে পায় কিংবা অপর ব্যক্তি গোয়েন্দা না হলে সে বুঝবে যে, এ লোকটি ঠাট্টা করছে।

আলী বিন সুফিয়ানকে এ তথ্যও প্রদান করা হয়েছিল যে, তাদের এই সাংকেতিক সংলাপ যদি কখনো শত্রুদের কাছে ফাঁস হয়ে যায়, তখন-ই কেবল তা পরিবর্তন করা হবে। অন্যথায় এ সংকেত-ই ব্যবহার করা হবে।

আলী বিন সুফিয়ান আরো জানতে পেয়েছিলেন যে, খৃষ্টান গোয়েন্দারা কখনো একে অপরের নাম বলে না। তাদের হেডকোয়ার্টার ফিলিস্তীনের প্রত্যন্ত এক পল্লীতে। নাম তার শোবক। এই শোবক-ই ক্রুসেডারদের চরবৃত্তির প্রাণকেন্দ্র।

এসব তথ্যের উপর ভিত্তি করে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ান ছদ্মবেশে কায়রোর সেই মসজিদে গমন করেন। তারা জিহাদ বিষয়ক বয়ানের আবদার জানালে ইমাম তাদের আবদার পূরণ করেন। দর্স শেষে নির্জনে বসে সেই গোপন সাংকেতিক সংলাপের মাধ্যমে ইমামকে কুপোকাত করে ফেলেন তারা। পরে তিনি বলেও ছিলেন যে, আমি অত কাঁচা গোয়েন্দা ছিলাম না যে, অপরিচিত মানুষের সামনে মনের সব গোপন কথা প্রকাশ করব।

আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ানের সাংকেতিক সংলাপ-ই তাকে ফাঁদে ফেলেছে। কারণ, সেই সংলাপ ছিল উচ্চ পর্যায়ের গোয়েন্দাদের জন্য নির্দিষ্ট। সাধারণ গোয়েন্দারা তা জানত না। তাছাড়া এই সাংকেতিক সংলাপের শেষে অট্টহাসিতে ফেটে পড়াও ছিল বিশেষ তাৎপর্যবহ। যথাসময়ে এই হাসির অভিনয় করতে না পারলে খৃষ্টান গোয়েন্দারা গোপনীয়তা ফাঁস করত না অন্যের কাছে। সেজন্যেই সালাহুদ্দীন আইউবী সংলাপ শেষে অট্টহাসির অভিনয় করেছিলেন। সঙ্গে তিনি ছয়জন জানবাজ সৈন্যও নিয়ে গিয়েছিলেন, যাতে সময়ে তারা সাহায্য করতে পারে।

তিনজনকে বন্দী করে রেখে তদন্ত শুরু করলেন আলী বিন সুফিয়ান। প্রথমে সেই এলাকায় গিয়ে খোঁজ নিলেন, লোকটি কিভাবে এই মসজিদের দখলদারিত্ব হাতে নিল এবং তার আগে সে যে ঝুপড়িতে বাস করত, তা তাকে কে দিয়েছিল?

স্থানীয় লোকদের বিবরণে আলী জানতে পারলেন যে, দুই স্ত্রীসহ লোকটি এ অঞ্চলে আসে। প্রথমে একজনের ঘরে মেহমান হয়ে থাকে কিছুদিন। ধীরে ধীরে মানুষ যখন বুঝতে পারল যে, লোকটি আসলে বড় একজন আলেম, তখন স্ত্রীদেরসহ বসবাসের জন্য তাকে ঐ ঝুপড়িটি দেয়া হয়। নামায পড়তে আসতেন তিনি এ মসজিদে। আস্তে আস্তে ভাব গড়ে তোলেন মসজিদের ইমামের সঙ্গে।

পনের-ষোলদিন পর মসজিদে নামাযের মধ্যে-ই ইমাম সাহেবের পেটব্যাথা শুরু হয়। ধীরে ধীরে ব্যাথা এত তীব্র আকার ধারণ করে যে, এখন আর মসজিদে আসতেই পারছেন না। ডাক্তাররা ঔষধ দেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। তৃতীয় দিনে প্রচন্ড ব্যাথ্যা নিয়ে-ই ইমাম সাহেব মারা যান।

এ সুযোগে উক্ত আলেম মসজিদের ইমামতির দায়িত্ব হাতে নেয়। অল্প ক'দিনের মধ্যে সে সমাজে এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, মুসল্লিরা তার ভক্ত হয়ে যায় এবং স্ত্রীদের নিয়ে বাস করার জন্য একটি ঘর দিয়ে দেয়।

আলী বিন সুফিয়ানের প্রশ্নের জবাবে লোকেরা জানায়, তারা একাধিকবার তাকে পুরাতন ইমামের জন্য খাবার নিয়ে যেতে দেখেছে। আলী বিন সুফিয়ান বুঝে ফেললেন, লোকটি ইমাম সাহেবকে বিষ খাইয়েছে এবং পথের কাঁটা সরিয়ে নিজে মসজিদের দখলদারিত্ব হাত করেছে।

গোয়েন্দা ইমামের বাসভবনে তল্লাশী চালান হল। পাওয়া গেল বিপুলসংখ্যক অস্ত্র। অস্ত্রগুলো লুকিয়ে রাখা ছিল ভবনের বিভিন্ন জায়গায়। পাওয়া গেল পুটুলীভরা বিষ। বিষগুলো খাওয়ান হল একটি কুকুরকে। বিষ খেয়ে কুকুরটি অস্থির হয়ে পড়ে। উলট-পালট করতে থাকে তিনদিন পর্যন্ত। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় কুকুরটি মারা যায়।

আলী বিন সুফিয়ান তদন্ত রিপোর্ট পেশ করলেন আইউবীর সামনে। রিপোর্ট শুনে আইউবী বললেন–

'বন্দীদশায় ওদেরকে অস্থির করে তোল, ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখ সারাক্ষণ। কিন্তু আমি ওদেরকে জল্লাদের হাতে দেব না, কয়েদখানায়ও ফেলে রাখব না।'

'কী করবেন তাহলে?' জিজ্ঞেস করলেন আলী।

'মুক্তি দিয়ে আমি ওদেরকে সসম্মানে ফেরত পাঠাব।' বললেন আইউবী।

আলী বিন সুফিয়ান বিস্ময়ভরা অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন আইউবীর প্রতি।

আইউবী বললেন, 'আমি একটি জুয়া খেলতে চাই, আলী!

এখন আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কর না। আমি ভাবছি, এই বাজি লাগাব কি না।'

খানিক নীরবতার পর তিনি আবার বললেন, 'আগামীকাল দুপুরের আহারের পর নায়েব সালার, উপদেষ্টা ও উচ্চ পর্যায়ের কমাণ্ডার এবং প্রশাসনের প্রত্যেক বিভাগীয় কর্মকর্তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। তুমিও থাকবে।'

❁ ❁ ❁

দিন শেষে রাত এল। আলী বিন সুফিয়ান এই প্রথমবারের মত বন্দী আলেমকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। কিন্তু বুঝা গেল, লোকটি বড় কঠিনপ্রাণ। আলীর এক প্রশ্নের জবাবে আলেম বলল–

'মনোযোগ সহকারে আমার কথাগুলো শোন আলী বিন সুফিয়ান! আমরা দু'জন একই ময়দানের সৈনিক। তুমি যদি আমার দেশে ধরা পড়, তাহলে আমার তো বিশ্বাস, তুমি জীবন দেবে, তবু দেশ ও জাতিকে ধোঁকা দেবে না! আমাকে তুমি একই রকম মনে কর। আমি জানি, আমার পরিণতি কী হবে। আমার কাছে তুমি যা কিছু জানতে চাও, যদি আমি সব বলেও দিই, তবু তোমরা আমাকে ক্ষমা করবে না। জল্লাদের হাতে হোক কিংবা নির্যাতনের শিকার হয়ে হোক এই অন্ধকার কুঠরিতে-ই আমাকে মরতে হবে। তাহলে বল, জাতির সঙ্গে প্রতারণা কেন করব আমি?'

'আমার আশা, তুমি তোমার ইচ্ছার পরিবর্তন ঘটাবে।' কেন, মেয়ে দু'টোর সম্ভ্রম রক্ষার খাতিরেও কি তুমি মুখ খুলবে না?'

'সম্ভ্রম? ওদের সম্ভ্রম বলতে কিছু নেই। সম্ভ্রম-সতীত্বের বিসর্জন দেয়ার প্রশিক্ষণ দিয়ে-ই ওদের মাঠে নামান হয়। আমরা জীবন আর সম্ভ্রম দূরে ছুঁড়ে ফেলে আসি। ওদের আছে শুধু রূপ আর পুরুষের মনকাড়া ছলনা। এ-ই ওদের সম্পদ। এ দিয়েই ওরা পাথরকে মোমে পরিণত করে। ওদের সঙ্গে তোমরা যা ইচ্ছে করতে পার। আমার চোখের সামনে ওদের অপমান করলেও আমি কিছু বলব না। ওরাও আপত্তি করবে না।'

'গোয়েন্দা মেয়েদেরকে আমরা মৃত্যুদন্ড দিয়ে থাকি– অপমান করি না। আমাদের ধর্ম আমাদেরকে নারী নির্যাতনের অনুমতি দেয় না।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'দোস্ত! মমতার লোভ দেখাও বা নির্যাতনের ভয় দেখাও, কোন অস্ত্র-ই তোমার সফল হবে না। আমাদের কারুর মুখ থেকে আমাদের সে সহকর্মীদের নাম-পরিচয় উদ্ধার করতে তুমি পরবে না, যারা তোমাদের শাসন ক্ষমতার শীর্ষস্থান দখল করে আছে। বন্দী মেয়েদের সঙ্গে তুমি সদ্ব্যবহারের ওয়াদা করেছ। এর বিনিময়ে আমি তোমাকে এতটুকু বলতে পারি যে, এটা তোমার-আমার লড়াই নয়। এ লড়াই ক্রুসেড বনাম চাঁদ-তারার লড়াই। আমি সাধারণ গোয়েন্দা নই যে, এদিকের খবর ওদিকে, ওদিকের খবর এদিকে আদান-প্রদান করব। আমি গোয়েন্দা বিভাগের একজন শীর্ষ অফিসার। আমি আলেম। খৃষ্ট ও ইসলাম উভয় ধর্মে সমান পারদর্শী। ইঞ্জীল ও কুরআন উভয় গ্রন্থের তলা পর্যন্ত হাতড়িয়েছি। আমি স্বীকার করি, তোমাদের ধর্ম শ্রেষ্ঠ ও সরল-সহজ। ইসলাম সব মানুষের ধর্ম। কোন জটিলতা নেই এতে। আর ইসলামের গ্রহণযোগ্যতার কারণও এটাই। কিন্তু পাশাপাশি তোমাদেরকে আমি এ

কথাও বলে দিতে চাই যে, শত্রুরা তোমাদের ধর্মের মৌলিকত্ব নষ্ট করে দিচ্ছে, যাতে এর গ্রহণযোগ্যতা বিনষ্ট হয়। মুসলমান আলেমের বেশ ধারণ করে ইসলামের মধ্যে বহু ভিত্তিহীন বর্ণনা ঢুকিয়ে দিয়েছে তোমাদের শত্রুরা। ইসলাম ছিল কুসংস্কারবিরোধী ধর্ম। কিন্তু এখন সবচেয়ে বেশী কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতি হল মুসলমান। চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য গ্রহণের সময় মুসলমানদের আমি সেজদা করতে দেখেছি। দেখেছি এ সময় নজরানা দিতে। তাছাড়া এমন বহু বেদআত আছে, যাকে মুসলমানরা দ্বীনের অংশ বলে বিশ্বাস করে।' বলল, গোয়েন্দা আলেম।

'দীর্ঘদিন যাবত আমরা তোমাদের মূল চিন্তাধারাকে ধ্বংস করে আসছি। আমরা জানি, পৃথিবীতে মাত্র দু'টি ধর্ম টিকে থাকবে। খৃষ্টবাদ ও ইসলাম। আর দু'টির যে কোন একটি খতম না হওয়া পর্যন্ত তাদের পরস্পর লড়াই অব্যাহত থাকবে। আমরা জানি, তীর-তরবারী দ্বারা কোন ধর্মকে-ই বিলুপ্ত করা যায় না। প্রচারণার মাধ্যমেও নয়। এর একটি মাত্র পথ, যা আমরা অবলম্বন করেছি। মনে রেখ, এ অভিযানে আমি একা নই। আমরা বিশাল এক বাহিনী তোমাদের চিন্তাধারার উপর হামলা চালিয়ে আসছি।'

আলী বিন সুফিয়ান বন্দী গোয়েন্দার সামনে পায়চারী করছেন। গভীর মনোযোগ সহকারে শুনছেন তার বক্তব্য। বুঝলেন, লোকটি সাধারণ গোয়েন্দাদের চেয়ে ব্যতিক্রম। এর মুখ থেকে তথ্য বের করা কঠিন ব্যাপার। তাই তিনি কৌশল পরিবর্তন করলেন।

গোয়েন্দার পায়ে বেড়ী, হাতে হাতকড়া। কয়েদখানার একজন রক্ষীকে ডাকলেন আলী। বন্দী গোয়েন্দার পায়ের বেড়ী আর হাতকড়া খুলে দিতে বললেন। বন্দীর খানাপিনার ব্যবস্থা করার আদেশ দেন।

'আমার এই আচরণকে কথা নেয়ার কৌশল মনে কর না। আমরা আলেমদের কদর করি। হোক সে যে কোন ধর্মের। আমি আর কিছুই জানতে চাইব না তোমার কাছে। ইচ্ছে হলে তুমি কিছু বলতে পার।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'আমি তোমাকে ইজ্জত করি আলী! আমি তোমার অনেক প্রশংসা শুনেছি। তুমি যেমন যোগ্য, তেমনি আদর্শবান। এর চেয়ে বড় মর্যাদা আর কী হতে পারে যে, স্বয়ং খৃষ্টান রাজারা তোমাকে খুন করাতে চান? এর মানে তো এই-ই যে, তুমি আইউবী-জঙ্গীর সমমর্যাদার লোক! শোন আলী! কোন জাতির ধর্ম আর তাহযীব-তামাদ্দুন ধ্বংস করার জন্য সেনা অভিযান আর যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রয়োজন পড়ে না। যৌনতার আগুন জ্বালিয়েই একটি জাতিকে নিঃশেষ করতে হয় তিলে তিলে। এ আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা। বিশ্বাস যদি না হয়, তাহলে তোমাদের মুসলিম শাসকদের অবস্থাটা একটু

দেখে নাও। তোমাদের রাসূল বলে গেছেন, 'নিজের প্রবৃত্তিকে খুন কর; এটা সব অনিষ্টের মূল।' কিন্তু তোমার জাতি কবে পর্যন্ত এর উপর আমল করেছে? রাসূল যে ক'দিন জীবিত ছিলেন, সে ক'দিন-ই তো? ইহুদীরা তাদের সুন্দরী মেয়েদের দিয়ে তোমার জাতিকে উত্তেজিত করেছে। তাই তোমার জাতি আজ প্রবৃত্তির দাস। তোমাদের যার হাতে সম্পদ আছে, নারীদের দিয়ে সে হেরেম পূর্ণ করে আগে। কি ধনী, কি গরীব প্রত্যেক মুসলমান ঘরে চারটি করে বউ রাখতে চায়। মাওলানা-মৌলভীর রূপ ধরে ইহুদীরা তোমাদের চিন্তা-চেতনায় পাশবিকতা ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমি হলফ করে বলতে পারি, মুসলমানরা যদি তাদের নবীর আদর্শ অনুসরণ করত, তবে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার তিন চতুর্থাংশ-ই হত মুসলমান। কিন্তু, তা হয়নি। যে ক'জন আছে, তারাও নামে মাত্র মুসলমান। তোমাদের রাজত্ব দিন দিন সংকুচিত হয়ে আসছে। আমার মত আলেমরা তোমাদের ধর্ম ও তাহযীব-তামাদ্দুনের উপর যে হামলা চালিয়ে আসছে, এ তারই প্রতিফল।'

শোন বন্ধু! এ হামলা কখনো বন্ধ হবে না। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি, একদিন এ পৃথিবীতে ইসলাম থাকবে না। থাকেও যদি, থাকবে পৌরাণিক এক সংস্কার হিসেবে। নারী আর মদে মাতাল হয়ে থাকবে তার অনুসারীরা। যে কেউ তো আর সালাহুদ্দীন আইউবী, নুরুদ্দীন জঙ্গী হতে পারে না! কাল-পরশু তাদেরকে মরতেই হবে। তারপরে যারা আসবে, আমরা তাদেরকে প্রবৃত্তিপূজায় মাতিয়ে তুলব। আমাকে তুমি হত্যা করতে পার আলী! কিন্তু আমার মিশনকে হত্যা করা তোমার সম্ভব নয়। মানুষের মৃত্যুতে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মরে না। তোমার হাতে আমি খুন হলে আমার জায়গায় আরেকজন আসবে। বন্ধু! ইসলামকে বিলুপ্ত করে কিংবা মুসলমানদেরকে আমাদের তাবেদারে পরিণত করেই তবে আমরা ক্ষান্ত হব। আমার আর কিছু বলার নেই। এবার তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দিতে পার।'

আলী বিন সুফিয়ান গোয়েন্দাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করেননি। তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। এক অপার্থিক গাম্ভীর্য তার চেহারায়। গোয়েন্দার বক্তব্যে কি এক কঠিন, কত স্পর্শকাতর চিত্র ফুটে উঠেছে তার সামনে। তা-ই বোধ হয় ভাবছিলেন তিনি। কল্পনার পাখায় ভর করে দেশময় ছুটে চললেন আলী। চোখ ঘুরিয়ে নতুন করে দেখে নিলেন দেশের মুসলমানদের বাস্তব চিত্রটা। খৃষ্টান গোয়েন্দার বক্তব্যের সত্যাসত্য যাচাই করলেন বাস্তবতার নিরিখে। না, গোয়েন্দার বক্তব্য একতিলও মিথ্যে নয়। বর্ণে বর্ণে সত্য তার প্রতিটি কথা। মুসলিম জাতির মধ্যে নৈতিক অধঃপতনের জীবাণু আসলেই ঢুকে পড়েছে। আরবের আমীর-উজীরগণ তো পুরোপুরি ধ্বংস হয়েই গেছে। যুদ্ধের ময়দানে খৃষ্টানদের পরাজিত করে ইসলামী সালতানাতকে আরো বিস্তৃত করার স্বপ্ন দেখছেন সালাহুদ্দীন আইউবী। কিন্তু খৃষ্টানরা এমন এক দিক থেকে আক্রমণ

করে বসেছে, যা প্রতিরোধ করা সুলতান আইউবীর সাধ্যের অতীত বলে মনে হচ্ছে আমার।

আলেম গোয়েন্দার কুঠরী বন্ধ করিয়ে আলী বিন সুফিয়ান বন্দী মেয়ে দু'টোর কক্ষের সামনে এসে দাঁড়ান। একটি কক্ষের দরজা খুলিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেন তিনি। বিছানায় বসা ছিল মেয়েটি। আলী বিন সুফিয়ানকে দেখে দাঁড়িয়ে যায় সে। আলী চুপচাপ গভীরভাবে দেখে নেন মেয়েটিকে। তারপর কিছুই না বলে নীরবে বেরিয়ে যান কক্ষ থেকে। বন্ধ করে দেয়া হয় কক্ষের দরজা।

পরদিন দুপুরের আহারের পর। সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা সালাহুদ্দীন আইউবীর সভাকক্ষে উপস্থিত। দু'টি মেয়েসহ এক খৃষ্টান গোয়েন্দার গ্রেফতারীর সংবাদ তারা আগেই জেনেছেন। সভাকক্ষে বসে কানাঘুষা করছে তারা। ইত্যবসরে সালাহুদ্দীন আইউবী কক্ষে প্রবেশ করেন। গভীর দৃষ্টিতে এক নজর দেখে নিলেন গোটা কক্ষটি। যেন কাউকে খুঁজছেন তিনি।

নির্দিষ্ট আসনে বসলেন আইউবী। বললেন–

'বন্ধুগণ! আপনারা শুনে থাকবেন যে, একটি মসজিদ থেকে আমরা এক খৃষ্টান গুপ্তচরকে গ্রেফতার করেছি। লোকটি সেই মসজিদে নিয়মিত ইমামতি করত।'

লোকটাকে কিভাবে ধরা হল, আইউবী তার বিবরণ দেন। গ্রেফতারের পর জিজ্ঞাসাবাদে সে আলী বিন সুফিয়ানকে কী বলেছে, তাও বর্ণনা করেন।

সালাহুদ্দীন আইউবী বললেন–

'আপনারা গুপ্তচর ও সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, এ উপদেশ দেয়ার জন্য আমি আজ আপনাদেরকে সমবেত করিনি। আজ আমি আপনাদেরকে একথাও বলব না যে, যারা ইসলামের দুশমনদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারা জাহান্নামে যাবে। শুধু একথাটি বলার জন্য আমি আপনাদের কষ্ট দিয়েছি যে, কাফিরদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে, তাদের জন্য দুনিয়াটাকে আমি জাহান্নামে পরিণত করব। এখন আর কোন গাদ্দারকে আমি মৃত্যুদন্ড দেব না, মৃত্যু তো মুক্তির-ই একটি মাধ্যম। এখন থেকে গাদ্দারের শাস্তি হবে, তাদের গলায় রশি বেঁধে সামনে একটি পিছনে একটি সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে প্রতিদিন বাজারে বাজারে ঘুরিয়ে পরে চৌরাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। সাইনবোর্ডে লিখা থাকবে 'আমি গাদ্দার'। এভাবে তাদের প্রত্যহ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চৌরাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার পর তার লাশ নিক্ষেপ করা হবে শহরের বাইরে কোন এক নর্দমায়। কাউকে জানাযা-দাফন করতেও দেয়া হবে না ...।

কিন্তু বন্ধুগণ! এতে দুশমনের তেমন কোন ক্ষতি হবে না। তারা নতুন গাদ্দার তৈরি

করে নেবে। যতদিন তাদের কাছে রূপসী নারীর অশ্লীলতা, অর্থ-কড়ি, সোনা-দানার প্রাচুর্য আর আমাদের কাছে ঈমানের কমতি থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তারা গাদ্দার সৃষ্টি করতেই থাকবে। আপনার দুশমন আপনার মসজিদে বসে, আপনার কুরআন হাতে নিয়ে আপনার নবীর আদর্শকে বিকৃত করছে। একি আপনার আত্মমর্যাদার প্রতি চ্যালেঞ্জ নয়? ক্রুসেডাররা যেসব মেয়েকে গুপ্তচরবৃত্তি আর আমাদের চরিত্র ধ্বংসের জন্য এদেশে পাঠায়, তাদের অনেকে মুসলমানের-ই সন্তান। মা-বাবার কোল থেকে ছিনিয়ে এনে অপকর্মের লজ্জাকর প্রশিক্ষণ দিয়ে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের। ফিলিস্তীন এখন কাফেরের কব্জায়। সেখানকার মুসলমানরা চরম নির্যাতনের শিকার। কঠিন এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে তারা। তাদের ঘর-বাড়ি লুটে নিচ্ছে ক্রুসেডাররা। প্রতিবাদ করলে তাদের নিক্ষেপ করা হয় কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। অপহরণ করা হচ্ছে কিশোরীদের। সুন্দরীদের বেছে বেছে তাদের চিন্তা-চেতনা থেকে ইসলাম ও দেশপ্রেম বিলুপ্ত করে অশ্লীলতার প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। আঙ্গুলের ইশারায় পুরুষদের নাচাতে শিখে তারা। তারপর গুপ্তচরবৃত্তি আর নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের জন্য পাঠান হয় আমাদের দেশে।

ক্রুসেডারদের ফিলিস্তীন কব্জা করার পর সেখানকার মুসলমানদের জীবন এখন বিপন্ন। বেঁচে থাকার অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। খৃষ্টানরা পাইকারীহারে হত্যা করে মুসলমানদের। লুটে নেয় তাদের সহায়-সম্পদ। মসজিদগুলোকে পরিণত করে গীর্জা আর ঘোড়ার আস্তাবলে। যুবতী মেয়েদেরকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে যারা অধিক রূপসী, নাশকতা আর বেহায়পনার প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের ঢুকিয়ে দেয়া হয় আমাদের আমীর-উজীরদের হেরেমে। তাদের ব্যবহার করা হয় আমাদের বিরুদ্ধে। মুসলিম মেয়েদের গলায় ক্রুশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেয় তারা। নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে পলায়নপর মুসলিম ভাইদেরকেও হত্যা করে পথে। আমাদের বোন-কন্যাদের ইজ্জত লুণ্ঠন করে।

আমার কালেমায় বিশ্বাসী বন্ধুগণ! সেই ধারা এখনো বন্ধ হয়নি। ফিলিস্তীনে এখনো সমানগতিতে চলছে মুসলিম নির্যাতনের স্টীমরোলার। ক্রুসেডারদের একটি-ই লক্ষ্য– মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করা। তারা চায়, মুসলিম মেয়েরা খৃষ্টান সন্তান জন্ম দিক।

কিন্তু আমরা এখনো চুপ করে বসে আছি। ক্রুসেডারদের বর্বরতার শিকার হয়ে শাহাদাত বরণকারী ভাইদের কথা আমরা ভুলে গেছি। এর চেয়ে বড় পাপ আর কী হতে পারে! কোন আদেশ করার আগে আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করতে চাই, এ পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় কী? আপনাদের মধ্যে অভিজ্ঞ সৈনিক আছেন, আছেন প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দও। বলুন, আমরা কী করতে পারি।'

'আমীরে মেসের! আপনার আদেশের প্রয়োজন-ই বা কি। এতো আল্লাহর-ই নির্দেশ যে, প্রতিবেশী দেশের মুসলমান নির্যাতনের শিকার হলে তাদের উদ্ধার করার জন্য জালিমের সঙ্গে লড়াই করা ফরজ। কালবিলম্ব না করে এক্ষুণি আমাদের ফিলিস্তীনে অভিযান প্রেরণ করা উচিত।' প্রবীণ এক কমাণ্ডার বললেন।

নায়েব সালার পর্যায়ের অপর এক ব্যক্তি উঠে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের আগে আপনি ঐসব মুসলিম শাসক ও আমীরদের শায়েস্তা করুন, যারা নেপথ্যে থেকে কাফিরদের হাত শক্ত করছে। আমাদের জন্য লজ্জাকর বিষয় যে, আমাদের সারিতে গাদ্দারও আছে। ফয়জুল ফাতেমীর মত উচ্চপদের মানুষ যদি গাদ্দার হতে পারে, তাহলে নিম্নপদের লোকদের উপর ভরসা কি? একটি মুসলিম কিশোরীর শ্লীলতাহানীর প্রতিশোধের জন্য সমগ্র জাতি জীবন বিলিয়ে দেয়া দরকার। অথচ এদেশে আমাদের গোটা জাতির শ্লীলতাহানী চলছে আর আমরা কিনা এখনো ভাবছি, আমাদের কর্তব্য কী? ক্রুসেডাররা আমাদের মেয়েদেরকে অপকর্মের প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদের দিয়েই তাদের সঙ্গে কুকর্ম করাচ্ছে। মুহতারাম আমীরে মেসের! আমি যদি আবেগপ্রবণ না হয়ে গিয়ে থাকি, তাহলে আমাকে এ প্রস্তাব পেশ করার অনুমতি দিন যে, ফিলিস্তীন আমাদের উদ্ধার করতেই হবে। ক্রুসেডাররা আমাদের প্রথম কেবলাকে কুকর্মের আস্তানায় পরিণত করেছে, এর চেয়ে যন্ত্রণার বিষয় আর কি হতে পারে!

দাঁড়ালেন আরেকজন। কথা বলতে চাইলেন তিনি। কিন্তু সুলতান আইউবী হাতের ইশারায় তাকে বসিয়ে দিলেন এবং বললেন–

'আমি এমন কথা-ই শুনতে চেয়েছিলাম। আপানাদের যারা আমার কাছে থাকেন, তারা জানেন যে, আমার প্রথম লক্ষ্য ফিলিস্তীন। মিসরের শাসনক্ষমতা হাতে নেয়ার পর পরই আমি ফিলিস্তীন আক্রমণ করতে চেয়েছিলাম। কিন্ত দু' বছরেরও অধিক সময় কেটে গেছে। বিশ্বাসঘাতকরা আমাকে মিসরে এতই ব্যস্ত রেখেছে, যেন আমি পাকে আটকে গেছি। বিগত দু'টি বছরের ঘটনাবলী নিয়ে একটু ভাবুন। সন্ত্রাসী খৃষ্টান ও গাদ্দারদের সঙ্গে আপনারা যুদ্ধ করেছেন। যারা সুদানীদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়েছে, তারা আমাদের-ই লোক। সুদানী সৈন্যদের দিয়ে যে ব্যক্তি মিসর আক্রমণ করিয়েছে, সে ছিল আমাদের-ই কমান্ডার। সে সেই জাতীয় কোষাগার থেকে বেতন গ্রহণ করত, যে কোষাগারে জনগণের অর্থ আছে, আছে আল্লাহর নামে প্রদত্ত যাকাতের পয়সা। গুপ্তচর, গুপ্তচরদের আশ্রয় ও সাহায্যদাতা এবং ঈমান বিক্রেতাদের খতম করে ফিলিস্তীন আক্রমণ করব, এ আশায় আমি দু'টি বছর কাটিয়েছি। কিন্তু আমার দু' বছরের অভিজ্ঞতা, এই নাশকতার ধারা কখনো বন্ধ হবে না। আমরাই আমাদের মধ্যে গাদ্দার সৃষ্টি করার সুযোগ করে দিচ্ছি ...।'

আজ আমি আপনাদের একথা বলার জন্য একত্রিত করেছি যে, ফিলিস্তীন আক্রমণে আমি আর বেশী বিলম্ব করব না। আপনারা সৈন্যদের সামরিক মহড়া ও প্রশিক্ষণ জোরদার করুন। মুজাহিদদেরকে দীর্ঘ সময়ের অবরোধ পরিচালনার ট্রেনিং দিন। তুর্কী এবং সিরীয় বাহিনীর উপর আমি অধিক আস্থাশীল। মিসরী ও ওফাদার সুদানীদের মধ্যে আরো চেতনা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। প্রয়োজন তাদের আরো দক্ষ করে গড়ে তোলা। তাদের মনে শত্রু-বিরোধী ক্ষোভ সৃষ্টি করুন, আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করুন। তাদেরকে বুঝিয়ে বলুন যে, যেসব নারী ক্রুসেডারদের হিংস্রতার শিকার হচ্ছে, তারা তোমাদের-ই বোন-কন্যা। মসজিদের ইমামদেরকে বলুন, যেন তাঁরা জনসাধারণের সামনে জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং যুবকদের মধ্যে জিহাদী স্পৃহা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। কোন ইমাম বা খতীব যদি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির ভুল ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে তাকে ইমামতের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিন। আমাদের নীতি-আদর্শ মজবুত থাকলে কোন যাদুমন্ত্র, কোন প্রতারণা আমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। মানুষের মন-মস্তিষ্ককে বেকার থাকতে দেবেন না; তাদেরকে একটা না একটা মহৎ কাজে জড়িয়ে রাখুন। অন্যথায় শত্রুরা তাদেরকে ব্যবহার করার সুযোগ পাবে। খুব শীঘ্র আপনারা বাকী নির্দেশনা পেয়ে যাবেন। সৈন্যরা কবে রওনা হবে, তাও অচীরে জানাব। আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন।

সাতদিন পর।

সুলতান আইউবী আলেম গুপ্তচর এবং মেয়ে দু'টোকে তলব করেন। হাজির করা হয় তাদেরকে আইউবীর সামনে। সুলতান তাদেরকে পাশের কক্ষে বসিয়ে রাখতে বললেন। তাদের পায়ে বেড়ী, হাতে শিকল।

সুলতান আইউবীর খাস কামরার পাশের কক্ষে তাদের বসিয়ে রাখা হল। দু' কামরার মাঝে একটি দরজা। দরজার একটি কপাট সামান্য খোলা।

কক্ষে পায়চারী করছেন সুলতান আইউবী। মাথা ঝুঁকিয়ে পায়চারী করতে করতে সুলতান বললেন, 'আমি অতি শীঘ্র কার্ক আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

কার্ক ফিলিস্তীনের দুর্গসম একটি জনপদ। আরেক প্রসিদ্ধ নগরীর নাম শোবক। শোবকও একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। ফিলিস্তীন দখলের পর শোবক এখন ক্রুসেডারদের প্রাণকেন্দ্র। খৃষ্টান রাজা ও উচ্চপদস্থ কমান্ডাররা শোবকেই একত্রিত হয়। এটাই ক্রুসেডারদের ইন্টেলিজেন্স-এর হেডকোয়ার্টার। গোয়েন্দাদের ট্রেনিংক্যাম্পও এটিই।

সুলতান আইউবী ফিলিস্তীন উদ্ধারের জন্য সর্বপ্রথম শোবক আক্রমণ করবেন, আইউবীর সেনাবাহিনী এবং প্রশাসন কর্মকর্তাদের এটাই ছিল বদ্ধমূল ধারণা। তাদের

ধারণায় কৌশলগত দিক থেকে এটাই হবে সঠিক সিদ্ধান্ত। খৃষ্টানদের কোমর ভেঙ্গে দেয়ার জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ শক্ত ঘাঁটিটি ছিনিয়ে আনা-ই যথেষ্ট। কিন্তু সুলতান বলছেন, তিনি কিনা কার্ক আক্রমণ করবেন আগে, অথচ গুরুত্বের দিক থেকে কার্কের অবস্থান দ্বিতীয় পর্যায়ে।

মুখ খুললেন এক নায়েব সালার। বিনীত কণ্ঠে বললেন, 'মুহতারাম! আপনার আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু আমার পরামর্শ, আগে শোবক আক্রমণ করা হোক। শত্রুর কেন্দ্রীয় কমান্ড আগে খতম করা জরুরী। শোবক হাত করার পর কার্ক দখল করা কঠিন হবে না। আমরা যদি সব শক্তি কার্কেই ব্যয় করে ফেলি, তাহলে শোবক দখল করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে।'

আলেম গুপ্তচর পাশের কক্ষে উপবিষ্ট। সুলতান আইউবীর কক্ষের সব কথাবার্তা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে গোয়েন্দার কক্ষ থেকে। কান খাড়া হয় গোয়েন্দার। পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে দরজা ঘেঁষে বসে সে। সুলতানের পরিষ্কার কণ্ঠ শুনতে পেল গোয়েন্দা–

'আমি ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে চাই। শোবকের তুলনায় কার্ক সহজ শিকার। কার্ক দখল করে তাকেই আমি কেন্দ্র বানাব। কার্ক আক্রমণে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদেরকে কিছুদিন বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে অতিরিক্ত রিজার্ভ সৈন্য তলব করে পূর্ণ প্রস্তুতির পর আমি শোবক আক্রমণ করব। আমাদের গোয়েন্দাদের রিপোর্ট মোতাবেক শোবকের প্রতিরোধ ব্যবস্থা এত শক্ত যে, দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমাদেরকে তা অবরুদ্ধ করে রাখতে হবে। আমার ধারণা, কার্কে আমাদের বেশী শক্তি ব্যয় হবে না। আগে আমাদের একটি ক্যাম্প প্রয়োজন। প্রয়োজন রসদ মজুদের এমন একটি নিরাপদ জায়গা, যেখান থেকে সময়মত রসদ সংগ্রহ করতে আমাদের বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হবে না।'

দরজা ঘেঁষে বসে সুলতান আইউবীর প্রতিটি শব্দ শুনছে আলেম গোয়েন্দা। মেয়ে দু'টোও তার কাছে এসে বসে। সুলতান আইউবীর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পৌঁছে যাচ্ছে শত্রু গোয়েন্দার কানে।

কিন্তু আলী বিন সুফিয়ানের সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। সম্ভবত গোয়েন্দাদের শোবক পর্যন্ত পৌঁছার সম্ভাবনা ক্ষীণ ছিল বলেই আলী বিন সুফিয়ান কোন সাবধানতা অবলম্বন করেননি। যাদের আজীবন কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে কিংবা জল্লাদের হাতে জীবন দিতে হবে, শত্রুর গুপ্তচর হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে গোপন তথ্য জানতে দেয়ায় ক্ষতি কি।

'ইস্, কত মূল্যবান তথ্য! আমরা কেউ যদি এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আইউবীর এ পরিকল্পনার কথা কার্ক ও শোবকে পৌঁছিয়ে দিতে পারতাম!! সংবাদটা

আগেভাগেই জানিয়ে দিতে পারলে কার্কের পথেই গতিরোধ করে মুসলিম বাহিনীর শক্তি নিঃশেষ করে দেয়া যেত। কার্ক পৌঁছার আগেই পরাজিত করা যেত তাদের।' কানে কানে ফিস্‌ফিসিয়ে মেয়েদেরকে বলল গোয়েন্দা।

'আমাদের পরিপূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। আগেই যদি ক্রুসেডাররা আমাদের আক্রমণের খবর পেয়ে যায়, তাহলে আমরা কার্ক পৌঁছুতে ব্যর্থ হব। পথেই তারা আমাদের গতিরোধ করবে। ক্রুসেডারদের তুলনায় আমাদের সৈন্যসংখ্যা কম। অস্ত্র-ঘোড়ায়ও আমরা তাদের তুলনায় দুর্বল। তাদের আছে লোহার শিরস্ত্রাণ। আছে বর্ম। যার কারণে আমাদের তীরান্দাজ বাহিনী ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে একাধিকবার।

ক্রুসেডারদের অজান্তে-ই আমরা কার্ক পৌঁছে যেতে চাই, যাতে তারা খোলা ময়দানে আমাদের মুখোমুখি হতে না পারে। যদি তারা খোলা মাঠে আমাদের মোকাবেলায় আসার সুযোগ পায়, তাহলে পিছনে এসে তারা আমাদের রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দিবে। তখন পরাজয়বরণ ছাড়া আমাদের আর উপায় থাকবে না। কার্ক পৌঁছার জন্য আমি জারিরের টিলা হয়ে অতিক্রম করা পথটি অবলম্বন করব। জারির একটি প্রশস্ত এলাকা। আমার ভয় শুধু একটি-ই যে, ক্রুসেডাররা পথে এসে আমাদের প্রতিরোধ করে বসে কিনা।' বললেন, সালাহুদ্দীন আইউবী।

'এর মোকাবেলায় আমাদের বাহিনীকে আমরা তিন চারটি দলে বিভক্ত করে নেব। পথ চলব শুধু রাতে। দিনের বেলা নড়াচড়া করব না; লুকিয়ে থাকব নিরাপদ স্থানে। পথে অপরিচিত কোন ব্যক্তি বা কাফেলা চোখে পড়লে, আটকে ফেলব এবং কার্ক পৌঁছা পর্যন্ত সঙ্গে রাখব। শত্রুর গোয়েন্দাবৃত্তির বিরুদ্ধে আমাদের এ পদক্ষেপ সুফল বয়ে আনবে বলে আশা করি।' বললেন গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ান।

বন্দী খৃষ্টান গুপ্তচর আর মেয়ে দু'টো যখন সুলতান আইউবীর মুখ থেকে অতি স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ এ তথ্যগুলো শুনছিল, ঠিক সে সময়ে চলছিল শোবক দুর্গে খৃষ্টান রাষ্ট্রপ্রধান ও সেনা কমান্ডারদের জরুরী সভা। সভাসদদের সকলের মুখে বিষন্নতার ছাপ। হাতেমুল আকবর নামক এক মিসরী মুসলমানও সভায় উপস্থিত।

সভার কার্যক্রম শুরু হল। বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করছে হাতেম–

'ক্ষমতাচ্যুতির পর খলীফা আজেদ মারা গেছেন। মিসর এখন বাগদাদের খলীফার অধীনে। খৃষ্টানদের ওফাদার মুসলমান নায়েব সালার রজবও প্রাণ হারিয়েছে রহস্যময়ভাবে। শোবক থেকে রজব যে তিনটি মেয়ে নিয়ে গিয়েছিল, খুন হয়েছে তারাও। খৃষ্টানদের আরেক ওফাদার মুসলিম সেনানায়ক ফয়জুল ফাতেমীও জল্লাদের হাতে মারা পড়েছে। সর্বোপরি দু'টি মেয়েসহ যে আলেম গোয়েন্দাকে কায়রো পাঠান হয়েছিল, মেয়েদেরসহ সেও ধরা পড়েছে। তাদের ধরা পড়ার ঘটনা ঠিক এমন সময়ে ঘটল, যখন তাদের মিশন সফল হওয়ার পথে।' থামল হাতেম।

'সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দা বিভাগ বড় অভিজ্ঞ ও চৌকস। তাদের হাতে বন্দী মেয়েগুলোকে মুক্ত করে আনা অসম্ভব। আমাদের ভাল ভাল মেয়েগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।' বলল, কনরাড। কনরাড খৃষ্টানদের বিখ্যাত এক রাষ্ট্রনায়ক ও সেনা কমাণ্ডার।

'ক্রুশের স্বার্থে এ ত্যাগ আমাদের দিতেই হবে। জীবন দিতে হবে আমাদেরও। আমাদের যারা এ যাবত ধরা পড়েছে, তাদেরকে ভুলে যাও। তাদের স্থলে নতুন লোক পাঠাও।' বলল অপর এক খৃষ্টান রাষ্ট্রনায়ক ও সেনা কমাণ্ডার গাই অফ লুজিনান।

'আচ্ছা, এই যে মুসলমানদের হাতে দু'টি মেয়ে ধরা পড়ল, এরা কারা? আর ঐ রজবের সঙ্গে মারা যাওয়া মেয়ে তিনটি এসেছিল কোথা থেকে?' প্রশ্ন করে লুজিনান।

'তাদের দু'জন ছিল খৃষ্টান। তারা ইটালীর মেয়ে। অপর তিনজন মুসলমান। শৈশবে তাদের অপহরণ করে আনা হয়েছিল। তারা বেশ রূপসী মেয়ে ছিল। তারা যে মুসলিম বাবা-মার সন্তান, তা তারা ভুলেই গিয়েছিল। শিশুকাল থেকে-ই তাদের গোয়েন্দাবৃত্তির প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল। কাজেই এক সময়ে মুসলমান ছিল বলে তারা আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে, এমন সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই।' গোয়েন্দা প্রধান জবাব দেয়।

'ছিল-ই বা মুসলমান, তাতে কি?' বলল কনরাড। হাতেমুল আকবরের প্রতি ইঙ্গিত করে কনরাড বলল, 'এই যে আমাদের প্রিয় বন্ধু হাতেমও তো মুসলমান। নিজ ধর্মের প্রতি অনুরাগ নেই কি তার? তারপরও তো সে আমাদের আপন!'

হাতেমের হাতে মদের গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে কনরাড আরো বলে, 'আমাদের হাতেম জানে যে, সালাহুদ্দীন আইউবী মিসরকে দাসত্বের শৃংখলে আটকাতে চায় এবং ইসলামের নামে তামাশা করছে। আমরা মিসরকে স্বাধীন করতে চাই। তার প্রথম পদক্ষেপ হল, আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীকে মিসরে এক মুহূর্তের জন্য সুস্থির হয়ে বসতে দেব না।'

মদোন্মত্ত হাতেম মাথা নেড়ে সমর্থন জানায়। বলে, 'এবার আমি ওখানে এমন ব্যবস্থা নেব যে, আপনার একজন লোকও আর ধরা পড়বে না।'

'মিসরে যদি আমরা এ অশান্তি সৃষ্টি করে না রাখতাম, তাহলে সালাহুদ্দীন আইউবী বহু আগেই আমাদের উপর হামলা করে বসত। তার শক্তিকে আমরা তারই লোকদের উপর ব্যয় করাচ্ছি, এটা আমাদের কম সাফল্য নয়।' বলল এক খৃষ্টান কমান্ডার।

'আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ানকে দুনিয়া থেকে বিদায় করার কোন ব্যবস্থা এখনো হয়নি?' জানতে চায় কনরাড।

'কয়েকবার চেষ্টা করেছি স্যার! কিন্তু কামিয়াব হইনি। ব্যর্থতার কারণ, লোক দু'টো পাথরের মত শক্ত। না তারা মদ স্পর্শ করে, না নারীর প্রতি তাদের দুর্বলতা

আছে। এ কারণে মদে কিছু মিশিয়েও তাদেরকে হত্যা করা যায় না, নারী দিয়েও কাবু করা যায় না। তবে আমরা নিরাশ নই। ব্যবস্থা একটা করে রেখেছি।

আইউবীর দেহরক্ষীদের মধ্যে চারজন-ই আমাদের ফেদায়ী। বড় বুদ্ধিমত্তার সাথে আমার তাদেরকে ঐ পর্যন্ত পৌঁছাতে হয়েছে। সুযোগ পেলেই ওরা তাদের দু'জনকে, অন্তত একজনকে খতম করে ফেলবে।' গোয়েন্দা প্রধান জবাব দেয়।

'আচ্ছা, আমাদের এখানেও আইউবীর গোয়েন্দা আছে নাকি?' জিজ্ঞেস করে লুজিনান।

'অবশ্যই। যখন থেকে আমরা মিসর ও সিরিয়ায় আমাদের গুপ্তচরবৃত্তি এবং নাশকতামূলক কার্যক্রম শুরু করি, তখন-ই আইউবী আমাদের এদিকে চর পাঠিয়ে দিয়েছে। আমাদের হাতে দু'জন ধরাও পড়েছে। কিন্তু নির্যাতনের মুখে ওরা জীবন দিয়েছে ঠিক, তৃতীয় কোন সহকর্মীর নাম বলেনি।' গোয়েন্দা প্রধান জবাব দেয়।

'তাদের সফলতার পরিমাণ কী?' জানতে চায় লুজিনান।

'স্যার! কার্কে আমাদের গুদামে আগুন লেগে যে অর্ধেক রসদ পুড়ে গিয়েছিল, জীবন্ত জ্বলে গিয়েছিল এগারটি ঘোড়া, তা আইউবীর এই সন্ত্রাসী গুপ্তচরদের-ই কাজ ছিল। আমি আপনাকে আরো জানাতে পারি যে, আমাদের যুদ্ধের ধরন ও কৌশলের পুংখানুপুংখ রিপোর্ট আইউবীর কানে পৌঁছে যায় যথাসময়ে। আমি আইউবীর গুপ্তচরদের প্রশংসা না করে পারছি না যে, ওরা জীবন বাজি রেখে পরম নিষ্ঠা ও আমানতদারীর সাথে দায়িত্ব পালন করে থাকে।' জবাব দেয় অপর একজন।

দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত চলে এই সভা। মিসর ও সিরিয়ায় নাশকতামূলক কর্মতৎপরতা কিভাবে আরো জোরদার, আরো ধ্বংসাত্মক করা যায়, সে বিষয়ে চুলচেরা আলোচনা হয়। হাতেমুল আকবর সভাসদদের সামনে সুলতান আইউবীর সরকারের দুর্বলতা-সবলতার দিকগুলোর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। অবশেষে হাতেমুল আকবরকে আরো কিছু লোক ও দু'-তিনটি মেয়ে প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

✿ ✿ ✿

দু' নায়েব এবং আলী বিন সুফিয়ানকে কার্ক আক্রমণের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করছেন সুলতান আইউবী। বিশদিন পর তাঁর বাহিনী রওনা হবে বলে জানালেন। পাশের কক্ষ থেকে আলেম গোয়েন্দা এবং মেয়ে দু'টো সব শুনে ফেলে। তারা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে ফেলে। আলেম গোয়েন্দা অনুশোচনা ব্যক্ত করে, এত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, অথচ শোবকে তা পৌঁছাতে পারছে না সে।

'আমি সালাহুদ্দীন আইউবীকে বাগে আনার চেষ্টা করব। স্বল্প সময়ের জন্য হলেও যদি তিনি আমাকে নির্জনে তার সঙ্গে থাকার সুযোগ দেন, তাহলে আমি আমার মুক্তি আদায় করে নিতে পারব। তার বিবেক-বুদ্ধি কব্জা করতে পারব বলে আমি আশাবাদী।' বলল এক মেয়ে।

'তিনি আমাদেরকে কেন ডাকলেন, বুঝতে পারছি না। তবে মনে রাখবে, যদি তোমাদেরকে একজন একজন করে হাজির করা হয়, তাহলে তাকে পশুতে পরিণত করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। যদি মদ খাওয়াতে সক্ষম হও, তাহলে অচেতন করতে হলে কি পরিমাণ খাওয়াতে হবে, তা তোমাদের জানা আছে। তারপর পালাবার পদ্ধতিও তোমাদের অজানা নয়। পালিয়ে গিয়ে প্রথমে কার নিকটে পৌঁছতে হবে তা-ও তোমাদের জানা। মনে আছে তো? তার ঘর মসজিদের ঠিক বিপরীতে।' বলল গোয়েন্দা।

'আমি জানি– মাহদী আবাদান তার নাম।' বলল মেয়েদের একজন।

হ্যাঁ, তোমরা যদি মাহদী পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পার, তাহলে তোমাদেরকে শোবকে পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব তার। আমার পালাবার প্রশ্নই আসে না। আইউবীর পরিকল্পনা সবই তোমরা শুনেছ। মুসলিম বাহিনীর রওনা হওয়ার তারিখটা মনে রেখ। তারা কোন্ পথে যাবে, তাও ভুলো না। তারা পথ চলবে রাতে। দিনের বেলা তারা নড়াচড়া করবে না। আমি আশা করি, আগেভাগে তথ্যগুলো পৌঁছিয়ে দিতে পারলে আমাদের বাহিনী আইউবীকে পথেই প্রতিরোধ করতে পারবে। আর এটিই আইউবীর একমাত্র ভয়। শোবকে গিয়ে বিশেষভাবে একথাও জানাবে যে, আইউবী মুক্ত মাঠে মুখোমুখি লড়াই করতে ইচ্ছুক নয়। কারণ, তার সৈন্য কম।' বলল আলেম গোয়েন্দা।

বৈঠক সমাপ্ত হয়। যার যার মত চলে যান নায়েবগণ। টের পেয়ে দ্রুত আপন আপন জায়গায় গিয়ে বসে তিন গোয়েন্দা। আলেমের পরামর্শে মেয়ে দু'টো দুই হাটুর মাঝে মাথা লুকিয়ে বসে থাকে, যেন তারা কিছুই শুনেনি। আশপাশের কোন খবরই তারা রাখে না যেন।

তারা কক্ষে কারো পায়ের আওয়াজ শুনতে পায়। তবু কেউ মাথা তুলছে না। আলী বিন সুফিয়ান আলেম গোয়েন্দার কাঁধে হাত রাখেন। বললেন, 'উঠ, আমার সঙ্গে চল।'

এবার মাথা তুলে তাকায় গোয়েন্দা। মেয়ে দু'টোকেও উঠিয়ে আনেন আলী। নিয়ে যান সুলতানের কক্ষে।

বন্দী গোয়েন্দাদের শৃংখল খুলে দেয়ার আদেশ দেন সুলতান। কর্মকার আনার জন্য আলী বাইরে বেরিয়ে পড়েন। সুলতান বসতে বললেন তিনজনকে। তারপর আলেম গোয়েন্দার উদ্দেশে বললেন–

'আমি তোমার ইলম ও বিচক্ষণতাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তুমি তোমার বিদ্যাকে শয়তানী কাজে ব্যবহার করছ। এই অপকর্মের স্থলে যদি তুমি এদেশে এসে নিজ ধর্ম প্রচার করতে, তাহলে এই ভেবে আমি মনের গভীর থেকে তোমাকে শ্রদ্ধা করতাম যে, তুমি নিজ ধর্ম ও নবীর খেদমত করছ। বল তো, তোমার ধর্ম কি তোমাকে অন্য

ধর্মের ইবাদতখানায় বসে সেই ধর্মে মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটানোর বৈধতা স্বীকার করে? তোমার হৃদয়ে কি তোমার 'পবিত্র' ক্রুশ, নবী ঈসা ও কুমারী মাতা মরিয়মের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধও আছে? যদি থাকে, তাহলে মিথ্যা ও শয়তানী কর্মকান্ডের মত কবীরা গুনায় লিপ্ত হয়ে তুমি তাদের ইবাদত কর কিভাবে?'

'এ মিথ্যাচার আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। আমি যা কিছু করেছি, ক্রুশের জন্য-ই করেছি।' বলল গোয়েন্দা।

'তোমার দাবী অনুযায়ী তুমি গভীরভাবে ইঞ্জীল ও কুরআন অধ্যয়ন করেছ। বল, এই দুই আসমানী কিতাবের একটিতেও কি এই অনুমতি দেয়া আছে যে, এ রকম উদ্ভিন্ন-যৌবনা যুবতীদেরকে কুকর্মের পথে নিক্ষেপ করবে এবং পর পুরুষের কাছে পাঠিয়ে উদ্দেশ্য হাসিল করবে? ইঞ্জীল কি তোমাদের বলেছে যে, ক্রুশের খাতিরে তোমরা জাতির সুন্দরী মেয়েগুলোর ইজ্জত অন্যের হাতে তুলে দাও? তুমি কি কোন মুসলমান মেয়েকে কুরআন ও ইসলামের নামে নিজের ইজ্জত পরপুরুষের হাতে তুলে দিতে দেখেছ কখনো? বললেন আইউবী।

'ইসলামকে আমি খৃষ্টবাদের প্রতিদ্বন্দ্বি মনে করি। যখন-ই যে বিষ হাতে পাব, তা-ই আমি ইসলামের শিরায় শিরায় মিশিয়ে ছাড়ব।' বলল গোয়েন্দা।

'মধুর বিষ দিয়ে তোমরা গুটিকতক মুসলমানের চরিত্র হনন করতে পারবে জানি; কিন্তু তোমরা ইসলামের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না।' শান্ত-সমাহিত কণ্ঠে বললেন আইউবী।

এবার মেয়ে দু'টোর প্রতি দৃষ্টিপাত করে সুলতান বললেন–

'তোমরা কোন্ বংশের মেয়ে জানা আছে তোমাদের? বল, তোমাদের আসল পরিচয় কি?'

দু'জন-ই নীরব। কারো মুখে রা নেই।

'নৈতিক ও চারিত্রিক পবিত্রতা তো সব শেষ করেছ। এখন কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের কারুর স্ত্রী হয়ে জীবন অতিবাহিত করার ইচ্ছা আছে তোমাদের?' জিজ্ঞেস করেন আইউবী।

প্রশ্নটা লুফে নেয় এক মেয়ে। আইউবীকে টোপ দেয়ার জন্য এমন একটি মোক্ষম প্রশ্ন-ই দরকার ছিল তার। বলল, 'আমি সম্মানিত স্ত্রী হয়ে বাকী জীবন কাটাতে চাই। আপনি কি আমায় গ্রহণ করবেন? আপনি যদি গ্রহণ না করেন, তাহলে আমাকে অন্য একজন সম্ভ্রান্ত স্বামীর ব্যবস্থা করে দিন। ইসলাম কবুল করে অতীতের সব পাপ থেকে আমি তাওবা করব।

স্মিত হাসলেন আইউব। তারপর খানিক ভেবে বললেন–

'আমি চাই না, এ আলেমের ইল্‌ম জল্লাদের তরবারীর খুনে ভেসে যাক্। আমি এ-ও চাই না যে, তোমাদের দু'জনের রূপ-যৌবন আমার বন্দীদশার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে

গলে-পঁচে নিঃশেষ হোক। শোন মেয়ে! সত্যিই যদি অতীতের পাপাচার থেকে তাওবা করতে চাও, তাহলে আমি তোমাদের মুক্তি দিয়ে তোমাদের জন্মভূমিতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তবে মনে রেখ, ঐ দেশ তোমাদের নয়– আমাদের। একদিন না একদিন আমি তোমাদের রাজাদের হাত থেকে আমার দেশকে উদ্ধার করব-ই। যাও; দেশে গিয়ে একজন ভদ্র পুরুষের স্ত্রী হয়ে পবিত্রতার সাথে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দাও। আমি তোমাদের তিনজনকেই মুক্তি দিলাম।'

'হঠাৎ চমকে উঠে তিন গোয়েন্দা। যেন সুঁই ফুটানো হয়েছে তাদের গায়ে। ইত্যবসরে কক্ষে প্রবেশ করেন আলী বিন সুফিয়ান। সঙ্গে তার এক কর্মকার। শৃংখল খুলে দেয়া হয় তিনজনের। সুলতান বললেন, আলী! আমি এদেরকে মুক্তি দিয়েছি। শুনে আলী তদ্রূপ বিস্মিত হলেন। দীর্ঘক্ষণ অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকেন সুলতানের মুখের দিকে। সুলতান বললেন, 'এদেরকে তিনটি উটে তুলে দাও। চারজন দক্ষ, বিচক্ষণ ও সাহসী অশ্বারোহী সশস্ত্র রক্ষী সঙ্গে দাও। তারা এদেরকে শোবক দুর্গে রেখে ফিরে আসবে। জরুরী পাথেয়-সামানও সঙ্গে দিয়ে দাও আর আজই এদের বিদায় করে দাও।'

আলেম গোয়েন্দার উদ্দেশে সুলতান বললেন–

'ওখানে গিয়ে এ ভুল প্রচার করো না যে, সালাহুদ্দীন আইয়ূবী গোয়েন্দাদের ক্ষমা করে দেয়। গোয়েন্দাদেরকে চাক্কিতে দানা পেষার মত পিষে পিষে নিঃশেষ করা-ই আমার নিয়ম। তুমি একজন আলেম বলেই আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। আমি তোমাকে ইলমের আলো ছড়ানোর সুযোগ দিলাম।'

✿ ✿ ✿

সূর্য এখনো অস্ত যায়নি। তিনটি উটে সাওয়ার হয়ে চারজন দেহরক্ষীর সঙ্গে রওনা হয় তিন গোয়েন্দা। দেহরক্ষী চারজন মুসলিম সেনাবাহিনীর বাছাইকরা লোক। সুশ্রী, সুঠাম, বলিষ্ঠ, সাহসী ও ব্যক্তিত্ববান সৈনিক তারা। সুলতানের নির্দেশে আলী বিন সুফিয়ান দেখে-শুনেই এদের নির্বাচন করেছেন। তার কারণ দু'টি। প্রথমতঃ পথে তাদের পদে পদে দুস্যু-ডাকাতের মোকাবেলা করতে হবে। এর জন্য শক্তি-সামর্থ ও সাহসের প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ গোয়েন্দাদের পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য তাদের খৃষ্টান সেনাকমান্ডারদের মুখোমুখি হতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। সঙ্গে দেয়া উট-ঘোড়াগুলোও অতি উন্নত।

কিন্তু সুলতান আইউবী এই ব্যতিক্রমী উদারতা কেন দেখালেন, ভেবে সবাই হতবাক। দুশমনকে ক্ষমা করা তো তার স্বভাব নয়! সবিনয়ে ঘটনার রহস্য জানতে চান আলী বিন সুফিয়ান। জবাবে সুলতান শুধু বললেন–

'আলী! তোমাকে বলেছিলাম, আমি একটি জুয়া খেলতে চাই। এবার সেই জুয়ার বাজি-ই লাগালাম। বাজিতে যদি হেরে যাই, তাহলে ক্ষতি শুধু এতটুকু-ই হবে যে, তিনজন শত্রু গোয়েন্দা আমার হাতছাড়া হয়ে গেল।'

বিস্তারিত জানতে চান আলী। কিন্তু সুলতান এ পর্যন্ত-ই কথার ইতি টেনে বললেন, 'ধৈর্য ধর আলী! সময়মত সব জানতে পারবে।'

মুক্তিপ্রাপ্ত তিন গোয়েন্দা আনন্দচিত্তে এগিয়ে চলছে শোবক অভিমুখে। তাদের এই আনন্দ শুধু মুক্তির আনন্দ নয়। এ মুহূর্তে তাদের আনন্দের মূল কারণ, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য, যা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা শোবকে।

কায়রো শহর ত্যাগ করে বহুদূর এগিয়ে গেছে সাতজনের কাফেলা। তিন গোয়েন্দার উট তিনটি পাশাপাশি চলছে। চার দেহরক্ষীর দু'জন সামনে আর দু'জন পিছনে।

পথ চলতে চলতে আলেম গোয়েন্দা মেয়েদের উদ্দেশে বলে, 'আমাদের খোদা ঈসা মসীহ্ মোজেজা দেখালেন। এতে প্রমাণিত হয়, আমাদের তিনি ভালবাসেন এবং আমাদেরকে বিজয় দান করবেন। এটি আমাদের ধর্মের সত্যতার লক্ষণ। খোদা সালাহুদ্দীন আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ানের মত বিচক্ষণ লোকের বিবেক অন্ধ করে দিয়েছেন। যার ফলে এত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের কানে দিয়ে তিনি আমাদেরকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। এ তথ্য পেলে আমাদের সৈন্যরা আইউবীর বাহিনীকে খোলা মাঠে ঘিরে ফেলেই নিঃশেষ করে দেবে। বেটারা কার্ক পৌঁছার সুযোগই পাবে না। আমার আশা, আমাদের কমাণ্ডার যুদ্ধ আক্রমণ পর্যন্তই সীমিত রাখবেন না– মিসরেও চড়াও হবেন। পতন ঘটবে আইউবীর। অতি অনায়াসে প্রতিষ্ঠিত হবে আমাদের ক্রুশ।

'আপনি অভিজ্ঞ আলেম। কিন্তু আপনি যাকে মোজেজা বলছেন, আমার কাছে তা বিপদ বলে মনে হচ্ছে। বিপদ হল এই চার দেহরক্ষী। বিচিত্র কি যে, সামনে কোথাও গিয়ে এরা আমাদেরকে হত্যা করে ফিরে যাবে। এমনও তো হতে পারে যে, আইউবী আমাদের সঙ্গে উপহাস করেছেন। জল্লাদের হাতে অর্পণ না করে তিনি আমাদেরকে তুলে দিয়েছেন এদের হাতে। নিরাপদ কোন স্থানে গিয়ে এরা মনভরে আমাদেরকে উপভোগ করবে। তারপর খুন করে ফিরে যাবে!' বলল এক মেয়ে।

'আর আমরা তো নিরস্ত্র। তোমার আশংকা উড়িয়ে দেয়া যায় না। কোন রাষ্ট্রনায়ক তার গোয়েন্দাকে এভাবে ক্ষমা করতে পারেন না। তাছাড়া মুসলমান এতই যৌনবিলাসী জাতি যে, তারা তোমাদের মত সুন্দরী মেয়েদের নাগালে পেয়ে হাতছাড়া করতে পারে না।' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল আলেম গোয়েন্দা। যেন সব আনন্দ, সব স্বপ্নসাধ উড়ে গেছে তার মন থেকে। চেহারায় তার নিদারুণ হতাশার ছাপ। মেয়েটির কল্পিত বিপদের আশংকা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তাকেও।

'আমাদের চোখ-কান খোলা রেখে সতর্কতার সাথে রাত কাটাতে হবে। রাতে যখন এরা ঘুমিয়ে পড়বে, তখন এদের অস্ত্র দিয়ে-ই এদের খুন করতে হবে। আমাদের প্রয়োজন শুধু একটু সাহস।' বলল অপর মেয়ে।

'এতটুকু সাহস আমাদের করতেই হবে। কাজটা আজ রাতেই হয়ে গেলে ভাল হয়। সকাল পর্যন্ত আমরা অনেক পথ এগিয়ে যেতে পারব।' বলল আলেম।

তিন গোয়েন্দার আগে-পিছে দু'জন করে চার দেহরক্ষী গল্প-গুজবের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে। তাদের ভাব-গতিতে মনে হচ্ছিল, দু'টি হৃদয়কাড়া রূপসী যুবতী যে তাদের হাতের মুঠোয়, সে খবর-ই তাদের নেই।

বেলা শেষে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবি ডুবি করছে। ধীরে ধীরে ঘনিভূত হচ্ছে তিন গোয়েন্দার বিপদ-শংকা। মেয়ে দু'টোর একজন আলেমকে বলে, আমরা এখন কোথাও থামব না। রাতের প্রথম প্রহরটি এভাবে অতিক্রম করেই কাটিয়ে দেব।

চলতে থাকে কাফেলা। মরুভূমির রাত আঁধারে ছেয়ে যায়। উট তিনটি কাছাকাছি এনে তিন গোয়েন্দা আরো ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে। তারা দেহরক্ষীদের হত্যা করার পরিকল্পনা আঁটতে শুরু করে।

দীর্ঘক্ষণ পর এক সবুজ-শ্যামল স্থানে এসে পৌঁছে কাফেলা। থেমে যায় দেহরক্ষীগণ। তাঁবু ফেলে সেখানে। গোয়েন্দাদের আহারের ব্যবস্থা করে। নিজেরাও আহার করে। তারপর শোয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

চার মুসলিম দেহরক্ষীকে হত্যা করার পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে শুয়ে পড়ে তিন গোয়েন্দা। সুযোগের সন্ধান করছে তারা। দৃষ্টি তাদের দেহরক্ষীদের প্রতি নিবদ্ধ।

চার দেহরক্ষীর তিনজন শুয়ে পড়ে। টহল দিচ্ছে একজন। নিজেদের তাঁবুর চারদিকে পায়চারী করছে সে। হঠাৎ কেমন যেন একটা সন্দেহ জাগে তার মনে। দৌড়ে যায় গোয়েন্দাদের তাঁবুর দিকে। দেখে-শুনে ফিরে আসে আবার।

এভাবে দু'ঘন্টা কেটে যায়। তারপর সে অপর এক সঙ্গীকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে। নিজে শুয়ে পড়ে তার জায়গায়। নতুনজন চারদিক টহল দিতে থাকে। একবার পশুগুলোর কাছে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করে, আবার ঘুমন্ত লোকদের কে কি অবস্থায় আছে, লক্ষ্য করে দেখে। এবার আলেম গোয়েন্দা মেয়েদের ফিস্‌ফিসিয়ে বলে, 'বোধ হয় আমরা সফল হতে পারব না। বেটারা পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে। চিন্তা করে লাভ নেই। ঘুমিয়ে পড়; কপালে যা আছে, তা-ই হবে।'

গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তিন গোয়েন্দা।

রাতের শেষ প্রহর। এখনো আবছা অন্ধকার। তবে ভোর হলো বলে। রক্ষীরা জাগিয়ে তোলে গোয়েন্দাদের। শুরু হয় পুনরায় পথচলা। আগের নিয়মেই রওনা হয় তারা। তিন গোয়েন্দা পাশাপাশি। রক্ষীদের দু'জন সামনে দু'জন পিছনে।

সূর্য উদিত হয়। ধীরে ধীরে প্রখর হতে থাকে রোদের কিরণ। কাফেলাও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে গন্তব্যপানে।

উঁচু-নীচু এক পার্বত্য এলাকায় ঢুকে পড়ে কাফেলা। এদিক-সেদিক মাটি আর বালির পাহাড়। দাঁড়িয়ে আছে বাঁকা দেয়ালের মত। দুই পাহাড়ের মধ্যখানে সরু

গলিপথ। পথের উপর দু'দিকের পাহাড়ের ভূতুড়ে ছায়া। ভয়ে মেয়েদের গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠে। ভীতির ছাপ পরিষ্কার ফুটে উঠেছে তাদের চেহারায়। তাদের দৃষ্টিতে কু-কর্ম আর খুন করার বড় উপযুক্ত স্থান এটি। ওসবের জন্যই বোধ হয় রক্ষীরা তাদের এ পথে নিয়ে এসেছে।

'ওদেরকে আমাদের সাথে কথা বলতে বলুন। ওদের নীরবতা আর সম্পর্কহীনতার কারণে আমার ভয় লাগছে। বলুন, যদি ওরা আমাদেরকে খুন-ই করতে চায়, বিলম্ব না করে করে ফেলুক। মৃত্যুর অপেক্ষা করতে আমার কষ্ট হচ্ছে।' বলল এক মেয়ে।

আলেম কথা বলছে না। মেয়েদের কোন সহযোগিতা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তারা তিনজনই এখন মুসলিম রক্ষীদের দয়ার উপর নির্ভরশীল।

বেলা দ্বি-প্রহর। সূর্য এখন মাথার উপর। থেমে যায় কাফেলা। টিলার ছায়ায় অবস্থান নেয় তারা। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে খেতে বসে সবাই। আহারের মাঝে এক পর্যায়ে আলেম গোয়েন্দা রক্ষীদের জিজ্ঞেস করে, 'আমাদের সাথে তোমরা কথা বলছ না কেন?'

'আমরা কর্তব্যের অতিরিক্ত কথা বলি না। তোমাদের বিশেষ কোন কথা থাকলে বলতে পার, আমরা শুনব, প্রয়োজনে জবাব দেব।' বলল রক্ষীদের কমান্ডার।

'তোমাদের কি জানা আছে, আমরা কারা?' জিজ্ঞেস করে আলেম।

'তোমরা তিনজন গুপ্তচর। মেয়ে দু'টো কুলটা। যাদেরকে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চাও, এরা তাদের ভোগের সামগ্রী। জানি না, মিসরের আমীর সালাহুদ্দীন আইউবী কেন তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন! তোমাদেরকে শোবক দুর্গে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তোমরা আমাদের আমানত . . .। কিন্তু একথা জিজ্ঞেস করলে কেন?' বলল রক্ষী কমান্ডার।

'মন চাইছিল তোমাদের সাথে কথা বলি। আমরা ক্ষণিকের সহযাত্রী ঠিক; কিন্তু আমাদের গন্তব্য এক, তোমাদের গন্তব্য অন্য। দু'দিন পর আমরা তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে যাব।' বলল কমান্ডার।

রক্ষীর জবাব যেন কানেই গেল না গোয়েন্দার। দূরের কি একটি বস্তু অবলোকন করছে যেন তার দু' চোখ। চকিত নয়নে এক নাগাড়ে তাকিয়ে আছে ওদিকে। ধীরে ধীরে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে গোয়েন্দা। চোখে-মুখে তার ভীতির ছাপ। ভয়ংকর কি যেন দেখেছে সে।

রক্ষী কমান্ডারও চোখ তুলে তাকান সেদিকে। শংকিত হয়ে উঠেন তিনিও। বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ।

দু'শ গজ দূরে এক স্থানে দাঁড়িয়ে আছে দু'টি উট। পিঠে দু'জন মানুষ। মাথায় পাগড়ি। মুখমন্ডল কাপড়ে ঢাকা। সওয়ার নির্নিমেষ চক্ষে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে

রক্ষী ও গোয়েন্দাদের কাফেলার প্রতি। তাদের গতিবিধি আর পোষাক-ই বলে দিচ্ছে, তারা কারা।

'জান, ওরা কারা?' রক্ষী কমান্ডার প্রশ্ন করে আলেমকে।

'মরু ডাকাত। কি জানি, ওরা ক'জন!' জবাব দেয় আলেম।

'দেখা যাবে।' বলেই রক্ষী কমান্ডার উঠে দাঁড়ান। এক সঙ্গীকে বলেন, 'আমার সঙ্গে এস।'

ঘোড়ায় চড়ে দুই রক্ষী ডাকাতদের দিকে ছুটে যায়। তারা অস্ত্রসজ্জিত। সাথে তরবারী ছাড়াও আছে বর্শা। কাফেলা থেকে দু'জন লোক ছুটে আসতে দেখে উষ্ট্রারোহীরা টিলার পিছনে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বাকী দুই রক্ষী নিকটতম টিলায় উঠে পড়ে। আলেম মেয়েদের উদ্দেশে বলে, 'বোধ হয় তোমাদের আশংকা-ই সত্যে পরিণত হতে যাচ্ছে। ওরা ডাকাত নয়– সালাহুদ্দীন আইউবীর পাঠানো লোক বলেই মনে হয়। না হলে রক্ষী দু'জন এত বীরদর্পে তাদের কাছে গেল কেন! তোমাদেরকে চরমভাবে অপদস্ত করতে চায় আইউবী। তোমাদের বড় ভয়ানক শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর আমার জন্য মৃত্যু তো অবধারিত।'

'তার মানে, আসলে আমরা মুক্তি পাইনি। এখনো আমরা আইউবীর কয়েদী।' বলল, মেয়েদের একজন।

'তা-ই তো মনে হয়।' বলল অপরজন।

খানিক পর।

ফিরে আসে দুই মুসলিম রক্ষী। টিলা থেকে নেমে আসে সঙ্গীদ্বয়। তাদের চারপাশে জড়ো হয় সবাই।

রক্ষী কমান্ডারের নাম হাদীদ। হাদীদ জানায়–

ওরা মরুদস্যু। আমরা তাদের সাথে দেখা করে এসেছি। সংখ্যায় ওরা ক'জন, জানতে পারিনি। যে দু'জনকে আমরা উটের পিঠে দেখেছিলাম, তারা জানায়, আজ ভোর থেকেই তারা আমাদের পিছু নিয়েছে। তারা আমাকে বলে, 'তোমরা ফৌজের লোক। মুসলমান বলে মনে হয়। কিন্তু মেয়ে দু'টো মুসলমান নয়। মেয়েদেরকে আমাদের হাতে তুলে দাও; তোমাদেরকে বিরক্ত করব না।' আমি বললাম, মেয়ে দু'টো যে ধর্মের-ই হোক; আমাদের হাতে আমানত। জীবন থাকতে আমরা ওদেরকে তোমাদের হাতে অর্পণ করতে পারব না। আমাকে তারা সাধের জীবনটা না খোয়াবার পরামর্শ নেয়। আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করে। আমি ওদের সাফ বলে এসেছি, আগে আমাদেরকে খুন কর, পরে ওদেরকে নিয়ে নাও।

'তোমরা কি অস্ত্র চালাতে জান?' গোয়েন্দাদের জিজ্ঞেস করে রক্ষী কমান্ডার।

'আমরা মেয়েদেরকে যে কোন অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। তোমাদের

কাছে তো বর্শা-তীর-কামান সবই আছে। তার থেকে একটি একটি করে দাও না আমাদের!' বলল আলেম।

'এখন নয়। সংঘর্ষ শুরু হোক, তখন দেব।' বললেন হাদীদ। সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয় গোয়েন্দাদের।

রক্ষী কমান্ডার বললেন, 'উট-ঘোড়ায় চড়ে লড়াই করার জন্য এ জায়গা উপযোগী নয়। এক্ষুণি আমাদের এ স্থান ত্যাগ করতে হবে।' বলেই এক লাফে ঘোড়ায় উঠে রওনা দেয় হাদীদ।

রক্ষীরা তীর-কামান হাতে নেয়। তূনীরের মুখ খুলে নেয়। ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলে তারাও। মেয়েদের নিয়ে আলেম গোয়েন্দাও এগিয়ে চলে।

এক সঙ্গীসহ হাদীদ সকলের আগে। সঙ্গী তাকে বলে, 'ওদের হাতে অস্ত্র দেয়া ঠিক হবে না। শত হলেও ওরা আমাদের শত্রু। অস্ত্র পেলে ওরা ডাকাতদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাদেরকে মেরে ফেলতে পারে।'

'ওরা আমাদের অস্ত্র দিতে অস্বীকার করল। ওদের মনোভাব ভাল নয়। ডাকাতরা ওদের-ই লোক। তোমাদের দু'জনকে ওরা ডাকাতদের হাতে তুলে দেবে আর আমাকে খুন করে ফেলবে।' মেয়েদের উদ্দেশে বলল গোয়েন্দা।

'মুখোশপরা কাউকে দেখামাত্র তীর ছুঁড়বে। আমার নির্দেশের অপেক্ষা করবে না। যখন হোক, যেখানে হোক, ডাকাতদের সঙ্গে সংঘর্ষ হবেই।' রক্ষীদের আগেই বলে দেন হাদীদ।

বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে চলে কাফেলা। মাঝে-মধ্যে থেমে উট-ঘোড়াকে দানা-পানি খাইয়ে নিচ্ছে। তাই পথ চলায় ক্লান্তি নেই ওদের।

উঁচু-নীচু পার্বত্য এলাকা যেন ফুরাতে চায় না। মাঝে-মধ্যে পথের দু'ধারে উঁচু উঁচু টিলা। হাদীদ ভয় পান টিলার উপর থেকে ডাকাতরা তীর ছোঁড়ে কিনা। সতর্ক করে দেন তিনি সঙ্গীদের। গোয়েন্দাদেরও বলে দেন, যেন তারা উটের গতি বাড়িয়ে ঘোড়ার সমানে চলে আর উপর দিকে লক্ষ্য রাখে।

পার্বত্য এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে আসে কাফেলা। কোন ডাকাত চোখে পড়েনি। পশ্চিম আকাশে সূর্য নীচে নামতে শুরু করে। একবার দূরে ছায়ার মত দু'টি উট চোখে পড়ল। কাফেলা যেদিকে যাচ্ছে, উট দু'টোও সেদিকে এগুচ্ছে বলে মনে হল। দ্রুত এগিয়ে চলছে কাফেলা।

পথে একস্থানে পানি পাওয়া গেল। থামল কাফেলা। উট-ঘোড়াকে পানি পান করাল। নিজেরাও পান করল। আবার ছুটে চলল।

সূর্য আরো নীচে নেমে আসে। সাঝের আবছা আঁধারে ছেয়ে যায় প্রকৃতি। কাফেলাকে থামান হাদীদ। বলেন, 'যুদ্ধের জন্য এটি উপযুক্ত জায়গা। এখানে আশে-পাশে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।'

হাদীদ ঘোড়াগুলোর জিন খুললেন না, যাতে প্রয়োজনের সময় প্রস্তুত পাওয়া যায়। উটগুলোকে বসিয়ে দেন। আহারাদি সেরে হাদীদ মেয়েগুলোকে এক স্থানে শুইয়ে দেন। সতর্ক থাকতে বলে দেন তাদের। রক্ষীদেরকে তীর-কামান প্রস্তুত রাখতে বলেন। বলেন, চোখ-কান খোলা রেখে শুয়ে থাকতে। হাদীদ নিশ্চিত, রাতে যে কোন সময় আক্রমণ হবেই।

❁ ❁ ❁

মধ্য রাত। শান্ত-নিস্তব্ধ মরুভূমি। হঠাৎ কিসের যেন শব্দ শুনতে পায় কাফেলা। কান খাড়া করে সবাই। চকিতে চোখ তুলে তাকান হাদীদ। ভূত! ভূতের ন্যায় বড় বড় ছায়ামূর্তি দৌড়াচ্ছে কাফেলার চারদিকে। অনেকগুলো উটের পায়ের আওয়াজ স্পষ্ট কানে আসছে। মাটি যেন থর থর করে কাঁপছে। উটের সংখ্যা দশেরও বেশী বলে মনে হল। একটিতে একজন করে আরোহী। কাফেলার মনে আতংক সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে তারা।

তিন চারটি চক্কর দিয়ে নিকটে এসে হাঁক দেয়, 'মেয়ে দু'টোকে আমাদের হাতে তুলে দাও। আমরা তোমাদের আর কিছু চাই না; ওদের নিয়েই ফিরে যাব।'

শুয়ে শুয়ে-ই হাদীদ প্রথম তীর ছুঁড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বিকট এক আর্তচীৎকার ভেসে আসে। অন্য রক্ষীরাও শোয়া অবস্থাতেই তীর চালাতে শুরু করে। দু'টি উটের গোংগানীর শব্দ শোনা যায়। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দস্যুদলের উট দু'টো।

হাদীদ মেয়েদের বলেন, 'পালাবার চেষ্টা কর না, আমাদের সঙ্গে থাক।'

দস্যুদের একজন বলল, 'আক্রমণ কর, ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়। একজনকেও প্রাণে বাঁচতে দিওনা। মেয়েদের তুলে আন।'

জোৎস্না না থাকলেও মরুভূমির রাত বেশ ফর্সা। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। উটের পিঠ থেকে নেমে আসে দস্যুদল। তরবারী আর বর্শা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাফেলার উপর। হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়। দু' পক্ষের হাঁক-ডাকে নিঝুম রাতের নীরবতা ভেঙ্গে যায়। হাদীদ ও তার সঙ্গীরা নিজেরা ঢাল হয়ে দস্যুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করছে মেয়েদের। অস্ত্র চায় মেয়েরা। নিজের তরবারী দিয়ে দেন হাদীদ। নিজে বর্শা দিয়ে-ই মোকাবেলা করছেন তিনি। হাদীদের তরবারী হাতে নিয়ে এক মেয়ে রক্ষীদের নিরাপদ বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে যায়। আলেম গোয়েন্দার সাড়াশব্দ নেই।

দীর্ঘক্ষণ চলে এ সংঘর্ষ। ধীরে ধীরে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যোদ্ধারা। রক্ষীরা একে অপরকে ডাকতে থাকে। এক সময়ে তাদের ডাক-চীৎকারও বন্ধ হয়ে যায়। রণাঙ্গনের হট্টগোলও কমে আসে।

হাদীদ তার সঙ্গীদের ডাকেন। কিন্তু কোন জবাব পাচ্ছেন না তিনি। একটি মেয়ের কণ্ঠ শুনতে পান হাদীদ। মেয়েটি চীৎকার করে ডাকছে তাকে। সাথে একটি ঘোড়ার তীব্রগতিতে ছুটে চলার শব্দও শোনা গেল। হাদীদ বুঝতে পারেন, কোন ডাকাত এক

মেয়েকে উটের পরিবর্তে তাদেরই ঘোড়ায় তুলে নিয়ে যাচ্ছে। দ্রুত একটি ঘোড়ায় চড়ে বসেন হাদীদ। পলায়নপর ঘোড়ার অনুসরণ করেন তিনি।

বিদ্যুদ্গতিতে ছুটে চলছে তাঁর ঘোড়া। সমতল মরুভূমিতে কোন বাঁধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে না তাঁর।

কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করার পর পলায়নপর ঘোড়ার ছায়া চোখে পড়ে। ধীরে ধীরে দুই ধাবমান ঘোড়ার মধ্যকার দূরত্ব কমতে থাকে। হঠাৎ হাদীদ অনুভব করে, পিছন দিক থেকে আরো একটি ঘোড়া ধেয়ে আসছে। আরোহী তারই সঙ্গী না দস্যু বুঝতে পারছেন না তিনি। পিছন থেকে আসা ঘোড়াটি কাছে এসে গেছে হাদীদের। হাদীদ নিজের ঘোড়ার গতি স্বাভাবিক রেখেই উচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করেন, কে? কোন জবাব পান না তিনি। হাদীদ তার অশ্বের গতি আরো তীব্র করার চেষ্টা করেন।

পলায়নপর ঘোড়ার বাগ এখন মেয়ের হাতে। ঘোড়া ডান-বাম করতে শুরু করে। গতিও কমে যায়। কাছে চলে আসেন হাদীদ।

হাদীদের হাতে বর্শা। পলায়নপর ঘোড়ার আরোহীর এক পার্শ্বে গিয়েই বর্শার আঘাত হানেন তিনি। এক দিকে সরে যায় ঘোড়া। আঘাত থেকে রক্ষা পায় আরোহী। বর্শা বিদ্ধ হয় ঘোড়ার গায়ে।

ঘোড়া থামিয়ে ঘুরে দাঁড়ান হাদীদ। অপর ঘোড়ার আরোহীও মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সম্মুখে বসা মেয়েটি ঘোড়ার লাগাম এদিক-ওদিক করে স্থির হতে দিচ্ছে না তার ঘোড়াকে।

মেয়েটিকে নিয়ে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে দস্যু। নিজের ঘোড়াকে ঢাল বানিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে সে।

ঘোড়ায় বসেই আঘাত করার চেষ্টা করছেন হাদীদ। কিন্তু যে দিক থেকেই তিনি আঘাত করছেন, দস্যু মেয়েটিকে নিয়ে তার ঘোড়ার আড়াল হয়ে হাদীদের আঘাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে।

এবার ঘোড়া থেকে নেমে আসেন হাদীদ। পিছন থেকে ধেয়ে আসা আরোহীও এসে পড়ে ইতিমধ্যে। হাদীদের সঙ্গী নয় সে, দস্যু। সে-ও নেমে পড়ে ঘোড়া থেকে। যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে গর্জে ওঠেন হাদীদ। বলেন, 'আমার জীবন থাকতে তোমরা মেয়েটিকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।'

এক দস্যু মেয়েটিকে ঝাপটে ধরে রাখে। অপরজন যুদ্ধে লিপ্ত হয় হাদীদের সঙ্গে। মেয়ের কাছে এখন তরবারী নেই। মেয়েকে আটকে রাখা দস্যুও এবার হাদীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছেড়ে দেয় মেয়েটিকে।

হাদীদ মেয়েকে ডেকে বলে, 'ঘোড়ায় চড়ে তুমি শোবকের দিকে চলে যাও। আমি দস্যুদের তোমাকে ধাওয়া করতে দেব না।' কিন্তু মেয়ে এক পা-ও নড়ছে না, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সে।

দু' দস্যুর মোকাবেলা করেন হাদীদ। দস্যুদ্বয় বারবার তাকে বলে, 'একটি মেয়ের

জন্য নিজের জীবন বিপন্ন কর না। আমাদের পথ ছেড়ে তুমি জীবন নিয়ে সরে যাও।' কিন্তু হাদীদের একই জবাব, 'আগে আমার জীবন নাও, পরে মেয়েকে নিও। আমার জীবন থাকতে তোমরা ওকে নিতে পারবে না।'

হাদীদ মেয়েকে পুনরায় বলে, 'এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন তুমি? পালাও না কেন এখান থেকে!' মেয়ে বলে, 'তোমাকে ছেড়ে আমি যেতে পারব না। জীবন দিতে হলে তুমি একা কেন, দু'জনই দেব। আমার জন্য তুমি তোমার জীবন বিপন্ন করবে, আর আমি তোমাকে ছেড়ে পালিয়ে যাব, তা হতে পারে না।'

দস্যুদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন হাদীদ। প্রতিপক্ষের আঘাতে আহত হয়ে পড়েন তিনি। যুদ্ধরত অবস্থায় হাদীদ পুনরায় মেয়েকে বলেন, আমি আহত হয়ে গেছি। আমার মৃত্যুর আগেই তুমি এখান থেকে জীবন-সম্ভ্রম নিয়ে পালিয়ে যাও। অনুরোধ, আর দাঁড়িয়ে থেক না। যাও বলছি, যাও।'

মেয়ের দিকে ঘুরে দাঁড়ায় এক দস্যু। মওকা পেয়ে যান হাদীদ। তার পাজরে বর্শা ঢুকিয়ে দেন তিনি। কিন্তু এ সময়ে অপর দস্যুর তরবারী হাদীদের কাঁধে আঘাত হানে। হাদীদের আঘাত খাওয়া দস্যু লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। মেয়েটি দৌড়ে গিয়ে তার তরবারীটি নিয়ে নেয় এবং পিছন থেকে এসে এক ঘা মারে দস্যুর পিঠে। নিজেকে সামলে নিয়ে পাল্টা আক্রমণ করতে চায় সে। এ সময়ে হাদীদের বর্শা এসে বিদ্ধ হয় তার বুকে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দস্যুর অসাড় দেহ। চিরতরে নিস্তব্ধ হয়ে যায় সে-ও।

হাদীদও আহত। ক্ষত তার মারাত্মক। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। পড়ে যাচ্ছেন তিনি। মেয়েটি ধরে দাঁড় করিয়ে রাখে তাঁকে।

কাঁপা কণ্ঠে হাদীদ মেয়েকে বলে, 'তুমি আমায় ছেড়ে দাও। ঘোড়ায় চড়ে এক্ষুণি শোবক অভিমুখে রওনা হও। শোবক এখান থেকে বেশী দূরে নয়; তুমি একাই যেতে পারবে। সঙ্গীদের দিকে যেও না। ওখানে বোধ হয় একজনও জীবিত নেই। যাও, আল্লাহ তোমায় নিরাপদে পৌঁছিয়ে দিন।'

'আপনার জখম কোথায় কোথায়, দেখি?' বলল মেয়েটি।

আমায় মরতে দাও মেয়ে! আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে তুমি রওনা হও। আল্লাহর দিকে চেয়ে আমার দায়িত্বটা তুমি নিজেই পালন করে নাও। তোমাকে শোবক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া ছিল আমার দায়িত্ব। কিন্তু আমি আর বাঁচব না। অপর কোন দস্যু-তস্কর এদিকে এসে পড়তে পারে। তার আগে-ই তুমি এ স্থান ত্যাগ কর।'

হাদীদের ব্যাপারে মেয়ের মনে এখন আর কোন সন্দেহ নেই। সব সংশয়, ভুল বুঝাবুঝি দূর হয়েছে তার। মেয়েটি বুঝে ফেলেছে, তাদের ব্যাপারে হাদীদ ও তার সঙ্গীদের কোন কুমতলব বা দুরভিসন্ধি ছিল না। তার জীবন ও ইজ্জত রক্ষার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দস্যুদলের মোকাবেলা করেছেন তিনি।

আহত হাদীদকে এই জনমানবহীন মরুভূমিতে একাকী ফেলে যেতে স্পষ্ট অস্বীকার করে মেয়েটি। দৌড়ে গিয়ে ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বাঁধা পানির মশক খুলে নিয়ে এসে হাদীদকে পানি পান করায়, নিজের পরিধানের কাপড় এবং হাদীদের পোষাক ছিড়ে কিছু কাপড় নিয়ে জখমে পট্টি বাঁধে। গোয়েন্দা মেয়ের প্রশিক্ষণ আছে এ কাজে।

মেয়েটি হাদীদকে ধরে দাঁড় করিয়ে একটি ঘোড়ার কাছে নিয়ে যায়। বড় কষ্টে তাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে বসিয়ে দিয়ে নিজে অন্য ঘোড়ায় চড়তে যায়। কিন্তু হাদীদ ক্ষীণ কণ্ঠে বলেন, 'আমি একা ঘোড়ায় বসে থাকতে পারব না। সেই শক্তি আমার নেই।'

ঘোড়া ছিল তিনটি। একটি ঘোড়াও যাতে খোয়াতে না হয়, তার জন্য বুদ্ধি করে মেয়েটি দু'টি ঘোড়ার বাগ অপর ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বেঁধে নেয়। নিজে হাদীদের পিছনে চড়ে বসে। হাদীদের পিঠ নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে তার মাথা নিজের কাঁধের উপর রেখে রওনার জন্য প্রস্তুতি নেয় সে।

'শোবক কোন্ দিকে বলতে পারেন?' হাদীদকে জিজ্ঞেস করে মেয়েটি।

হাদীদ মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকান। নক্ষত্র দেখে এবং একদিকে ইংগিত করে বলেন, 'ওদিকে চল'।

ঘোড়া ছুটায় মেয়ে। ধীর গতিতে এগিয়ে চলছে তিনটি ঘোড়া। খানিক অগ্রসর হওয়ার পর হাদীদ বললেন, 'আমি বোধ হয় বাঁচব না। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে। যেখানে আমার মৃত্যু হবে, সেখানেই আমাকে কবর দিও। আমার ব্যাপারে তোমার মনে কোন সন্দেহ থাকলে, তা মন থেকে দূর করে আমাকে ক্ষমা করে দিও। আমি আমানতে খেয়ানত করিনি। দুআ করি, আল্লাহ তোমাকে নিরাপদে জীবিত গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দিন।'

এগিয়ে চলছে ঘোড়া। কেটে যাচ্ছে রাত।

পরদিন ভোর বেলা। মেয়েটির কাঁধে মাথা আর বুকে পিঠ ঠেকিয়ে অর্ধ-অচেতন অবস্থায় বসে আছেন হাদীদ। নিজেকে সচেতন রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন তিনি। তার জখমের রক্তক্ষরণ এখন বন্ধ। কিন্তু অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে অসাড় হয়ে পড়েছে তার দেহ।

ছোট্ট একটি খেজুর বাগানে এসে ঘোড়া থামায় মেয়েটি। হাদীদকে আলগোছে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামায়। পানি পান করায়। ঘোড়াগুলোর সঙ্গে বাঁধা ছিল কিছু খাবার। হাদীদকে খাওয়ায় সেগুলো। হাদীদের আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যায়। মস্তিষ্ক পরিষ্কার হতে শুরু করে। হাদীদ ভাবেন, ছিলাম মেয়েটির রক্ষী, এখন হয়েছি তার বন্দী।

মেয়েটি শুইয়ে দেয় হাদীদকে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সুস্থতা অনুভব করে সে। ধীরে ধীরে চাঙ্গা হয়ে উঠে তার দেহ। মেয়েটিকে বলেন, 'শোবক আর বেশী দূরে নয়। বোধ হয় আর একদিনের পথ হবে। একটি ঘোড়া নিয়ে তুমি চলে যাও, আমি ফিরে যাই।'

'জীবন নিয়ে তুমি গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না। এখান থেকেই যদি ফিরে যেতে হয়, তাহলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল। তুমি যেমন আমাকে একাকী ফেলে আসনি, আমিও তোমাকে একলা ছেড়ে যাব না।' বলল মেয়েটি।

'আমি পুরুষ। একজন নারী আমাকে হেফাজত করবে, আমার মন তা মানছে না। তার চেয়ে বরং আমার মরে যাওয়াই শ্রেয়।' বললেন হাদীদ।

'যারা ঘরের চার দেয়ালে আবদ্ধ থাকে, যারা পুরুষের সহযোগিতা ছাড়া এক পা-ও চলতে পারে না, আমি তেমন মেয়ে নই। আমাকে একজন সৈনিক-ই মনে কর। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আমার অস্ত্র তীর-তরবারী নয়। আমার অস্ত্র হল, আমার রূপ-যৌবন, আমার নারীত্ব, আমার বাকপটুতা। তোমার মত আমিও কষ্ট সহ্য করতে অভ্যস্ত। এখান থেকে পায়ে হেঁটে আমি শোবক যেতে পারি।' বলল মেয়েটি।

'আমি তোমার আবেগের মূল্যায়ন করি। দস্যুরা আমাদের দু'জনকে পরস্পর কত কাছে এনে দিয়েছে! অথচ, আমরা একে অপরের দুশমন। তুমি আমার দেশের ভিত উপড়ে ফেলার চেষ্টা করছ, আর আমি একদিন তোমার দেশ আক্রমণের স্বপ্নে বিভোর।' বললেন হাদীদ।

'কিন্তু এ মুহূর্তে আমার বন্ধুত্ব বরণ করে নাও। দুশমনির কথা তখন ভাববে, যখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে তুমি নিজের দেশে ফিরে যাবে।' বলল মেয়ে।

মেয়েটি হাদীদের বাহু ধরে শোওয়া থেকে উঠিয়ে বসায়। হাদীদ নিজ শক্তিতে উঠে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে হেঁটে ঘোড়ার কাছে পৌঁছে সে। মেয়েটি ধরে হাদীদকে ঘোড়ার রেকাবে তুলে দেয়। ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে বসায় তাকে। হাদীদকে বসিয়ে মেয়েটি নিজেও একই ঘোড়ায় চড়তে চায়। বাঁধা দেন হাদীদ। বলেন, 'তুমি অন্য ঘোড়ায় উঠ। আমি এখন একাই চলতে পারব।'

'তবু আমি এ ঘোড়ায়-ই বসব। তোমাকে জড়িয়ে রাখব আমার গায়ের সাথে।' দৃঢ়কণ্ঠে বলল মেয়ে।

হাদীদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও মেয়েটি তার ঘোড়ার পিছনে চড়ে বসে। নিজের এক বাহু হাদীদের বুকে রেখে হাদীদকে নিজের গায়ের সাথে জড়িয়ে রাখার চেষ্টা করে। আপত্তি জানায় হাদীদ। বলে, 'আমাকে একটু নিজের শক্তিতে বসতে দাও।'

হাদীদের আপত্তিতে কান দেয় না মেয়ে। জোর করে হাদীদকে নিজের বুকের সঙ্গে লাগিয়ে নেয় সে। নিজের কাঁধের উপর টেনে আনে হাদীদের মাথা। তারপর বলে, 'আমি জানি, খারাপ মেয়ে মনে করে তুমি আমার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করছ।'

'না, 'খারাপ মেয়ে' মনে করে নয়– শুধু 'মেয়ে' হওয়ার কারণে আমি তোমার

থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করছি। দু'টি রাত নিতান্ত অসহায় অবস্থায় তুমি আমার বন্দীনী ছিলে। ইচ্ছে করলে আমি তোমাকে দাসীর মত ব্যবহার করতে পারতাম। কিন্তু আমি শয়তানকে আমার উপর জয়ী হতে দেইনি। এখন আমার মনে হচ্ছে, যেন আমি আমানতে খেয়ানত করছি। আমার মধ্যে পাপবোধ জাগ্রত হচ্ছে।'

'তুমি পাথর তো আর নও। আমাকে যখনই যে পুরুষ দেখেছে, কামনার চোখেই দেখেছে। সামান্য মূল্যের বিনিময়ে আমি তোমার জাতির দু'জন মুমিনের ঈমান কিনে নিয়ে এসেছি।'

'কত মূল্য?' জিজ্ঞেস করে হাদীদ।

শুধু এতটুকু যে, তাদেরকে আমার কাছে বসতে দিয়েছি, আমার কাঁধে তাদের মাথা রেখেছি।' জবাব দেয় মেয়ে।

'ঈমান ছিল-ই না তাদের কাছে।' বলল হাদীদ।

'যতটুকু ছিল, তা-ই আমি নিয়ে এসেছি। তার স্থলে তাদের অন্তরে স্বজাতির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছি।'

'তারা কারা?' জানতে চায় হাদীদ।

'এখন বলব না। তোমার অর্পিত দায়িত্বের প্রতি তুমি যেমন নিষ্ঠাবান, তেমনি আমার কর্তব্যও আমার কাছে ততটুকু প্রিয়।' জবাব দেয় মেয়েটি।

কথা বলা বন্ধ করে হাদীদ। যুবতীর দেহের উষ্ণতা, হালকা ঘ্রাণ অনুভব করছে সে। তরুণীর উন্মুক্ত রেশম-কোমল চুল বাতাসে উড়ে ছুয়ে যাচ্ছে হাদীদের গাল-মুখ।

তন্দ্রা পায় হাদীদের। ঝিমিয়ে পড়ে সে। এগিয়ে চলছে ঘোড়া। বেশ কিছু পথ অতিক্রম করার পর চোখ খুলে হাদীদ। সূর্য তখন মাথার উপরে উঠে এসেছে। হাদীদ বলে, 'ঘোড়ার গতি বাড়াও। আশা করি, সূর্যাস্তের পরপর আমরা শোবক পৌছে যেতে পারব।'

ঘোড়ার গতি বাড়ায় মেয়ে। তীব্রগতিতে পিছনে সরে যাচ্ছে মরুপ্রান্তর।

✿ ✿ ✿

সূর্য ডুবে গেছে। শোবকের সভাকক্ষে খৃষ্টান সম্রাট ও কমান্ডারগণ উপবিষ্ট। আলেম গোয়েন্দাও তথায় উপস্থিত। কর্মকর্তাদের নিকট রিপোর্ট পেশ করছে সে।

'মেয়ে দু'টোর পরিণতি কি হয়েছে, তা আমি বলতে পারছি না। ওদের রক্ষা করা তো দূরে থাক, আমি ওদেরকে এক নজর দেখে আসারও চেষ্টা করিনি। কারণ, মিসর থেকে আমি যে তথ্য নিয়ে এসেছি, তা মেয়ে দু'টোর চেয়েও বহু বহু মূল্যবান। আপনাদের নিকট সে তথ্য পৌছানোর জন্য ডাকাতদের আক্রমণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক সুযোগে ঘোড়ায় চড়ে আমি পালিয়ে এসেছি। আইউবীর বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাওয়া ছিল আমার এক বিস্ময়কর ঘটনা। তাই ডাকাতদের রক্তক্ষয়ী হামলা থেকে আমি নিরাপদে সরে এলাম, কেউ-ই আমাকে ধাওয়া পর্যন্ত করল না।

আমার মনে হয়, ওরা আসলে দস্যু নয়। আইউবী-ই দস্যুবেশে ওদেরকে আমাদের উপর লেলিয়ে দিয়েছেন। ঘটনাটি একটি সাজানো নাটক। সালাহুদ্দীন আইউবী আমাদের তিনজনকে মৃত্যুদন্ড কেন যে দিলেন না, কেন যে মেয়েদের নষ্ট করার জন্য তিনি এই পন্থা অবলম্বন করলেন, আমার তা মাথায় ধরছে না। মেয়েগুলো এখন বোধ হয় ওদের আয়ত্ত্বে চলে গেছে এবং অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করছে!' বলল আলেম গোয়েন্দা।

'ওদের মুক্তির কথা ভাববার সময় আমাদের নেই। দু'টো মেয়ে হারিয়েছি, তাতে তেমন কিছু হয়নি। বৃহত্তর স্বার্থে এরূপ ত্যাগ দিতেই হয়। আমাদের কাছে মেয়ের অভাব নেই। এ পদ্ধতি আমাদের সফল। এই ধারা চালু রাখার জন্য আরো মেয়ে প্রস্তুত কর। সভাসদদের সকলেই এসে গেছেন, এবার বলুন, আপনি কী তথ্য নিয়ে এসেছেন।' বলল এক কর্মকর্তা।

কায়রোর এক মসজিদে সালাহুদ্দীন আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ানের হাতে কিভাবে বন্দী হল, কয়েদখানায় তার ও মেয়েদের সঙ্গে কেমন আচরণ করা হল এবং সুলতান আইউবী কিভাবে তাদের অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তি দিলেন, আলেম গোয়েন্দা সভাসদদের সামনে সব বিবরণ তুলে ধরে। এ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আইউবী তাকে কিভাবে দিলেন, তাও শোনায়। দিন-তারিখ উল্লেখ করে আলেম গোয়েন্দা জানায়, 'সালাহুদ্দীন আইউবী এ-দিন কার্ক আক্রমণের জন্য বাহিনী প্রেরণ করবেন। তাঁর এ ঘোষণা শুনে এক সভাসদ বলল, কার্ক নয়– আগে আমাদের শোবক দখল করা প্রয়োজন। কারণ, কার্কের তুলনায় শোবক অধিক শক্তিশালী দুর্গ। কিন্তু আইউবী শোবকে তার শক্তি ব্যয় করতে চাইছেন না। দুর্বল মনে করে তিনি কার্ক দখল করতে চান আগে। তাঁর কথা হল, আগে কার্ক দখল করে তাকে তিনি সৈন্য ও রসদ ইত্যাদির কেন্দ্র বানাবেন। পর্যাপ্ত রসদ সংগ্রহ করে বিশেষ ফোর্স তলব করবেন। তারপর সৈন্যদের কিছুদিন বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে শোবকে হামলা চালাবেন।

তিনি আমাদের অজ্ঞাতে অতর্কিতে আক্রমণ চালাতে চান। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, তার সৈন্য কম। পক্ষান্তরে আমাদের সৈন্যও বেশী এবং আমাদের ঘোড়াও তার ঘোড়া অপেক্ষা উন্নত। তাছাড়া আমাদের আছে বর্ম, আছে শিরস্ত্রাণ, যা তার নেই। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, 'খৃষ্টান সৈন্যরা যদি আমাদেরকে পথেই প্রতিহত করে ফেলে, তাহলে পরাজয় ছাড়া আমাদের উপায় থাকবে না। তিনি খোলা মাঠে যুদ্ধ করতে ভয় পান।'

সুলতান আইউবীর মুখ থেকে শোনা সব কথা আনুপুংখ বিবৃত করে আলেম গোয়েন্দা।

এমন মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও তার বিস্তারিত বিবরণ শুনে সবাই ভুলে গেল মেয়েদের কথা। এ বিষয়ে মত বিনিময় শুরু হল। দীর্ঘ আলোচনার পর সভা এ

সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, সুলতান আইউবী একজন অসাধারণ বিচক্ষণ যোদ্ধা। কার্ক আক্রমণের যে পরিকল্পনা তিনি প্রস্তুত করেছেন, তাতেই তার সামরিক দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। পথে লড়াই এড়িয়ে চলার সিদ্ধান্তও তার বিচক্ষণতার এক জ্বলন্ত প্রমাণ। আমাদের প্রতি যীশু খৃষ্টের অপার অনুগ্রহ আছে বলেই আমরা আগেভাগে এ পরিকল্পনার খবর পেয়ে গেছি। অন্যথায় আইউবী শুধু কার্ক-ই নয়– শোবকের মত শক্ত দুর্গের জন্যও আশংকার কারণ হয়ে দেখা দিত।

সালাহুদ্দীন আইউবীর পরিকল্পনা মোতাবেক তখনই তাদের সেনা তৎপরতা ও প্রতিরোধ আয়োজন শুরু হয়ে যায়। পরিকল্পনায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়–

সম্মিলিত খৃষ্টান বাহিনীর কেন্দ্রীয় কমান্ড থাকবে শোবকে। রসদও থাকবে এখানে। শোবক থেকেই যুদ্ধ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা হবে। কার্ক দুর্গকে আরো দুর্ভেদ্য করে তোলা হবে। শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য কার্কে আরো কিছু সৈন্য পাঠান হবে।

আইউবীকে কার্ক থেকে দূরে তারই সীমান্তের ভিতরে কোন এক দুর্গম পার্বত্য এলাকায় প্রতিরোধ করা হবে। এ লক্ষ্যে বিপুলসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করা হবে। এই বাহিনীতে বেশী থাকবে অশ্বারোহী ও উষ্ট্রারোহী সৈন্য। আইউবীর বাহিনীকে অবরুদ্ধ করে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। পানির ঝর্ণাগুলো কব্জা করতে হবে আগেই।

পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ শুরু করার নির্দেশ জারী করা হয়। সবাই ভীষণ আনন্দিত। এ-ই প্রথমবার তারা সময়মত সুলতান আইউবীর গোপন পরিকল্পনার কথা জানতে পারল। অন্যথায় সবসময়-ই তিনি ক্রুসেডারদের ফাঁকি দিয়ে-ই অভিযান পরিচালনা করে থাকেন।

খৃষ্টান সেনাপতিগণ বিস্ময় প্রকাশ করে বলে যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ন্যায় দূরদর্শী সিপাহসালারের থেকে এই পদস্খলন ঘটল, যে শত্রু গোয়েন্দাদের তিনি মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাদেরকে পাশের কক্ষে বসিয়ে উচ্চস্বরে এমন একটি নাজুক বিষয় নিয়ে কথা বললেন! সেনাপ্রধান তার ফ্রান্সের সৈন্যদের কাছেও এ পয়গাম প্রেরণ করে যে, অমুক দিনের আগেই তোমরা এমন জায়গায় পৌঁছে যাবে, যেখানে নুরুদ্দীন জঙ্গীর বিশেষ বাহিনীকে প্রতিরোধ করা যায়।

এ সময়ে কক্ষে প্রবেশ করে এক খৃষ্টান অফিসার। গোয়েন্দা প্রধানের কানে কানে কি যেন বলে। গোয়েন্দা প্রধান সকলকে জানায়, ডাকাতের হাতে আক্রান্ত মেয়ে দু'টোর একজন এইমাত্র এসে পৌঁছেছে। সাথে তার এক আহত মুসলিম রক্ষীসেনা।

আলেম গোয়েন্দা সকলের আগে কক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়ে। তার পিছনে অন্যরাও বাইরে আসে। আহত হাদীদকে বারান্দায় শুইয়ে রেখে তার মাথার কাছে বসে আছে মেয়েটি। দীর্ঘ ভ্রমণের ফলে পট্টি-ব্যান্ডেজ খুলে গিয়ে ক্ষতস্থান থেকে আবার রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে হাদীদের। বিছানায় অচেতন পড়ে আছে সে।

খৃষ্টান সেনাপতিদের কেউ হাদীদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করল না। কারণ, তাদেরকে আগেই বলা হয়েছিল যে, ডাকাতদের আক্রমণ ছিল সাজানো নাটক। আইউবী-ই এ আক্রমণের মূল নায়ক।

আলেম গোয়েন্দা মেয়েটির হাত ধরে তাকে কক্ষের ভিতরে চলে আসতে বলে। খৃষ্টানদের বড় মূল্যবান মেয়ে ও। কিন্তু হাদীদের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ-চিকিৎসা না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে এক চুল নড়বে না বলে জানিয়ে দেয় সে।

গোয়েন্দা প্রধান হরমুন মেয়েটিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে কানে কানে বলে, 'কোন্ সাপের বাচ্চাকে তুমি ব্যান্ডেজ করাতে চাইছ? ভাগ্য প্রসন্ন ছিল বলেই না তুমি জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছ। অন্যথায় এরা তো তোমাদেরকে ডাকাতরূপী হায়েনাদের হাতে তুলে দিতেই চাইছিল!'

'এ তথ্য মিথ্যা। প্রথমে আমারও এ সন্দেহ ছিল। এ লোকটি আমার মনের সব সন্দেহ মুছে দিয়েছে। দু' ডাকাতকে খুন করে সে আমার জীবন রক্ষা করেছে।' কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে বলল মেয়েটি।

মেয়েটি হরমুনকে সব ঘটনা খুলে বলে। শেষে একথাও জানায় যে, লোকটি আমাকে বারবার বলছিল, 'আমাকে এখানে মরতে দাও আর তুমি শোবক চলে যাও।'

খৃষ্টানদের চোখে মুসলমান মানেই এক চরম ঘৃণ্য জাতি। মুসলমান হওয়ার কারণে হাদীদও ঘৃণার পাত্র। তাই এতগুলো অফিসার-সেনাপতির মধ্যে একজনও বলল না যে, লোকটির চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।

জিদ্ ধরে বসে আছে মেয়েটি। অবশেষে একজন অফিসার বলল, লোকটিকে কক্ষে নিয়ে গিয়ে ব্যান্ডেজ করার ব্যবস্থা কর।

হাদীদকে তুলে কক্ষে নিয়ে যাওয়া হল। মেয়েটি চাপের মুখে অফিসারদের সঙ্গে চলে গেল।

মেয়েকে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল অফিসাররা। তার জীবিত ফিরে আসার কাহিনী জানতে চায় তারা। সব ঘটনা খুলে বলে সে।

মেয়ের জন্য খাদ্য ও শরাব এসে যায়। আহার সেরে নিতে বলে অফিসাররা।

'জখমীকে খাইয়ে থাকলেই তবে আমি খাব। অন্যথায় আমি খাবার স্পর্শ করব না। আমি তাকে একটু দেখে আসি।' বলেই মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়।

'থাম লুজিনা! এই দ্বিতীয়বার ক্রুশের সামরিক নীতির বিরুদ্ধাচারণ করছ তুমি! প্রথমবার তোমাকে কক্ষে প্রবেশ করতে বলা হয়েছিল আর তুমি সেই নির্দেশ অমান্য করে বলেছিলে, আগে জখমীকে ব্যান্ডেজ করা হোক, তারপর আমি কক্ষে যাব। এবার তুমি বিনা অনুমতিতে অভদ্রের ন্যায় বাইরে যেতে পা বাড়িয়েছ! তোমার সম্মুখে যারা উপবিষ্ট, তারা সবাই খৃষ্টান বাহিনীর পদস্থ অফিসার। দু'জন সম্রাটও বসা আছেন এখানে। জান, তোমার এ অপরাধের শাস্তি কি? দশ বছরের কারাদন্ড। আর যেহেতু

তুমি এ আইন লংঘন করছ শত্রু বাহিনীর একজন সাধারণ সৈনিকের খাতিরে, তাই আমরা তোমাকে মৃত্যুদন্ডের শাস্তিও দিতে পারি।' অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলল গোয়েন্দা প্রধান হরমুন।

'যে লোকটি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একজন অভিজ্ঞ খৃষ্টান গোয়েন্দা মেয়ের জীবন রক্ষা করল, খৃষ্টান সম্রাট ও সেনাপতিগণ কি তাকে এর কোন প্রতিদান দেবেন না? আমি জানি, ও আমাদের শত্রু শিবিরের একজন সেনা কমান্ডার। কিন্তু আমি তাকে দুশমন ভাবব তখন, যখন সে নিজ বাহিনীতে ফিরে যাবে।' বলল লুজিনা।

'শত্রু সর্বাবস্থায় এবং সব জায়গায়-ই শত্রু। ফিলিস্তীনে ক'জন মুসলমানকে আমরা জীবিত থাকতে দিয়েছি? কেনই বা আমরা তাদের বংশধারা নিঃশেষ করছি? কারণ, ওরা আমাদের শত্রু, আমাদের ধর্মের দুশমন। ক্রুশ ছাড়া আর কোন প্রতীক আমরা পৃথিবীতে রাখব না। আমাদের কাছে একজন আহত মুসলমানের কোনই মূল্য নেই। বস তুমি!' চীৎকার করে বলল এক কমান্ডার।

লুজিনা বসে পড়ে। বেদনার অশ্রুতে দু' চোখ ঝাপসা হয়ে আসে তার।

❁ ❁ ❁

পরদিন সকাল থেকে শোবকে নতুন এক তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। এ তৎপরতা সামরিক। শোবকের বেসামরিক জনগণ আপন আপন কাজে লিপ্ত। এ তৎপরতার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। দুর্গ থেকে সারি সারি সৈন্য বের হচ্ছে। সামান-পত্র এদিক-ওদিক করা হচ্ছে। বহিরাগত সৈন্যদের সাময়িক তাঁবুর জন্য জায়গা খালি করা হচ্ছে। রসদ পরিবহনের জন্য উটের বহর দাঁড়িয়ে আছে। সেনা হেডকোয়ার্টারেও তৎপরতার অন্ত নেই। সালাহুদ্দীন আইউবীর আক্রমণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে গতরাতে যে পরিকল্পনা ঠিক করা হয়েছিল, তার-ই অংশ হিসেবে এ ব্যস্ততা। অফিসারদেরও এক দন্ড দাঁড়াবার ফোরসত নেই। উঁচু পর্যায়ের কয়েকজন অফিসার রওনা হয়ে গেছে কার্ক অভিমুখে।

মাত্র একটি মেয়ে এ তৎপরতায় সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। লুজিনা। যে হাদীদকে সঙ্গে করে শোবকে নিয়ে এসেছিল, সেই মেয়ে।

গত রাতে সভাকক্ষ থেকে যখন সে ছুটি পায়, তখন মধ্য রাত। গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষ শাখার গুরুত্বপূর্ণ সদস্যা বলে পূর্বেকার অভিযানের রিপোর্ট পেশ করতে হয়েছে তাকে রাতভর।

দীর্ঘ পথ অশ্ব চালনার ক্লান্তি ও অনিদ্রায় এখন অসাড় হয়ে পড়েছে তার দেহ। একজন অফিসার তাকে বলেছিল, 'তোমার আহত মুসলিম ফৌজিকে ডাক্তারের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে। ওর জন্য তোমার এত অস্থির হওয়া ঠিক হচ্ছে না। এরূপ আবেগ-প্রবণতা তোমার কর্তব্যের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।'

গোয়েন্দা প্রধান হরমুন লুজিনাকে বলেছিল, 'এ রাতে না হলে কনরাড এবং গাই

অফ লুজিনান এর মত সম্রাট– যারা কাউকে ক্ষমা করতে জানেন না– তোমাকে বন্দীশালায় নিক্ষেপ করতেন। তোমার মুসলিম রক্ষীর যা করার করা হয়েছে। তোমার জন্য নির্দেশ, তার সঙ্গে তুমি সাক্ষাৎ করতে পারবে না।'

'কেন? আমি কি তার কৃতজ্ঞতাও আদায় করতে পারব না?' বিস্ময় ও নিরাশার সুরে বলল লুজিনা।

'না। কারণ সে দুশমনের ফৌজি। তুমি যে বিভাগে চাকুরী কর, জান তো তা কি? আমি তোমাকে ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দিতে পারি না। তোমার বিদ্যা ও কর্তব্যের দাবীও তা-ই। আমি এ-ও লক্ষ্য করছি যে, তার প্রতি তুমি আসক্ত হয়ে পড়েছ। এটা ভাল লক্ষণ নয়। শত্রুর সঙ্গে এমন সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি দেয়া যায় না লুজিনা।' হরমুনের কণ্ঠে দৃঢ়তা।

'আপনি আমাকে শুধু এতটুকু নিশ্চয়তা দিন যে, তার ক্ষতে ব্যান্ডেজ করা হয়েছে আর নিরাপদে তাকে ফেরত পাঠান হবে।' বলল লুজিনা।

'লুজিনা! আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তোমার এ আকাংখা পূরণ করা হবে। আর শোন, তুমি বড় কঠিন ভয়ানক মিশন থেকে ফিরে এসেছ, তোমার সফরও ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। তোমাকে দশদিনের ছুটি দেয়া হল। পরিপূর্ণ বিশ্রাম নাও।' ঝাঁঝ মেশানো কণ্ঠে বলল হরমুন।

রাতে এসব কথাবার্তার পর লুজিনা তার কক্ষে চলে যায়। গোয়েন্দা মেয়েদের আবাস হাইকমাণ্ড থেকে অনেক দূরে। কিন্তু লুজিনার মত উচ্চ পর্যায়ের গোয়েন্দা মেয়েরা থাকে বেশ উন্নত কক্ষে, রাজকীয় হালে। রাজকন্যাদের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা ও বিলাস উপকরণ পায় তারা। দায়িত্ব তাদের যেমন ঝুঁকিপূর্ণ, সুযোগ-সুবিধা তেমনি উন্নত।

কক্ষে গিয়েই বিছানায় গা এলিয়ে দেয় লুজিনা। মুহূর্ত মধ্যে দু' চোখের পাতা বুজে আসে তার। গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে সে।

পরদিন বেশ বেলা হলে চোখ খোলে লুজিনার। কিন্তু বিছানা থেকে শরীর টেনে তুলতে পারছে না সে। ভেঙ্গে আসছে তার সারা শরীর। উঠে বসার শক্তিটুকুও পাচ্ছে না সে।

বেশ কিছুক্ষণ বিছানায় গড়াগড়ি খেয়ে অবশেষে উঠে দাঁড়ায় লুজিনা। নাস্তা করে বাইরে বের হওয়ার প্রস্তুতি নেয়। ইতিমধ্যে পাশের কক্ষের মেয়েরা এসে কায়রোর কারগুজারী শুনতে চায় তার কাছে। কথা বলতে মন চাচ্ছে না লুজিনার। সংক্ষেপে দু' চারটা কথা শুনিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরে হবে বলে হাসপাতাল অভিমুখে ছুটে যায়।

❁ ❁ ❁

একটু এগুতেই এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হয় লুজিনার। গোয়েন্দা বিভাগেই চাকুরী করে মেয়েটি। লুজিনার সহকর্মী। দু'জনের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। নিজের মনের কথা অপরজনের কাছে গোপন রাখে না দু'জনের কেউ।

মুখোমুখি হয় দু' বান্ধবী। কিছুক্ষণ মুখপানে তাকিয়ে থেকে লুজিনার বান্ধবী জিজ্ঞেস করে, যাচ্ছ কোথায়, লুজি? তোমাকে খুব অস্থির মনে হচ্ছে! কোন অঘটন ঘটেছে, নাকি দীর্ঘ সফরের ক্লান্তির কারণে এমনটি হল? ছুটি পাওনি বুঝি?

'ছুটি পেয়েছি বটে, তবে বিশেষ একটি ঘটনা আমাকে অস্থির করে তুলেছে।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল লুজিনা।

বান্ধবীর হাত ধরে একটি গাছের ছায়ায় গিয়ে বসে লুজিনা। বান্ধবীকে ঘটনা বিস্তারিত শুনিয়ে মনের বোঝা হালকা করার চেষ্টা করে। অফিসাররা তাকে যে ধমক দিয়েছে, বান্ধবীকে তাও শুনিয়ে লুজিনা বলল, 'আমি হাদীদকে এক নজর দেখতে চাই। আমার আশংকা, ওর কোন চিকিৎসা হয়নি এবং ওকে নির্দয়ভাবে নগর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে কিংবা মৃত্যুর জন্য কোন এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আটকে রাখা হয়েছে।'

'তুমি বললে, তোমাকে না ওর সঙ্গে দেখা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে! অফিসারদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এ ঝুঁকি নিওনা বোন! ধরা পড়লে জান তো শাস্তি কি!' লুজিনাকে নিরস্ত হওয়ার পরামর্শ দেয় বান্ধবী।

'লোকটির জন্য মৃত্যুদন্ডও মাথা পেতে নিতে আমি প্রস্তুত। আমার খাতিরে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লড়াই করেছে সে, তা তোমাকে বলেছি। ডাকাতদের হাতে আমার জীবনের কোন ভয় ছিল না। আমাকে ওরা তুলে নিয়ে যেত। কিছুদিন ভোগ করে নষ্ট করে কোন আমীরের হাতে বিক্রি করে দিত। হাদীদ আমার এই পরিণতির কথা জানত। আমার ইজ্জতের খাতিরে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করেছে। ডাকাতরা তাকে বলেছিল পর্যন্ত, 'মেয়েটিকে আমাদের হাতে তুলে দাও, আর তুমি নিজে নিরাপদে চলে যাও।' হাদীদ এ-ও তো জানত যে, আমি পবিত্র মেয়ে নই। কিন্তু তারপরও তার বিবেচনায় আমি ছিলাম তার আমানত। এ আমানতকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশী মূল্য দিয়েছে সে।'

'লোকটির জন্য তুমি বেশ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছ লুজি!'

'হ্যাঁ। হরমুনের সামনে আমি আমার আবেগ প্রকাশ করতে পারিনি। কিন্তু তোমার কাছে তো আমি মনের সব কথা খুলে বলতে পারি। তুমি আমার বান্ধবী। আমার-ই মত একজন নারী। নারীর হৃদয় বহন কর তুমি। আচ্ছা বল তো, আমাদের জীবনটা কি? আমরা সুদর্শন খঞ্জর। মধুর বিষ। আমাদের দেহ ব্যবহৃত হয় পুরুষের বিনোদ সামগ্রী আর প্রতারণার ফাঁদ হিসেবে। এ-ই কি আমাদের জীবনের মূল্য? এমন কথা

আমি আগে কখনো ভাবিনি। আমার মধ্যে কোন আবেগ-আসক্তি আছে বলেও মনে করিনি কখনো। কিন্তু এ লোকটির দেহের পরশ আমার ঘুমন্ত সব আবেগ-স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছে। আমি এখন নিজেকে যুগপৎ মা-বোন-কন্যা এবং একজন পুরুষপ্রার্থী নারী বলে কল্পনা করছি।' আবেগঝরা কণ্ঠে বলল লুজিনা।

এক নাগাড়ে এতগুলো কথা বলার পরও বলা শেষ হয় না লুজিনার। আবার বলতে শুরু করে সে–

'আমাকে সন্ত্রাসের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আমি নাশকতামূলক কাজে এত দক্ষতা অর্জন করেছি যে, আমি যে কোন স্বৈরশাসককে আঙ্গুলের উপর নাচাতে পারি। কিন্তু ডাকাতরা আমাকে বিক্রয়ের পণ্যে পরিণত করেছে। আমাকে তারা এমন এক স্তরে নামিয়ে এনেছে, যেখানে আমার মত মেয়েরা প্রতি রাতে নিত্য নতুন খদ্দেরের হাতে বিক্রি যায় কিংবা কোন মুসলমান আমীর বা শাসকের হেরেমের দাসীতে পরিণত হয়। হাদীদ আমাকে সেখান থেকে উপরে তুলে এনেছে। ডাকাতদের হাতে পড়ার আগে আমি তার বন্দীনী ছিলাম। ইচ্ছে করলে সে আমাকে তার বিনোদ উপকরণে পরিণত করতে পারত। কিন্তু তা সে করেনি। তারপর যখন লোকটি আমার ইজ্জত রক্ষা করার জন্য নিজের দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করল, তখন আমি নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি; জড়িয়ে নিই তাকে নিজের বুকের সঙ্গে।

সালাহুদ্দীন আইউবীর একটি কথা আমার মনে পড়ে যায়। তিনি আমায় বলেছিলেন, তুমি কোন সম্ভ্রান্ত পুরুষের স্ত্রী হয়ে মর্যাদার সাথে জীবন কাটাতে পার না? তখন লোকটিকে আমার কাছে বোকা মনে হয়েছিল। মনে মনে বলেছিলাম, নিতান্ত বেওকুফ ছাড়া এমন কথা বলে নাকি কেউ! কিন্তু এখন অনুভব করছি, তিনি কত মূল্যবান কথা বলেছিলেন।

শোন সখী! আমি তোমায় পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, গুপ্তচরবৃত্তি করা আর আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। শৈশব থেকে যে প্রশিক্ষণ আমাকে দেয়া হয়েছিল, তার সব আমি হারিয়ে ফেলেছি। মরুভূমির সেই ভয়ানক রাত, দস্যুর ভয় আর হাদীদের দেহের উষ্ণ পরশ ও তার রক্তের ঘ্রাণ আমার ভিতর থেকে সব বিদ্যা ধুয়ে মুছে ছাফ করে দিয়েছে।'

লুজিনার অবলীলায় বলে যাওয়া কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনে তার বান্ধবী। লুজিনা থামলে এবার মুখ খুলে সে। বলে–

'এতগুলো কথা না বললেও তোমার মনের অবস্থা বুঝতে আমার অসুবিধা হত না। কিন্তু বাস্তবকে তো আর অস্বীকার করা যায় না লুজি! যার জন্য তোমার এত ব্যাকুলতা, এখান থেকে একদিন তাকে চলে যেতেই হবে। আর তুমিও পারবে না তার সঙ্গে যেতে। এ সময়ে যদি সে এখানে কষ্টেও থাকে, তবু উপরের নিষেধাজ্ঞার কারণে তুমি তো তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারছ না। চেষ্টা করতে পার, কিন্তু ধরা

পড়লে তোমার সঙ্গে তাকেও জীবন হারাতে হবে। অতএব, এসব চিন্তা ত্যাগ করে তুমি শান্ত হও।'

'তুমি আমাকে একটু সাহায্য কর বোন! এতটুকু খবর নাও যে, লোকটি কোথায় আছে। হাদীদ সুস্থ হয়ে আপন গন্তব্যে চলে গেছে, এটুকু জানতে পারলেই আমার মন শান্তি পাবে। এটুকু উপকার তুমি আমার কর বোন!' মিনতির সুরে বলল লুজিনা।

'ঠিক আছে, এ কাজ আমি করতে পারব। তুমি শান্ত হও। কক্ষে চলে যাও, আরাম কর।' বলল বান্ধবী।

লুজিনা তার কক্ষে চলে যায়। বান্ধবী চলে যায় অন্যদিকে।

✿ ✿ ✿

কায়রোতে চলছে ব্যাপক সেনা তৎপরতা। সৈন্যদের সামরিক মহড়া চলছে। অতর্কিত আক্রমণ, অল্প ক'জনে দুশমনের বিপুল সৈন্যের উপর হামলা চালিয়ে শত্রুর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে কমান্ডো বাহিনী। আক্রমণ করে চোখের পলকে হাওয়া হয়ে যাওয়ার ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে তাদের। রাতের বেলাও ছাউনিতে অবস্থান নেয়ার সময় পাচ্ছে না তারা; থাকতে হচ্ছে ছাউনির বাইরে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী নিজে মহড়ার তদারকি করছেন। তিন-চার দিন পরপর তিনি উচ্চপদস্থ অফিসার ও গ্রুপ কমান্ডারদের উদ্দেশে বক্তৃতা করছেন এবং মানচিত্রের সাহায্যে তাদের রণকৌশল শিক্ষা দিচ্ছেন।

তাঁর এ প্রশিক্ষণের মূলনীতি হল, স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের পক্ষে দুশমনের ব্যাপক ক্ষতিসাধন, অস্ত্রের চেয়ে বুদ্ধিকে বেশী কাজে লাগান, মুখোমুখি লড়াই এড়িয়ে চলা, সম্মুখ থেকে হামলা না করা, দিনে একশত সৈন্য মুখোমুখি লড়াই করে দুশমনের যে পরিমাণ ক্ষতি করতে পারে, রাতে দশ-বারজনের কমান্ডো আক্রমণে তার চেয়ে বেশী সাফল্য অর্জন করা। তাছাড়া দুশমনের দুর্গ কিংবা শহর দীর্ঘ সময় অবরোধ করে রাখার পদ্ধতি এবং দুর্গের প্রাচীর ভাঙ্গার নিয়মও শিক্ষা দেন সুলতান। দুর্বল ও বয়স্ক উট, ঘোড়া ও খচ্চরগুলো আলাদা করে ফেলেন তিনি। আক্রমণের দিন-ক্ষণ ঠিক হয়ে আছে আগেই।

সুলতান আইউবী ফিলিস্তীন জয়ের যে পরিকল্পনা স্থির করেছেন, তার প্রথম অভিযানে সাফল্যের সঙ্গে ফিলিস্তীন প্রবেশ করার তৎপরতা চলছে জোরেশোরে। অপরদিকে আইউবীকে পথেই প্রতিহত করার আয়োজন করছে খৃষ্টান বাহিনী। প্রস্তুতি দেখে মনে হচ্ছিল, দু' পক্ষ-ই একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে চিরদিনের জন্য।

শোবক থেকে কার্ক এবং মিসরের সীমান্ত পর্যন্ত ক্রুসেডারদের আয়োজনের পরিধি। এ অঞ্চলের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে তারা তাদের সেনাবাহিনী। এ বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে তারা সুলতান আইউবীর জন্য ফাঁদ হিসেবে গড়ে তুলেছে। এ ফাঁদে একবার

আটকা পড়লে জীবনেও উদ্ধার পাবে না আইউবী। সুলতান আইউবীর সে পরিকল্পনার-ই আলোকে চলছে তাদের প্রস্তুতি, যা সময়ের আগেই তাদের গোচরে এসে গেছে। মনে মনে আত্মতৃপ্তিতে বিভোর খৃষ্টান রাষ্ট্রনায়ক ও সেনাপতিগণ।

এই ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতির ফাঁকে শোবকে চলছে অন্য এক গোপন তৎপরতা। তার সম্পর্ক যুদ্ধের সঙ্গে নয়– হৃদয়ের সঙ্গে।

লুজিনা নির্লিপ্ত পড়ে আছে তার কক্ষে। বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্ করছে সে হাদীদের জন্য। হাদীদের অমঙ্গল-আশংকায় উথালপাথাল করছে তার মন।

লুজিনার বান্ধবী দু'দিন ধরে ঘুরে ফিরছে হাদীদের সন্ধানে। হাদীদ অফিসারদের হাসপাতালে নেই। নেই সাধারণ সৈনিকদের হাসপাতালেও।

পদস্থ গুপ্তচর হওয়ার সুবাদে বড় বড় অফিসারদের কাছে তার অবাধ যাতায়াত। সকলে তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। এ সুযোগকে কাজে লাগায় সে। 'লুজিনার সঙ্গে যে আহত মুসলিম ফৌজি এসেছিল, এখন সে কোথায়?' একে একে ছোট-বড় সব অফিসারকে জিজ্ঞেস করে লুজিনার বান্ধবী। কিন্তু প্রত্যেকের একই জবাব, কই এমন কাউকে তো আমি দেখিনি!

তৃতীয় দিন এক অফিসার তাকে সাবধানতার সাথে জানায়, লুজিনার সঙ্গে আসা আহত মুসলিম ফৌজিকে ব্যান্ডেজ করে 'মুসলিম ক্যাম্পে' পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

শোবকের 'মুসলিম ক্যাম্প' এক ভয়ংকর স্থান। মুসলিম যুদ্ধবন্দী আর বিজিত অঞ্চল থেকে ধরে আনা নিরপরাধ বেসামরিক মুসলমানদের রাখা হয় এ ক্যাম্পে। লুণ্ঠিত কাফেলার মুসলমানদের ধরে এনেও এ ক্যাম্পে নিক্ষেপ করে খৃষ্টানরা। 'বেগার ক্যাম্প' নামে পরিচিত এ ক্যাম্প।

এটি কোন কারাগার নয়। এখানে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা নেই। যাদেরকে এখানে রাখা হয়, তাদের নিয়মিত কোন রেকর্ডও রাখা হয় না। পশুর মত আচরণ করা হয় এখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে। কোথাও প্রয়োজন হলে এখান থেকে পছন্দমত লোকদের ভেড়া-বকরীর মত হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে। গাধার মত খাটান হয় তাদের। খাবার দেয়া হয় সামান্য; বেঁচে থাকতে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু। থাকে তারা তাঁবুতে। যারা সাধারণ রোগে আক্রান্ত হয়, কেবল তাদের-ই চিকিৎসা করা হয়। রোগ বেড়ে গেলে মেরে ফেলা হয় বিষ খাইয়ে। এ অমানুষিক নির্যাতন সেলে নিক্ষিপ্ত বিপুলসংখ্যক মুসলমানের একমাত্র অপরাধ, তারা মুসলমান। গুপ্তচর মারফত সুলতান আইউবী অবহিত ছিলেন শোবকের এই বেগার ক্যাম্প সম্পর্কে।

হাদীদকেও পাঠিয়ে দেয়া হয় এ ক্যাম্পে। বান্ধবীর মুখে এ সংবাদ শুনে শিউরে উঠে লুজিনা। ধক্ করে জ্বলে উঠে তার হৃদয়। বেগার ক্যাম্পের পুরো চিত্র ফুটে উঠে তার চোখের সামনে।

হাদীদের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি নেই লুজিনার। গোয়েন্দা প্রধান হরমুন কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছে তাকে। একজন মুসলিম ফৌজির প্রতি এতটুকু আবেগপ্রবণ হওয়ার শাস্তির কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু সে নিষেধাজ্ঞা মেনে নেয়নি লুজিনা। হাদীদ বেগার ক্যাম্পে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে, বান্ধবীর মুখে এ সংবাদ শুনে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠে লুজিনা। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বান্ধবীকে বলে, যে করে হোক, আমি ওকে মুক্ত করব-ই। তুমি আমায় সাহায্য কর বোন! সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয় বান্ধবী। পরিকল্পনা প্রস্তুত করে দু'জনে মিলে।

লুজিনা তৎক্ষণাৎ ছুটে যায় শহরে। সাক্ষাৎ করে এক প্রাইভেট ডাক্তারের সঙ্গে। বলে, একজন আহত রোগী আছে, আপনাকে তার চিকিৎসা করতে হবে। কিন্তু বিষয়টা সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে। এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলা যাবে না।

গোপনীয়তার কারণ জানতে চায় ডাক্তার।

'লোকটি একজন গরীব মুসলমান। সে আমার পরিবারের বহু উপকার করেছে। এক জায়গায় ঝগড়া-ঝাটি করে এখন সে আহত। অর্থ-কড়ি নেই বলে কোন ডাক্তার তার চিকিৎসা করছে না। এখানকার সব ডাক্তার-ই যে খৃষ্টান। বিনা পয়সায় একজন মুসলমানের তারা চিকিৎসা করবে-ই বা কেন!

তাছাড়া ঝগড়া-ঝাটি করে একজন মুসলমান আহত হয়েছে, প্রশাসন এ খবর পেলে নিশ্চিত তাকে বেগার ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে। গোপনীয়তা রক্ষা করার এ-ও এক কারণ। লোকটি আমার পরিবারের যে উপকার করেছে, আমি তার প্রতিদান দিতে চাই। আমি তাকে রাতের বেলা নিয়ে আসব। বলুন, আপনাকে কত দিতে হবে? গোপনীয়তা রক্ষা করার পুরস্কারও আমি আপনাকে দেব।' বলল লুজিনা।

ডাক্তারের কাছে নিজেকে এক ভদ্র পরিবারের মেয়ে বলে পরিচয় দেয় লুজিনা। নিজের আসল পরিচয় গোপন রাখে সে।

কথার ফাঁকে ডাক্তার আপাদমস্তক এক নজর দেখে নেয় লুজিনার। যুবতীর অস্বাভাবিক রূপে বিমোহিত হয়ে পড়ে ডাক্তার। পারিশ্রমিকের কথা মুখে আনার ভাষা হারিয়ে যায় তার। রূপের চেয়ে বড় মূল্যবান বস্তু আর কি হতে পারে, তা খুঁজে পাচ্ছে না সে।

ডাক্তারের দৃষ্টির অর্থ বুঝে ফেলে লুজিনা। ডাক্তার যে তার রূপের জালে আটকা পড়েছে, তা বুঝতে আর বাকি রইল না তার। লুজিনা এ জগতের অভিজ্ঞ মেয়ে। নিজের যোগ্যতা কাজে লাগায় সে। মোমের মত গলে যায় ডাক্তার।

লুজিনা চারটি স্বর্ণমুদ্রা গুজে দেয় ডাক্তারের হাতে। ডাক্তার যুবতীর হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে হাসিমুখে বলে, তোমার চেয়ে মূল্যবান বিনিময় আর হতে পারে না। বিশেষ ভঙ্গিতে স্মিত হাসি বেরিয়ে আসে লুজিনার দু' রাঙা ঠোঁটের ফাঁক বেয়ে। বলে, আপনি যা চাইবেন, তা-ই দেব; আগে আমার কাজ করুন।

ডাক্তার বুঝে ফেলল, বিষয়টি বিপজ্জনক ও রহস্যময়। কিন্তু লুজিনার রূপের ফাঁদে আটকে গিয়ে এ বিপদের ঝুঁকি মেনে নেয় সে। বলল, 'রোগী নিয়ে এস। আজ রাত, কাল রাত যেদিন ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা এস। এসে আমাকে ঘুমে পেলেও জাগিয়ে দিও।'

ডাক্তার এক হাতে সোনার মুদ্রা আর অপর হাতে লুজিনার পেলব-কোমল হাতখানা মুঠি করে ধরে অপলক নেত্রে লুজিনার মুখপানে তাকিয়ে থাকে।

❁ ❁ ❁

হাদীদকে ক্যাম্প থেকে বের করে আনাটা-ই এ অভিযানের সবচেয়ে স্পর্শকাতর ও বিপজ্জনক কাজ। রাতে ক্যাম্পে নামমাত্র পাহারা থাকে বটে, কিন্তু ক্যাম্পে এসে হাদীদকে খুঁজে বের করে আনা লুজিনার পক্ষে ষোল আনাই ঝুঁকিপূর্ণ। ধরা পড়লে মৃত্যুদন্ড অনিবার্য।

ক্যাম্প সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে লুজিনার বান্ধবী। যেমন যখমী ও রুগ্ন কয়েদীদের প্রতিদিন অতি সাধারণ একটি ডাক্তারখানায় হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের সঙ্গে থাকে মাত্র একজন প্রহরী।

পরদিন বান্ধবীর সঙ্গে লুজিনা সেই ডাক্তারখানার সামনে এসে দাঁড়ায়। তাদের বেশী অপেক্ষা করতে হল না। পঁচিশ-ত্রিশজন রোগীর একটি দল পা টেনে টেনে অতি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে এদিকে। লাঠি হাতে তাদের পশুপালের ন্যায় হাঁকিয়ে নিয়ে আসছে একজন প্রহরী। যারা দ্রুত হাঁটতে পারছে না, তাদের লাঠির দ্বারা ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসছে সে।

চোখে-মুখে কৌতূহলী ভাব নিয়ে সামনে অগ্রসর হয় মেয়ে দু'টো, যেন তারা তামাশা দেখছে। রোগীর দলটি তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতে শুরু করলে লুজিনার সন্ধানী দৃষ্টিতে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে শুরু করে সবাইকে। দলের মধ্যে হাদীদকে খুঁজছে সে।

হঠাৎ চমকে উঠে লুজিনা। দলের মধ্য থেকে একজন লোক প্রবল ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চোখ লাল করে তাকিয়ে আছে তার প্রতি। ভালভাবে হাঁটতে পারছে না সে। লোকটি হাদীদ। পান্ডুর চেহারা। আহত হওয়ার আগে লুজিনা তার চেহারায় যে জৌলুস দেখেছিল, এখন আর তা নেই। পোষাকে শুকিয়ে যাওয়া লাল চট্‌চটে রক্তের দাগ।

দেখে কান্না আসে লুজিনার। ঝর ঝর করে দু' চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে বেদনার অশ্রু। কিন্তু হাদীদের দৃষ্টিতে ঘৃণার ভাব। লুজিনার উপর থেকে চোখ সরিয়ে নেয় সে।

আরো সম্মুখে এগিয়ে যায় রোগীর দলটি। প্রহরীর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেয় লুজিনা ও তার বান্ধবী। এই মুসলমান রোগীদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে তারা। কথার যাদু দিয়ে প্রহরীকে পটিয়ে ফেলে দু' যুবতী। বলে, কথা বলে এদের সঙ্গে আমাদের একটু তামাশা করতে মন চাইছে।

ডাক্তারখানায় আগে থেকেই রোগীর প্রচন্ড ভীড়। কয়েদীদের বসিয়ে দেয়া হল একদিকে। লুজিনা তাদের ঘনিষ্ঠ হয়। প্রহরীর সঙ্গে মিষ্টি-মধুর গল্প জুড়ে দেয় বান্ধবী। দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে আলাপে মেতে উঠে প্রহরী।

দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে বসে পড়ে হাদীদ। অবস্থা তার ভাল নয়। চোখের ইশারায় তাকে আড়ালে আসতে বলে লুজিনা। লুজিনার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় হাদীদ। লুজিনা ক্ষীণ কণ্ঠে তাকে বলে, 'আমার প্রতি নির্দেশ, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারব না। আমি যে এখন তোমার সঙ্গে কথা বলছি, এ কথা কাউকে বুঝতে দেয়া যাবে না।'

'তোমার উপর আর যারা তোমাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে নিষেধ করেছে, তাদের উপর আল্লাহর লানত। কোন প্রতিদানের লোভে আমি তোমাকে ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা করিনি। তোমাকে রক্ষা করে আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি মাত্র। কিন্তু কর্তব্যপরায়ণ লোকদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করাই কি তোমাদের চরিত্র?' ক্ষীণ অথচ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল হাদীদ।

'চুপ কর হাদীদ! এসব কথা পরে হবে। আগে বল রাতে তুমি থাক কোথায়? আজ রাতেই তোমাকে বের করে আনতে হবে।' ফিস্‌ফিসিয়ে বলল লুজিনা।

হাদীদ লুজিনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল না। লুজিনাকে তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিন্তু লুজিনা চোখের অশ্রু দিয়ে মায়াবী কণ্ঠে হাদীদের মনে এ বিশ্বাস জন্মাতে সক্ষম হয় যে, তার সঙ্গে সে প্রতারণা করছে না। সত্যিই সে তাকে উদ্ধার করতে চায়।

আশ্বস্ত হয়ে হাদীদ বলল, রাতে যেখানে থাকি, সেখান থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন হবে না। কিন্তু বেরিয়ে এসে যাব কোথায়? মুহূর্ত মধ্যে পালানোর একটা পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলে দু'জনে।

✿ ✿ ✿

বেগার ক্যাম্পে মড়ার মত ঘুমিয়ে আছে কয়েদীরা। প্রহরীও গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। এখান থেকে কেউ পালায়নি কখনো। পালিয়ে যাবেই বা কোথায়? নরক হলেও এটাই তাদের বাসস্থান। তাছাড়া এক আধজন পালালেও কৈফিয়ত চায় না কেউ। তাই নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারে প্রহরীরা।

রাতের প্রথম প্রহর শেষ প্রায়। পুরনো জীর্ণ এক তাঁবু থেকে এক ব্যক্তি বেরিয়ে আসে। হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর আড়ালে আড়ালে অতি সন্তর্পণে চলে আসে প্রহরীদের আওতার বাইরে। অন্ধকার সত্ত্বেও সম্মুখে চোখে পড়ে একটি খেজুর গাছ। সেখানেই তার পৌছানোর কথা। খেজুর তলায় দাঁড়িয়ে আছে আপাদমস্তক মোটা কাপড়ে ঢাকা এক ছায়ামূর্তি। হামাগুড়ি থেকে উঠে দাঁড়ায় লোকটি। পায়ে হেঁটে খেজুর তলায় এসে পৌছে সে।

লোকটি হাদীদ। ছায়ামূর্তিটি লুজিনা। হাদীদের অপেক্ষায় পরিকল্পনা মোতাবেক খেজুর তলায় দাঁড়িয়ে আছে সে।

'দ্রুত হাঁটতে পারবে?' জিজ্ঞেস করে লুজিনা।

'চেষ্টা করব।' জবাব দেয় হাদীদ।

ক্যাম্প থেকে বেশ দূরে চলে যায় দু'জন। সামনে বিস্তীর্ণ অনাবাদী ভূমি। দ্রুত হাঁটতে পারছে না হাদীদ। তাকে ধরে দ্রুত নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে লুজিনা। এ ফাঁকে ইতিমধ্যে কি কি ঘটেছে, গোয়েন্দা প্রধান কি বলেছে, হাদীদের ব্যাপারে কি কি নির্দেশ জারী হয়েছে, সব খুলে বলে লুজিনা। মনের সন্দেহ দূর হয়ে যায় হাদীদের। লুজিনার প্রতি আস্থা ফিরে আসে তার।

আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তারা শহরের একটি গলিতে ঢুকে পড়ে। এ গলিতেই ডাক্তারের বাড়ি। ডাক্তারের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায় লুজিনা। বাড়ির দরজায় করাঘাত করে তিন-চারবার। দরজা খুলে ডাক্তার দ্রুত ভিতরে নিয়ে যায় দু'জনকে।

ডাক্তার হাদীদের জখম খুলে নিরীক্ষা করে দেখে। বলে, রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হতে বিশদিনের মত সময় লাগবে।

শুনে ভাবনায় পড়ে যায় লুজিনা। এ এক নতুন সমস্যা। এতদিন হাদীদকে কোথায় লুকিয়ে রাখবে? বেগার ক্যাম্পে তো আর ফেরত পাঠান যাবে না! চিন্তার সাগরে ডুবে যায় লুজিনা। অবশেষে ভেবে-চিন্তে সমাধান একটা ঠিক করে রাখে মাথায়।

হাদীদের জখমে ব্যান্ডেজ করে ডাক্তার বলে, রোগীকে ভাল ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে।

লুজিনা ডাক্তারকে নিভৃতে নিয়ে যায়। বলে, 'লোকটি যেখানে থাকে, সেখানে তার পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা হবে না। আমার ঘরেও রাখতে পারছি না। আপনি তাকে এখানেই রেখে দিন। আপনি-ই তার উপযুক্ত খাবার-পথ্যের ব্যবস্থা করুন। খরচ ও পারিশ্রমিক যা চান, দেব।'

খরচ-পারিশ্রমিকের পরিমাণ জানায় ডাক্তার। বিশাল অংক। আপত্তি জানায় লুজিনা। কিছু কমাবার অনুরোধ করে। ডাক্তার বলে, 'আমাকে দিয়ে তুমি ভয়ংকর এক কাজ করাচ্ছ। আমি জানি, এ লোকটিকে বেগার ক্যাম্প থেকে আনা হয়েছে। লোকটি মিসরী ফৌজের সিপাহী। আমি যে অংক চেয়েছি, আপত্তি না করে যদি তা-ই প্রদান কর, তাহলে এ তথ্য আমার ঘরের বাইরে যাবে না।'

'ঠিক আছে, তা-ই দেব। তবে! যদি ঘুণাক্ষরে এ তথ্য ফাঁস হয়ে পড়ে, তবে আপনিও বাঁচবেন না।' বলে লুজিনা।

ডাক্তার হাদীদকে একটি কক্ষে শুইয়ে দিয়ে বলে, সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া পর্যন্ত তুমি এখানেই থাকবে। ভিতর থেকে দুধ ও ফল এনে খেতে দেয় হাদীদকে। তারপর লুজিনাকে নিয়ে চলে যায় তার কক্ষে ...।

পরদিন লুজিনা ও তার বান্ধবী গোয়েন্দাগিরি করতে যায় ক্যাম্পে। তারা কয়েদী রোগীদের ডাক্তারখানায় প্রহরীদের সঙ্গে গল্প করে। কথার ফাঁকে তারা তথ্য সংগ্রহ করে যে, হাদীদের পালানোর কারণে ক্যাম্পে কোন পরিবর্তন আসেনি। টের পায়নি কেউ এ ঘটনা।

ডাক্তার অতি গোপনীয়তার সাথে হাদীদের চিকিৎসা করছে। পুষ্টিকর খাদ্য-খাবারও দিয়ে যাচ্ছে নিয়মিত। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ডাক্তারের বাসায় আসে লুজিনা। হাদীদের শিয়রে বসে কাটায় কিছু সময়। তারপর ডাক্তারের কক্ষে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে চলে যায়। এভাবে চলে যায় বিশদিন। হাদীদের জখমও শুকিয়ে গেছে। সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। লুজিনা ডাক্তারকে বলে, কাল রাত এসে আমি হাদীদকে নিয়ে যাব। আপনার পাওনাও তখন পরিশোধ করব।

নিম্নপদের এক অফিসার আসক্ত ছিল লুজিনার বান্ধবীর প্রতি। সময় পেলেই ঘুরঘুর করত সে মেয়েটির পিছনে। এ সুযোগ কাজে লাগায় লুজিনা।

পরদিন প্রেমের প্রলোভন দেখিয়ে লুজিনার বান্ধবী অফিসারকে কক্ষ থেকে বের করে নিয়ে যায়। এ ফাঁকে লুজিনা বাক্স থেকে তার সামরিক উর্দি চুরি করে নিয়ে আসে। ডাক্তারের বাসায় গিয়ে আগে তার পাওনা পরিশোধ করে। তারপর হাদীদকে অফিসারের সামরিক পোষাক পরায়। ঘোড়ার ব্যবস্থাও হয়ে যায় অনায়াসে।

নগরীর চারিদিক উঁচু দেয়ালে ঘেরা। চারদিকে চারটি ফটক। ফটকগুলো বন্ধ থাকে দিন-রাত সব সময়। কিন্তু সম্প্রতি সুলতান আইউবীর আক্রমণ প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে যে সামরিক তৎপরতা চলছে, তার কারণে ফটকগুলো দিনের বেলা খোলা থাকছে।

সূর্যাস্তের খানিক আগে এক অশ্বারোহী ছুটে আসে দুর্গের প্রধান ফটকের দিকে। গায়ে খৃষ্টান সেনা অফিসারের সামরিক উর্দি। কোমরে ঝুলছে একটি তরবারী। তরবারীটি মুসলমানদের তরবারীর ন্যায় বাঁকা নয়- সোজা। সব মিলিয়ে তাকে খৃষ্টান সেনা অফিসার মনে না করে উপায় নেই।

ফটক খোলা। বের হচ্ছে রসদ বোঝাই উটের বহর। অশ্বারোহী অফিসার উটের বহরের সঙ্গে যাচ্ছে যেন।

ফটকের নিকটে চলে আসে আরোহী। ঠিক এ সময়ে গোয়েন্দা প্রধান হরমুন ঘোড়ার পিঠে করে প্রবেশ করেন ফটকে। বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরছেন তিনি। অশ্বারোহী অফিসারের প্রতি তার দৃষ্টি পড়ে। তিনি মুচকি হাসেন। কিন্তু হাসি দিয়ে হাসির জবাব দেয় না অফিসার। কয়েক পা ভিতরে ঢুকে ঘোড়া থামান হরমুন। দু' তিন শ' কদম দূরে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পায় লুজিনাকে। হরমুনকে দেখেই দ্রুত কেটে পড়ে লুজিনা। চলে যায় নিজ কক্ষে।

আলী বিন সুফিয়ানের ন্যায় হরমুনও অত্যন্ত বিচক্ষণ গুপ্তচর। মনে বড় একটা খট্‌কা জাগে তার। তিনি সন্দেহে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে দেন ফটকের দিকে। বিদ্যুদ্গতিতে ঘোড়া ছুটান। মনের সন্দেহ দূর করতে চাইছেন তিনি।

অশ্বারোহী অফিসার চলে গেছে বহু দূর। তীরগতিতে এগিয়ে চলছে তার ঘোড়া। চোখের নিমিষে হারিয়ে যায় বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে।

❁ ❁ ❁

কিছুদুর অগ্রসর হয়ে থেমে যান হরমুন। অশ্বারোহী অফিসারের নাগাল পাওয়ার সাধ্য নেই তার। ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে ফিরে আসেন। ফটক পেরিয়ে দ্রুত ঢুকে পড়েন দুর্গের ভিতরে। ছুটে যান বেগার ক্যাম্পে। হাদীদের লক্ষণ বলে ইনচার্জকে জিজ্ঞেস করেন, লোকটি কোথায়? কিছুই বলতে পারে না ইনজার্চ। হাদীদকে পাওয়া গেল না ক্যাম্পে। যে তাঁবুতে তাকে রাখা হয়েছিল, তার অধিবাসীরা জানায়, লোকটি একদিন সকালে অনুপস্থিত ছিল। আমরা মনে করেছিলাম, আশেপাশে কোথাও আছে; কিন্তু আর ফিরে আসেনি।

হরমুনের সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়। খৃষ্টান সৈন্যের উর্দি পরিহিত যে লোকটিকে তিনি ঘোড়ায় চড়ে ফটক পেরিয়ে যেতে দেখেছিলেন, সে হাদীদ-ই ছিল। আরো কিছু খোঁজখবর নিয়ে লুজিনার কক্ষে যান হরমুন।

মাথায় হাত চেপে কক্ষে নতমুখে বসে আছে লুজিনা। কোন ভূমিকা ছাড়াই গর্জে উঠেন হরমুন–

'তু-ই কি ভাগিয়েছিস্ লোকটাকে? মিথ্যা বলে রেহাই পাবি না। তদন্ত করে আমি প্রমাণ করে ছাড়ব যে, তু-ই ওর পলায়নে সাহায্য করেছিস্।'

ধীরে ধীরে মাথা উঠায় লুজিনা। অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে হরমুনের প্রতি। হরমুনের দু'চোখে আগুন। প্রবল ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তিনিও তাকিয়ে আছেন লুজিনার প্রতি।

মুখ খুলে লুজিনা–

'আপনার তদন্তের প্রয়োজন নেই। আমার মিথ্যে বলারও আবশ্যক নেই। আমার জীবনটা-ই এক রাজকীয় মিথ্যা। আমার অস্তিত্ব চোখ ধাঁধাঁনো এক প্রতারণা। নিজের আত্মার মুক্তির জন্য সত্য বলেই আমি মৃত্যুবরণ করছি।'

লুজিনার কণ্ঠস্বরে নেশার ভাব। আস্তে আস্তে বেড়ে চলেছে তা। বসা থেকে উঠে দাঁড়ায় সে। পা দু'টো কাঁপছে তার। নিকটে-ই পড়ে আছে একটি গ্লাস। তাতে কয়েক ফোঁটা পানি। কম্পিত হাতে গ্লাসটি তুলে নিয়ে হরমুনের প্রতি এগিয়ে ধরে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে–

'আমি নিজেই আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি। এ গ্লাসের অবশিষ্ট কয়েক ফোঁটা পানি-ই তার সাক্ষী। আমার এই অপবিত্র দেহটাকে মৃত্যুদণ্ড আমি এজন্য দেইনি যে, আমি স্বজাতির সঙ্গে গাদ্দারী করেছি। বরং কারণ হল, আমি সেসব লোকদের ধোঁকা দিতে

গিয়েছিলাম, যারা ধোঁকা-প্রতারণা বলতে কিছু বুঝে না। তাদের চারটি লোক আমার ইজ্জত রক্ষা করার জন্য– যা লুণ্ঠিত হয়েছে আগেই– দশজন দস্যুর মোকাবেলা করেছে। সবশেষে একজন নিজের দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে আমাকে ডাকাতদের হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছে! এখন আমি ভাল-মন্দ ও ভালবাসা-ঘৃণার পার্থক্য বুঝি। আমি সত্য কথা বলেই মৃত্যুবরণ করছি। এ এক শান্তিময় মৃত্যু।'

দু'চোখ অন্ধকার হয়ে আসে লুজিনার। কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যেতে শুরু করে সে। হাত থেকে গ্লাসটা সরিয়ে নিয়ে তাকে ধরে ফেলেন হরমুন। গায়ে বল নেই। তবু এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় হরমুনের বাহুবন্ধন থেকে। মাটিতে পড়ে যায় লুজিনা। শুয়ে শুয়ে অস্ফুট স্বরে বলে জীবনের শেষ কথাগুলো–

'আমাকে ছুঁয়ো না হরমুন। এখন আর আমি তোমাদের কোন কাজে আসব না। আমার মধ্যে সত্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে এ বিষ; তোমাদের প্রয়োজন অপবিত্র নারী দেহ। ওকে আমি-ই ভাগিয়েছি। লুকিয়ে রেখেছিলাম বিশ দিন। ফার্নান্ডেজের উর্দি চুরি করে ওকে পরিয়েছি আমি। আমি-ই ওকে ঘোড়া দিয়েছি। আমি ওর সঙ্গে যেতে পারিনি, ওকে ছাড়াও থাকতে পারছিলাম না। তাই বিষপান করেছি। তুমি যদি আমায় না-ও দেখে ফেলতে, তবু এ বিষপান আমি করতাম-ই। সত্য বলে মৃত্যুবরণ করাকে কত যে শান্তি, কত যে আনন্দ, এ মুহূর্তে আমি তা গভীরভাবে উপলব্ধি করছি।'

ঝিমিয়ে পড়ে লুজিনা। সোজা হয়ে যায় তার বিষাক্ত দেহ। বুজে আসে দু'চোখের পাতা। মৃত্যুর কোলে ঘুমিয়ে পড়ে সে চিরদিনের জন্য।

গোয়েন্দা প্রধান হরমুন হতবুদ্ধির ন্যায় পলকহীন নেত্রে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে লুজিনার মৃত দেহটার প্রতি। বারবার প্রতিধ্বনিত হয়ে তার কানে বাজতে থাকে লুজিনার জীবনের শেষ বাক্যটি–

'সত্য বলে মৃত্যুবরণ করায় কত যে শান্তি, কত যে আনন্দ, এ মুহূর্তে আমি তা গভীরভাবে উপলব্ধি করছি।'

শেষকৃত্য সম্পন্ন হল লুজিনার। আপন বলতে কেউ নেই তার। বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয় কেউ নয়। ছোটকালে এক কাফেলা থেকে তাকে তুলে আনা হয়েছিল। তখন বয়স তার দশ কি এগার বছর। তাই কাউকে তার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছানোর ঝামেলা পোহাতে হল না অফিসারদের।

❁ ❁ ❁

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনী অভিযানে রওনা হয়েছে তিনদিন হল। তাদের প্রতিহত করার জন্য পথে অবস্থান নিয়েছে খৃষ্টান বাহিনী। আইউবীর ঘোষণা অনুযায়ী হামলা হবে কার্কে। তাই শোবকের অধিকাংশ সৈন্য এখন কার্কেই অবস্থান করছে। সিরিয়া অভিমুখেও রওনা হয়ে গেছে একটি বাহিনী। উদ্দেশ্য, নুরুদ্দীন জঙ্গী আইউবীর সাহায্যে এগিয়ে আসলে তাঁকে প্রতিহত করা।

নিজের বাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করে নিয়েছেন আইউবী। পরস্পর দূরত্ব বজায় রেখে অগ্রসর হচ্ছে তাঁর তিন বাহিনী। একস্থানে এসে শিবির স্থাপন করেন সুলতান। অধীন সব কমাণ্ডারকে তলব করেন নিজের তাঁবুতে। বললেন–

'এবার আমার মনের গোপন কথা প্রকাশ করতে হচ্ছে। আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম, আক্রমণ হবে কার্কে। কিন্তু তোমাদের নিয়ে এসেছি অন্য পথে। বিষয়টা তোমাদের মনে খট্‌কা লাগছে নিশ্চয়। কিন্তু শোন, আমি কার্ক আক্রমণ করব না। লক্ষ্য আমার শোবক দুর্গ।

তিন খৃষ্টান গোয়েন্দাকে আমি কেন মুক্তি দিলাম, রক্ষীর প্রহরায় তাদের শোবক পৌঁছানোর ব্যবস্থা-ই বা কেন করলাম, এ প্রশ্ন তোমাদের ভাবিয়ে তুলেছে জানি। এখন শোন তার রহস্য।

গোয়েন্দাদের পাশের কক্ষে বসিয়ে মাঝের দরজা ঈষৎ ফাঁক করে রেখে আমি উচ্চকণ্ঠে আলী বিন সুফিয়ান ও দু' নায়েবকে বলতে শুরু করেছিলাম, অমুক তারিখে আমি কার্ক আক্রমণ করব। আমি জানতাম, আমার কথাগুলো সব গোয়েন্দাদের কানে যাচ্ছে। আমি একথাও তাদের কানে দিয়েছি যে, খৃষ্টানদের সঙ্গে খোলা মাঠে লড়তে আমাদের ভয় হয়।

এসব কথা কানে দিয়ে মুক্ত করে দিয়েছিলাম খৃষ্টান গোয়েন্দাদের। চারজন রক্ষী দিয়ে তাদের নিরাপদে শোবক পৌঁছার ব্যবস্থাও করেছিলাম। সংবাদ পেয়েছি, শোবক যাওয়ার পথে তারা এক দুর্ঘটনার শিকার হয়। কতিপয় ডাকাত আমার তিনজন রক্ষী ও একটি গোয়েন্দা মেয়েকে হত্যা করে ফেলেছে। চতুর্থ রক্ষী গতকাল রাতে শোবক থেকে ফিরে এসেছে। গোয়েন্দা মারফত আমি জানতে পেরেছি যে, আলেম গোয়েন্দা জীবিত শোবক পৌঁছুতে সমর্থ হয়েছে। সে আমার কার্ক আক্রমণের পরিকল্পনার কথা খৃষ্টান কর্মকর্তাদের অবহিত করার কৌশল সফল করেছে। আমি যেভাবে চেয়েছিলাম, খৃষ্টানরা সেভাবেই তাদের বাহিনীকে ছড়িয়ে দিয়েছে। এ মুহূর্তে আমাদের বাহিনীর বাম অংশের অবস্থান খৃষ্টানদের বিশাল এক বাহিনীর বাম দিকে বার মাইল দূরে।'

বাহিনীর বাম অংশের কমাণ্ডারকে উদ্দেশ করে সুলতান বললেন, 'আজ সূর্যাস্তের পরপর তুমি তোমার সকল অশ্বারোহী বাহিনীকে সোজা দু' মাইল সম্মুখে নিয়ে যাবে। সেখান থেকে মোড় নেবে বাঁয়ে। যাবে আরো সোজা চার মাইল। তারপর আবার বাঁয়ে মোড়। দু'মাইল অগ্রসর হওয়ার পর দেখবে শত্রু বাহিনী আরাম করছে। তীব্র গতিতে কমান্ডো আক্রমণ চালাবে তাদের উপর। অল্প সময়ে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করবে। সামনে যা পাবে, পায়ে পিষে দ্রুত ফিরে আসবে আগের জায়গায়।

বাহিনীর দ্বিতীয় অংশ সোজাসুজি সম্মুখে এগিয়ে যাবে। আট ন' মাইল পথ অতিক্রম করবে। শত্রু বাহিনীর রসদ ও কাফেলা চোখে পড়বে। তখন থাকবে তোমরা দুশমনের পিছনে। দিনের বেলা শত্রু বাহিনী তোমাদের বাম অংশকে ধাওয়া করবে। মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত হবে না। দিনের বেলা সরে আসবে অনেক পিছনে।

আক্রমণ করবে রাতে। আক্রমণের পর থামবে না একদন্ডও, সরে আসবে পিছনে। সম্মুখে অগ্রসর হবে খৃস্টান বাহিনী। তখন মাঝের অংশ পিছন থেকে তাদের উপর আক্রমণ করবে। নিজেদের সামলে নিয়ে তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।

বাহিনীর তৃতীয় অংশকে নিয়ে আমি আজ রাতে-ই রওনা হব। আগামীকাল দুপুর পর্যন্ত আমরা শোবক অবরোধ সম্পন্ন করে ফেলব। বাহিনীর অপর দুই অংশ আমার শেখানো নিয়মে শত্রু বাহিনীকে মরুভূমিতে অস্থির করে রাখবে। তাদের কাছে রসদ পৌঁছতে দেবে না। সুযোগমত পানির ঝর্ণাগুলো দখল করে নেবে। আক্রমণ করবে সবসময় শত্রুর বাম পার্শ্ব থেকে। আক্রমণের পর লড়াই করার জন্য বিলম্ব করবে না। অতর্কিত কমান্ডো আক্রমণ করেই চোখের পলকে কেটে পড়বে। সুইসাইড স্কোয়াড প্রতিরাতে অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করবে দুশমনের পশুপালের উপর।'

১১৭১ সাল। বছরের ঠিক শেষ দিন। দীর্ঘ অপেক্ষার পর কার্কের লোকেরা জানতে পায় যে, শোবকের মত তাদের শক্ত দুর্গ সুলতান আইউবী অবরোধ করে ফেলেছেন। অথচ, তাদের বেশীর ভাগ সৈন্যকে সমবেত করা হয়েছে কার্কে, পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে মরুভূমিতে। এসে তারা শোবককে সাহায্যও করতে পারছে না। মুসলিম বাহিনী মরুভূমির সৈন্যদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে ফিরছে। সামনে এসে মুখোমুখি লড়াই করছে না মুসলিম বাহিনী। গেরিলা ও কমান্ডো আক্রমণ করে তারা সীমাহীন ক্ষতি করছে খৃষ্টানদের। তারা খৃষ্টানদের রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। পানির ঝর্ণাগুলোও এখন তাদের দখলে।

হারিয়ে গেছে খৃষ্টান বাহিনীর মনোবল। উভয় সংকটে পড়ে গেছে তারা। না পারছে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে, না পারছে পিছনে সরে গিয়ে শোবক রক্ষা করতে। তারা দু' চোখে শোচনীয় পরাজয় ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

শোবক দুর্গ অবরোধ করেছেন সুলতান আইউবী। দুর্গ ও নগরীর পাঁচিলে দাঁড়িয়ে তীর ও বর্শা ছুড়ে মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করে স্বল্পসংখ্যক খৃষ্টান সৈন্য। বেশিক্ষণ টিকতে পারে না তারা। দুর্গের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে আইউবীর বাহিনী। প্রায় দেড় মাস অবরোধ করে রাখার পর দুর্গে প্রবেশ করেন সুলতান। সর্বাগ্রে ছুটে যান বেগার ক্যাম্পে। সিজদায় লুটিয়ে পড়ে ক্যাম্পের হাড্ডিসার মুসলিম বন্দীরা।

মরুভূমির খৃষ্টান সৈন্যরা দিশে হারিয়ে পিছনে সরে গিয়ে ঢুকে পড়ে কার্ক দুর্গে। ওখানে বিপুলসংখ্যক সৈন্য বেকার বসে বসে সুলতান আইউবীর আক্রমণের অপেক্ষায় প্রহর গুণছে।

আইওনা নয় আয়েশা

১১৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস।

শোবক দুর্গ মুসলমানদের পদানত হলেও শহরে এখনো শান্তি-শৃংখলা ফিরে আসেনি। খৃষ্টান পরিবারগুলো শহর ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করছে। পালিয়ে গেছেও কেউ কেউ। শোবকের মুসলমানদের উপর তারা যে নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল, তার-ই প্রতিশোধ আশংকায় তারা তটস্থ। কৃতকর্মের প্রতিশোধ হিসেবে মুসলমানরা তাদের বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেবে, এই ভয় তাদের তাড়া করে ফিরছে। তারা যখন দুর্গ থেকে পলায়নপর খৃষ্টান বাহিনীকে সুলতান আইউবীর তীরান্দাজ বাহিনীর তীরের আঘাতে জীবন দিতে এবং অস্ত্র সমর্পণ করতে দেখেছিল, তখন প্রতিশোধ অভিযানের ভয়ে তারা পরিবার-পরিজনসহ ঘর-বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে শুরু করেছিল।

মুসলিম সৈনিকগণ তাদের আপন ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালাতে নিষেধ করে। সালার ও কমান্ডারগণ নিজ নিজ সৈনিকদের আদেশ করেন, কোন নাগরিককে যেন নগর ছেড়ে পালাতে দেয়া না হয়। নির্দেশ পেয়ে মুসলিম সৈন্যরা পলায়নপর খৃষ্টানদেরকে মরুভূমির দূর-দূরান্ত পথ ও পার্বত্য অঞ্চল থেকে ধরে ধরে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে শুরু করে।

তবু ভয় কাটছে না তাদের। তারা নিজ শাসকবর্গের পাপের কথা ভুলে যায়নি। এখানকার মুসলমানদের মানবিক অধিকার কেড়ে নিয়েছিল খৃষ্টান শাসকরা। যেন ওরা মানুষ নয়– নরকের কীট। 'বেগার ক্যাম্প' তার জীবন্ত প্রমাণ।

এ ক্যাম্প সম্পর্কে অবহিত ছিলেন সুলতান আইউবী। তাই শোবকে প্রবেশ করেই আগে ছুটে আসেন তিনি এ ক্যাম্পে। তখনো অন্তত দু' হাজার মুসলমান বন্দী ছিল এখানে। চরম মানবেতর জীবন যাপন করছিল তারা। দু' হাজার মানুষ নয়, যেন দু' হাজার লাশ। পশুর মত খাটান হত তাদের। মানুষের পায়খানা পর্যন্ত বহন করান হত তাদের দ্বারা।

এখানে অনেকে এসেছিল যৌবনে। এখন তারা বৃদ্ধ। তারা ভুলে গেছে যে, তারা মানুষ। প্রথম দিকের লড়াইগুলোর যুদ্ধবন্দীও আছে এখানে।

এ ক্যাম্পের হতভাগ্যদের অধিকাংশ-ই হল তারা, যাদেরকে বিভিন্ন কাফেলা কিংবা

শহর থেকে ধরে এনে এখানে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তারা ছিল হয়ত বড় কোন ব্যবসায়ী কিংবা কোন রূপসী কন্যার পিতা। সম্পদ-কন্যা ছিনিয়ে নিয়ে খৃষ্টানরা তাদের বন্দী করে রাখে এ ক্যাম্পে। ইসলামী সালতানাতের প্রতি সমর্থন ও ক্রুসেডের বিরুদ্ধাচারণের অভিযোগেও এখানে বন্দী হয়েছিল কেউ কেউ।

শহরের মুসলিম অধিবাসীরা নামায পড়ত, কুরআন তেলাওয়াত করত নিজ ঘরে, অতি সংগোপনে। শব্দ যেন বাইরে না আসে, সেদিকেও তাদের সতর্ক থাকতে হত।

একজন অতি সাধারণ খৃষ্টানকেও মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করতে হত মুসলমানদের। সুন্দরী যুবতী মেয়েদের লুকিয়ে তো রাখতে হত-ই। নিষ্পাপ কিশোরীদেরও বাইরে বের হতে দেয়া যেত না। সুশ্রী হলে অপহরণ করে নিয়ে যেত খৃষ্টানরা।

বেগার ক্যাম্পের এ দু' হাজার জিন্দা লাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন সুলতান আইউবী। অশ্রুতে ঝাপ্‌সা হয়ে আসে তার দু' চোখের পাতা। কান্নাভেজা কণ্ঠে বললেন, আমার এই মজলুম ভাইদের মুক্ত করার জন্য প্রয়োজন হলে সমগ্র ইসলামী সাম্রাজ্যকে বন্ধক রাখতেও আমি কুণ্ঠাবোধ করতাম না।'

আপাতত ক্যাম্পেই তাদের উন্নত থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন সুলতান। এদের বিস্তারিত ইতিবৃত্ত শুনবার মত এখন সময় নেই তাঁর। বাইরের পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে আগে।

বাইরে লড়াই চলছে এখনো। সুলতান আইউবীর কৌশলের ফাঁদে ধরা খেয়ে তাঁকে প্রতিহত করার জন্য যেসব খৃষ্টান সৈন্য কার্ক ও শোবকের বাইরে অবস্থান নিয়েছিল, মুসলিম বাহিনীর কমান্ডো আক্রমণে দিগ্বিদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে তারা এখন পিছনে সরে আসতে শুরু করেছে। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর কমান্ডো হামলা থামছে না তবু। ধাওয়া করে করে চরমভাবে বিপর্যস্ত করে তুলছে তারা খৃষ্টানদের।

কোন কোন অভিযানে মুসলিম বাহিনী খৃষ্টান বাহিনীর হাতে ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হচ্ছে বলেও সংবাদ পান আইউবী। তাছাড়া কার্ক দুর্গে অবস্থানরত খৃষ্টান বাহিনী তাদের মরুভূমির বিপর্যস্ত সৈনিকদের সাহায্যে এগিয়ে যেতে পারে বলেও আশংকা জাগে তাঁর মনে।

ভাবনায় পড়ে যান সুলতান আইউবী। এ পরিস্থিতি সামাল দেয়ার মত সৈন্য তার নেই। মিসর থেকে রিজার্ভ বাহিনীও তলব করতে চাইছেন না তিনি। কারণ, সেখানকার পরিস্থিতিও অনুকূল নয়। বিলুপ্ত ফাতেমী খেলাফতের ধ্বজাধারীরা গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সুদানী কাফ্রীরা স্বতন্ত্র শক্তি সঞ্চয় করছে। এ দুই বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে সাহায্য দিয়ে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ করছে ক্রুসেডাররা। সর্বোপরি কতক রাজনৈতিক ও সামরিক মুসলিম কর্মকর্তাও পর্দার আড়ালে থেকে আইউবী

বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত। ক্ষমতার লোভে ইসলামের দুশমনদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে নির্বোধ এই ঈমান-বিক্রেতাদের দল। সুলতান আইউবীকে একাধিকবার হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল যারা, তাদের সঙ্গে এখন এদের গলায় গলায় ভাব।

বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে বেশ কিছু মুসলমানকে মৃত্যুদন্ডও দিয়েছেন সুলতান। কিন্তু একে তিনি খৃষ্টানদের-ই সাফল্য বলে মনে করছেন। তাঁর মতে যাদের তিনি মৃত্যুদন্ড দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে তারা ঈমান বিক্রয়কারী গাদ্দার। কিন্তু ছিল তো তারা কালেমা-গো মুসলমান। এ প্রসঙ্গ তুলে সুলতান আইউবী বহুবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'হায়! এরা যদি শত্রু-মিত্র চিনতে পারত!'

শোবক দুর্গ এখন সুলতান আইউবীর পদানত। দুর্গের পাঁচিলে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। সঙ্গে তাঁর সামরিক উপদেষ্টাবৃন্দ। সুলতান দেখতে পান, শহরের মুসলিম অধিবাসীরা দলে দলে উল্লাস করছে। আল্লাহু আকবার তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলছে তারা। আনন্দচিত্তে এগিয়ে আসছে দুর্গের দিকে। পাশাপাশি উটের পিঠে করে শহীদদের লাশ ও আহত সৈন্যদেরকে নিয়ে আসা হচ্ছে। একদিকে বিজয়ী জনতার উল্লাস। অপরদিকে ইসলাম ও মুসলমানের বিজয়ের জন্য জীবন দানকারী শহীদদের লাশ! গভীর ভাবনায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেন সুলতান।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর একান্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন–

'কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবীর চেহারায় বিজয়ের কোন প্রতিক্রিয়া-ই দেখা গেল না। শোবকের উল্লসিত মুসলমানরা দফ্ ও শানাইয়ের তালে তালে নেচে-গেয়ে পাঁচিলের সামনে এসে থামে। সালাহুদ্দীন আইউবী একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন তাদের প্রতি। তাঁকে এক নজর দেখতে পেয়ে জনতা পাগলের মত লাফাতে শুরু করে। কিন্তু সুলতানের ঠোঁটে একটু হাসি নেই। তিনি হাত নেড়ে জনতাকে অভিনন্দন পর্যন্ত জানালেন না। অপলক নেত্রে জনতার প্রতি তাকিয়েই আছেন শুধু। হঠাৎ জনতার মধ্য থেকে উচ্চস্বরে একজন বলে উঠল, 'নাজমুদ্দীন আইউবের পুত্র সালাহুদ্দীন আইউবী! তুমি আমাদের মুক্তিদূত। তুমি শোবকের মুসলমানদের জন্য পয়গম্বর হয়ে এসেছ।'

'আমরা তোমাকে সেজদা করি।' জনতার মধ্য থেকে গগণবিদারী তাবকীর ধ্বনি তুলে বলল আরেকজন।

এবার নিজেকে খুঁজে পান সুলতান। চৈতন্য ফিরে আসে তাঁর। জনতার মন্তব্যে কেঁপে উঠে তাঁর সমস্ত শরীর। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– 'আমার পাপের বোঝা ভারি করতে ওদের নিষেধ কর। আমি পয়গম্বর নই– পয়গম্বরদের একজন দাসানুদাস মাত্র। আর সেজদার উপযুক্ত তো একমাত্র আল্লাহ।'

আমি সুলতানের এক রক্ষীকে বললাম, জল্দি যাও, জনতাকে এসব শ্লোগান বন্ধ করতে বল। বল, সুলতান এতে অসন্তুষ্ট হচ্ছেন।

রক্ষী যেতে উদ্যত হয়। সুলতান তাকে থামিয়ে বললেন, বলবে শান্তভাবে। যেন ওরা মনে কষ্ট না পায়। ওদের আনন্দ-উল্লাসে ব্যাঘাত কর না। ওরা যে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করেছে! আমার জীবন ওদের আনন্দের জন্য উৎসর্গিত।'

আর বলতে পারলেন না সুলতান। আবেগের আতিশয্যে রুদ্ধ হয়ে আসে তাঁর কণ্ঠ। মুখ ফিরিয়ে নেন অন্যদিকে। চোখের কোনে উদগত অশ্রু লুকাবার চেষ্টা করেন তিনি। আবার আমাদের প্রতি তাকান। বলেন, 'আমরা সবেমাত্র ফিলিস্তীনের আঙ্গিনায় এসে পৌঁছেছি। যেতে হবে অনেক দূর। রোম উপসাগর যেখান থেকে পশ্চিমে মোড় নিয়েছে, উত্তরদিকে আমাদের যেতে হবে সে পর্যন্ত। আরব ভূমি থেকে সর্বশেষ ক্রুসেডারটিকেও ধাক্কা দিয়ে রোম উপসাগরে নিক্ষেপ করে ডুবিয়ে মেরেই তবে আমরা ক্ষান্ত হব।'

সুলতান আইউবী নায়েবদের নির্দেশ দেন যে, 'শহরময় ঘোষণা করিয়ে দাও, কোন অমুসলিম নাগরিক যেন এই ভয়ে শহর ছেড়ে না পালায় যে, মুসলমানরা তাদের উত্যক্ত করবে। কোন মুসলিম ফৌজি কিংবা কোন সাধারণ মুসলমানের আচরণে যদি কোন অমুসলিম নাগরিক কষ্ট পায়, তবে সে যেন দুর্গের দ্বারে এসে অভিযোগ করে। প্রতিকার পাবে।'

অত্যন্ত জোরালো ভাষায় সুলতান ঘোষণা করলেন–

'মানুষের জন্য আমরা অশান্তির বার্তা নিয়ে আসিনি। আমরা এসেছি ভালবাসার পয়গাম নিয়ে। তবে যদি কেউ ইসলামী হুকুমতের বিরুদ্ধে কোন উক্তি করে কিংবা যদি কেউ ইসলাম বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হয়, তবে মুসলিম হোক, অমুসলিম হোক, এর কঠোর শাস্তি তাকে ভোগ করতেই হবে। ইসলামী বিধান মেনে চলতে হবে দেশের সব নাগরিককে।'

সুলতান আরো আদেশ জারি করেন, 'নগরীর কোথাও যদি কোন খৃষ্টান ফৌজি কিংবা গুপ্তচর লুকিয়ে থাকে, সে যেন এক্ষুণি মুসলিম বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।'

দেয়াল ভেঙ্গে দুর্গে প্রবেশ করার পর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আইউবীর বাহিনী সর্বাগ্রে খৃষ্টানদের গোয়েন্দা সদর দফতরে তল্লাশী চালায়। কিন্তু পাওয়া গেল না গুরুত্বপূর্ণ কিছুই। আক্রান্ত হওয়ার পর চতুর খৃষ্টানরা সর্বাগ্রে এ অফিসটি খালি করে ফেলে। সরিয়ে ফেলে দফতরের জরুরী কাগজপত্র। পালিয়ে যায় গোয়েন্দা প্রধান হরমুন ও তার সহকর্মীরা।

তবে ধরা পড়ে যায় আটটি মেয়ে। তাদের তুলে দেয়া হয় আলী বিন

সুফিয়ানের হাতে। তিনি তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। তারা জানায়, অন্তত বিশটি মেয়ে এখান থেকে পালিয়ে গেছে। যে ক'জন পুরুষ গোয়েন্দা ছিল, তারাও পলায়ন করেছে। এদের একজন জানায়, আমার এক সহকর্মী মেয়ে ছিল। নাম তার লুজিনা। হাদীদ নামক এক আহত মুসলিম ফৌজিকে পালাতে সাহায্য করার পর সে বিষপানে আত্মহত্যা করেছে।

বিশৃংখলা দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার তৎপরতা চলছে শোবকে। অন্যদিকে কার্কে প্রস্তুত হচ্ছে শোবককে আইউবীর হাত থেকে মুক্ত করার পরিকল্পনা। আলোচনায় বসেছে তারা। কি হতে কি কি হয়ে গেল এই ভেবে স্তম্ভিত সবাই। আলেম গোয়েন্দার নিকট থেকে তারা নিশ্চিত রিপোর্ট পেয়েছিল যে, সুলতান আইউবী কার্ক আক্রমণ করবেন, কার্ক অভিমুখে এগিয়ে আসছে তাঁর বাহিনী। কায়রোর গুপ্তচরদের মারফতও একের পর এক তারা এ রিপোর্ট-ই পেয়েছিলেন যে, আইউবী কার্ক আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অভিযানের কমান্ডে থাকবেন সুলতান নিজে। কিন্তু মাঝপথে সৈন্যরা কার্কের পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে। তারা এমন এমন কৌশল অবলম্বন করে যে, তাদের প্রতিহত করার জন্য প্রেরিত খৃষ্টান বাহিনী তাদের কমান্ডো বাহিনীর হাতে বিপর্যস্ত হতে শুরু করে। সুলতান আইউবী আক্রমণ করে দখল করে নেন শোবকের মত শক্তিশালী দুর্গ। বিষয়টি এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয় সকলের মনে।

এর জন্য অভিযুক্ত করা হয় আইউবীর বন্দীদশা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত আলেম গোয়েন্দাকে। তার প্রদত্ত ভুল তথ্য-ই খৃষ্টানদের শোচনীয় পরিণতির জন্য দায়ী বলে সকলের অভিমত।

হাতকড়া পরিয়ে কনফারেন্সে হাজির করা হল তাকে। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করে গোয়েন্দা। আইউবীর মুখ থেকে এ তথ্য সে কিভাবে পেয়েছিল, পুনরায় তা বিবৃত করে সকলের সামনে। অবশেষে বলল, আমার দেয়া তথ্যে সন্দেহ থাকলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ সে অনুযায়ী কাজ না করলেই পারত! আমার রিপোর্ট গ্রাহ্য না করলেই তো আর এ বিপর্যয় ঘটত না!

প্রশ্ন আসে গোয়েন্দা প্রধান হরমুনের উপর। 'এত বড় বিচক্ষণ গুপ্তচর হওয়া সত্ত্বেও চোখ বুজে আপনি এ রিপোর্ট মেনে নিলেন কেন? কি করেইবা বুঝলেন যে, রিপোর্টটি সঠিক?' জানতে চায় এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

'এ প্রসঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। সংগত কারণেই আমি এ দাবি করতে পারি যে, গুপ্তচরবৃত্তিতে আমি বিচক্ষণ। কিন্তু ইতিপূর্বে আমার বিচক্ষণতা ও আমার গোয়েন্দাদের শ্রম ও কোরবানীকে বহুবার অগ্রাহ্য করা হয়েছে। ফলে আমার যোগ্যতা

বলি হয়ে গেছে সামরিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নির্দেশের যূপকাষ্ঠে। এখানে উপস্থিত আছেন তিনজন রাষ্ট্রনায়ক। আছেন তাদের সম্মিলিত কমান্ডের উচ্চপদস্থ এক কমাণ্ডারও। অবিশ্বাস্য শোচনীয় এক পরাজয়ে বিপর্যস্ত আমরা। শোবকের মত শক্ত দুর্গ আমাদের হাতছাড়া। আমাদের মাইলের পর মাইল বিশাল-বিস্তৃত এলাকা এখন মুসলমানদের কব্জায়। আমাদের বছরের রসদ-পাতি ও মূল্যবান জিনিসপত্র এখন দুশমনের হাতে। শোবকের জনগণ এখন মুসলমানদের গোলাম। এর জন্য দায়ী কে? বে-আদবী মাফ করলে আমি আপনাদের প্রত্যেককে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমরা শপথ করেছিলাম, ক্রুশের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য আমরা আমাদের জীবন উৎসর্গ করব। ব্যক্তিগত মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে হলেও ক্রুশের মর্যাদা রক্ষা করে সেই অঙ্গীকার পালন করে চলা উচিত আমাদের সকলের। এবার অনুমতি হলে আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই।'

গোয়েন্দা প্রধান হরমুন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশীল লোক। কনরাড, গাই লে অফ লুজিনান এবং ফিলিপ অগাস্টাস-এর ন্যায় রাষ্ট্রনায়কগণও তার মতের বিরুদ্ধাচারণ করার সাহস পান না। গোয়েন্দা বিভাগের সকল নিয়ন্ত্রণ ও সর্বময় ক্ষমতা তার হাতে। একজন খৃষ্টান রাষ্ট্রনায়ককেও গুপ্তভাবে হত্যা করার মত ব্যবস্থা, সাহস ও যোগ্যতা তার আছে। তাকে সমীহ করে চলে সকলে। প্রশ্ন করার অনুমতি পান তিনি। পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে কক্ষজুড়ে। হরমুনের মুখের প্রতি সকলের দৃষ্টি। প্রশ্ন করেন হরমুন–

'দুশমনের গোপন তথ্য সংগ্রহ এবং চরিত্র ধ্বংসের জন্য আমরা মেয়েদের উপর নির্ভরশীল কেন?'

'কারণ, নারীর প্রতি মানুষ সবচেয়ে বেশী দুর্বল। চরিত্র ধ্বংসের জন্য নারী শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। নারীর হাড্ডি-মাংসের এই দেহের মাধ্যমে হোক কিংবা সাহিত্যের মাধ্যমে নারীর রূপ-সৌন্দর্য, দেহ-সৌষ্ঠব ও আকর্ষণের কথা ফুটিয়ে তুলে হোক, মানুষের চারিত্রিক পদস্খলনে নারীর বিকল্প নেই।

তুমি কি একথা অস্বীকার করতে পারবে যে, আরবের বহু আমীর-উজীরকে নারীর হাতে আমরা আমাদের গোলামে পরিণত করেছি?' বললেন এক সম্রাট।

'কিন্তু বর্তমানে মুসলমানদের শাসন-ক্ষমতা যে আমীর-উজীরদের নয়– সেনাবাহিনীর হাতে। খলীফার শাসন মানছে না এখন মুসলমানরা। সামরিক ক্ষেত্রে খলীফাদের দখল বলতে নেই। সালাহুদ্দীন আইউবী মিসরের একজন গভর্নর মাত্র। কিন্তু রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা তার হাতে। মিসরের খলীফাকে তিনি ক্ষমতাচ্যুৎ করেছেন। এদিকে আছেন নুরুদ্দীন জঙ্গী। তিনি একজন সেনাপতি ও মন্ত্রী। সামরিক ক্ষেত্রে বাগদাদের খলীফার আদেশ-অনুমতির তোয়াক্কা করতে হয় না তাঁকেও।

এমতাবস্থায় ক'জন আমীর-উজীরকে হাত করলে মুসলমানদের মধে বড়জোর গাদ্দারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। দেশের এক ইঞ্চি জমিও ওরা আপনাকে দিতে পারবে না। ইসলামী সাম্রাজ্যের আসল রাষ্ট্রনায়ক এখন সেনাবাহিনী। সুলতান আইউবী ও নুরুদ্দীন জঙ্গী তাদের সেনাবাহিনীকে এমন প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলেছেন যে, মেয়ে দিয়ে তাদের সৈন্যদের চরিত্র আপনি নষ্ট করতে পারবেন না, পারেনওনি।

মুসলিম সৈন্যদের জন্য মদপান জঘন্য অপরাধ। ইসলামে যে কারো জন্য মদপান করা হারাম। এ কঠোর পাবন্দির কারণে সামরিক-বেসামরিক কোন মুসলমান-ই চৈতন্য হারায় না কখনো। হুঁশ-জ্ঞান ঠিক রেখে চলতে পারে তারা সবসময়। সালাহুদ্দীন আইউবী যদি মদপানে অভ্যস্ত হতেন, তাহলে আজ মিসর হত আমাদের আর সালাহুদ্দীন আইউবী শোবক দুর্গের বিজয়ী নয়– হতেন এই দুর্গে আমাদের বন্দী।' বললেন হরমুন।

'হরমুন! মুসলমানদের প্রশংসা শোনবার সময় আমাদের নেই। মেয়ে সম্পর্কে কি বলছিলে, তা-ই বল।' বলল এক কমান্ডার।

মূল প্রসংগে ফিরে যান হরমুন। বললেন–

'আমি বলতে চেয়েছিলাম, গুপ্তচরবৃত্তির জন্য আমাদের নারী ব্যবহারের কৌশল ব্যর্থ হয়েছে। গত দু' বছরে অতি মূল্যবান মেয়েগুলোকে মিসর পাঠিয়ে আমরা মুসলিম সৈন্যদের হাতে তাদের খুন করিয়েছি। নারী হল আবেগপ্রবণ জাতি। মেয়েদেরকে আমরা যত কড়া প্রশিক্ষণ দেই না কেন, তারা পুরুষদের মত পাথর হতে পারে না। আমরা তাদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ব্যবহার করি। কিন্তু কোমল-হৃদয়ের কারণে তারা অনেক সময় পরিস্থিতির কাছে নতি স্বীকার করে। ফল আসে বিপরীত। মেয়েরা ধরা পড়ে শত্রুর হাতে।

মুসলিম সৈন্যরা তাদের উপভোগ না করে সসম্মানে আশ্রয় দেয়। পরনারীর দেহকে তারা হারাম মনে করে। ওদের চরিত্র দেখে আমাদের মেয়েরা প্রভাবিত হয়ে পড়ে; দুর্বল হয়ে পড়ে ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি। এই তো সম্প্রতি আইউবীর এক কমান্ডার একদল দস্যুর সঙ্গে লড়াই করে আমাদের এক মেয়ের জীবন ও সম্ভ্রম রক্ষা করেছে। গুরুতর আহত হয়েছে নিজে। মেয়েটি তাকে সঙ্গে করে শোবকে নিয়ে আসে। আমরা তাকে বেগার ক্যাম্পে ফেলে আসি। কিন্তু মেয়েটি এক সেনা অফিসারের সামরিক উর্দি চুরি করে তাকে পরিয়ে নিজের ঘোড়ায় করে পার করে দিয়েছে। আমি মেয়েটিকে ধরে ফেলি। কিন্তু বিষপান করে আত্মহত্যা করেছে ও।

তার ভাষ্যমতে আত্মহত্যা সে শাস্তির ভয়ে করেনি। মুসলিম ফৌজির আদর্শ দেখে, তার সংস্পর্শে গিয়ে তার উপলব্ধি আসে যে, সে পাপী এবং নিজের দেহকে প্রতারণার ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করছে। এ অনুভূতি তার এত তীব্র ছিল যে, শেষ পর্যন্ত মেয়েটি আত্মহত্যার পথ বেছে নিল।

আমাদের বেশীর ভাগ গোয়েন্দা মেয়ে-ই এমন যে, শৈশবে তাদেরকে বাবা-মার কোল কিংবা মুসলমানদের বিভিন্ন কাফেলা থেকে অপহরণ করে এনেছিলাম। এখন তারা যুবতী। নিজেদের শৈশব এবং মূল পরিচয় তারা ভুলে গেছে। তারা যে মুসলিম পিতা-মাতার কন্যা, এখন সে কথা তাদের মনেও নেই। আমরা তাদের নাম পরিবর্তন করেছি। পাল্টে দিয়েছি তাদের ধর্ম, তাদের চরিত্র। ছিল মুসলমান, এখন তারা রীতিমত খৃষ্টান।

কিন্তু আমরা তাদের রক্ত পরিবর্তন করতে পারিনি। আমি মানুষের সাইকোলজি বুঝি। মুসলমানদের সাইকোলজি অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের থেকে ভিন্ন। এটা আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা। আমাদের এই মেয়েরা যখন কোন মুসলমানের মুখপানে তাকায়, তখন হঠাৎ করে তাদের যেন মনে পড়ে যায়, তাদের ধমনীতেও মুসলিম পিতার রক্ত বইছে। অনেক কিছুই করা যায়, কিন্তু মুসলমানের রক্ত থেকে তার ধর্মকে মুক্ত করা যায় না।"

'তার মানে কোন মেয়েকে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য না পাঠান হোক, এ-ই কি তোমার পরামর্শ?' জিজ্ঞেস করে এক কমান্ডার।

'না। বরং আমার বক্তব্য হল, এমন মেয়েদের গুপ্তচরবৃত্তিতে নিযুক্ত করা না হোক, যাদের জন্ম মুসলমানের ঘরে। তবে আমার বিভাগ থেকে যদি আপনারা মেয়েদের একেবারেই সরিয়ে দেন, তাতে ক্রুশের জন্য ভালোই হবে বলে আমি মনে করি। মুসলিম আমীরদের হেরেমে নারী ঢুকিয়ে আপনারা তাদেরকে ফাঁদে ফেলতে পারছেন। রূপসী নারীর ছলনার শিকার হয়ে অনায়াসে চলে আসছে তারা আপনাদের হাতে। কিন্তু কেন? কারণ, তারা যুদ্ধের ময়দান দেখেনি। আমাদের তরবারীর সঙ্গে তাদের তরবারীর সংঘাত হয়নি। আমাদের আসল রূপের সাথে তারা পরিচিত নয়। আমাদেরকে চিনে তাদের সেনাবাহিনী। যুদ্ধের ময়দানে যাদের রক্ত ঝরে, তারাই জানে, কে তাদের শত্রু, আর কে মিত্র। এ কারণে সেনাবাহিনীর বেলায় আমাদের রূপসী নারীদের ছলনা কোন কাজেই আসে না।' বললেন গোয়েন্দা প্রধান হরমুন।

ফিলিপ অগাস্টাস বড় শয়তান প্রকৃতির মানুষ। ইসলামের শত্রুতাকে তিনি ইবাদত মনে করেন। তিনি বললেন–

'দৃষ্টি তোমার সীমাবদ্ধ হরমুন! তুমি দেখছ শুধু সালাহুদ্দীন আইউবী আর নুরুদ্দীন জঙ্গীকে। আমাদের দৃষ্টি ইসলামের উপর। আমরা ইসলামের মূল উপড়ে ফেলতে চাই। তজ্জন্য মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংস করা এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় সংশয় সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন। রঙ্গিন সংস্কৃতি ঢুকিয়ে দাও মুসলমানদের মধ্যে। আমাদের লক্ষ্য আমাদের জীবদ্দশায়-ই যে অর্জিত হতে হবে এমন নয়। এ কাজ আমরা অর্পণ করে যাব পরবর্তী প্রজন্মের উপর। তারা কিছু সাফল্য অর্জন করবে।

তারপর পুরুষানুক্রমে চলতে থাকবে এ ধারা। তারপর একটি যুগ এমন আসবে যে, তখন ইসলামের নাম-নিশানাও থাকবে না। থাকলেও তার আর কোন সালাহুদ্দীন আইউবী, নুরুদ্দীন জঙ্গী জন্ম দেয়ার ক্ষমতা থাকবে না। সেদিন মুসলমানরা ইসলাম মনে করে যে ধর্ম পালন করবে, আমাদের-ই সভ্যতা-সংস্কৃতির রঙে রঙিন হবে তা। একশত বছর পরের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দাও হরমুন! জয়-পরাজয় একটি সাময়িক ঘটনা। শোবক দুর্গ আবার আমাদের দখলে আসবে। তুমি মিসরে ষড়যন্ত্রের জাল আরো শক্ত কর। ফাতেমী ও সুদানী সৈন্যদেরকে মদদ দিয়ে যাও। হাশীশীদের কাজে লাগাও।'

❁ ❁ ❁

সভাকক্ষে প্রবেশ করে এক খৃষ্টান অফিসার। লোকটি অতিশয় ক্লান্ত। মুসলিম বাহিনীর প্রতিরোধে পাঠানো একটি দলের কমান্ডার সে। বড় উদ্বিগ্ন বলে মনে হল তাকে। কক্ষে প্রবেশ করেই মলিন মুখে সে বলল–

'বাহিনীর অবস্থা ভাল নয়। আমি আপনাদের কাছে একটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। কার্কে আমাদের যত সৈন্য আছে, কিছু রিজার্ভ সৈন্য যোগ করে তাদের দিয়ে শোবক আক্রমণ করা হোক। মুখোমুখি এসে লড়াই করতে বাধ্য করা হোক মুসলমানদের।

বর্তমানে যুদ্ধের অবস্থা হল, কেন্দ্রীয় কমান্ডের নির্দেশমত আমাদের বাহিনী কার্কের দিকে পিছিয়ে যাচ্ছে। রাতের অন্ধকারে বাহিনীর পিছন অংশের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে উধাও হয়ে যায় আইউবীর কমান্ডো বাহিনীর গুটি কতক সৈন্য। দিনের বেলা তাদের তীরান্দাজ বাহিনী দু' চারটি তীর ছুঁড়ে আমাদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে হাওয়া হয়ে যায়। টার্গেট করে তারা আমাদের ঘোড়া ও উটগুলোকে। আঘাতপ্রাপ্ত জানোয়ারগুলো তুলকালামকান্ড ঘটিয়ে দেয়। দেখাদেখি সমস্ত উট-ঘোড়া দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করতে শুরু করে। চলে যায় আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কয়েকটি বাহিনীকে সমবেত করে পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু মুসলমানরা সামনাসামনি আসছে না। উল্টো নিজেদের পছন্দমত ময়দানে নিয়ে গিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত করিয়ে আমাদের কয়েকটি বাহিনীকে শেষ করে দিয়েছে। আমাদের সৈনিকরা যুদ্ধ করার মনোবল হারিয়ে ফেলেছে। এ মনোবল ফিরিয়ে আনতে হলে প্রয়োজন একটি তীব্র পাল্টা আক্রমণ।'

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল।

এ মুহূর্তে খৃষ্টানদের প্রধান সমস্যা হল, তাদের সিংহভাগ সৈন্য– যারা তাদের শ্রেষ্ঠ লড়াকু– কার্ক থেকে বহুদূরে বিস্তীর্ণ বালুকাময় মরু অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। তারা মুসলিম বাহিনীর হাতের ক্রীড়নক হয়ে আছে। সুলতান আইউবীর পরিকল্পনাকে অতীব সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করে চলেছে তাঁর কমান্ডাররা। তারা পার্বত্য

এলাকায় ওঁৎ পেতে লুকিয়ে থাকে। দিনের বেলা যখন তীব্র বাতাস বইতে শুরু করে, তখন যেদিক থেকে বাতাস বইছে, সেদিক থেকে আক্রমণ করছে। এতে বাতাস এবং ঘোড়ার পায়ের উড়ানো বালুকারাশি পড়ছে গিয়ে খৃষ্টান বাহিনীর চোখে-মুখে। চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ে যাচ্ছে তারা।

আইউবীর সৈন্যসংখ্যা নগণ্য; প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, 'সে সময়ে খৃষ্টানরা শোবক আক্রমণ করে বসলে সুলতান আইউবীর উপায় ছিল না। সৈন্যের অভাবে অধিকৃত এ দুর্গকে তিনি ধরে রাখতে পারতেন না। কিন্তু তিনি অতি কৌশলে খৃষ্টানদের উপর নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিলেন।

শোবকের উত্তর-পূর্বে প্রেরিত বিপুল খৃষ্টান সেনা বেকার বসে আছে। পাছে নুরুদ্দীন জঙ্গী আইউবীর সাহায্যে ফোর্স প্রেরণ করে বসেন কিনা এ আশংকায় তাদেরও ফিরিয়ে আনতে পারছে না খৃষ্টানরা।

কার্ক দুর্গে কপালে হাত ঠেকিয়ে হিম্‌শিম বসে আছে খৃষ্টান রাষ্ট্রনায়ক ও কমান্ডাররা। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না কেউ। কোন সিদ্ধান্ত আসছে না কারুর মাথায়। অন্যদিকে শোবকে বসে ব্যাকুলচিত্তে সুলতান আইউবীও ভাবছেন, খৃষ্টানরা যদি শোবক আক্রমণ করেই বসে, তবে তা ঠেকাবেন তিনি কিভাবে!

কার্ক থেকে খৃষ্টানদের তথ্য সংগ্রহ করছে আইউবীর গোয়েন্দারা। খৃষ্টানদের ছদ্মবেশে কার্কে ঢুকে পড়েছে তারা। উন্নত ব্যবস্থাপনায় প্রতিনিয়ত রিপোর্ট পাচ্ছেন সুলতান।

শোবক ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে লোক সংগ্রহ করে সেনাবাহিনীতে ভর্তি শুরু করে দেন সুলতান আইউবী। এক্ষুণি ট্রেনিং শুরু করতে আদেশ দেন তিনি। উট-ঘোড়ার অভাবে নেই। খৃষ্টানরা পালাবার সময় অনেক উট-ঘোড়া ফেলে গিয়েছিল দুর্গে।

বাইরের বাহিনীগুলোর প্রতি নির্দেশ পাঠান, এখন থেকে যেন তারা দুশমনের পশুগুলোকে না মেরে ধরে দুর্গে পাঠাতে থাকে।

নতুন ভর্তিহওয়া সৈনিকদের কমান্ডো ও ঝটিকা আক্রমণ পরিচালনার প্রশিক্ষণ দেয়ার নির্দেশ দেন সুলতান আইউবী।

গুপ্তচরবৃত্তিতে নারী ব্যবহার না করা সংক্রান্ত হরমুনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয় কার্কের কনফারেন্সে। অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় আলেম গোয়েন্দাকে। মুসলমানদের চিন্তা-চেতনায় আক্রমণ করার জন্য লোক তৈরি করার নির্দেশ দেয়া হয় তাকে।

শোবক দুর্গ থেকে ক'জন গোয়েন্দা মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। নিরাপদে পালিয়ে যায় ক'জন। নিখোঁজ রয়েছে কিছু। পুরুষদেরও কয়েকজন ধরা পড়ে যায় মুসলমানদের হাতে। বেশ কিছু আত্মগোপন করে আছে শোবকেই। কনফারেন্সে এ তথ্য প্রকাশ করেন গোয়েন্দাপ্রধান হরমুন। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। আত্মগোপন করে থাকা গোয়েন্দাদের প্রতি আপাতত সেভাবেই থাকতে নির্দেশ পাঠান হয়।

এক সম্রাট বললেন, বন্দী মেয়েদের সহজে বের করে আনা সম্ভব হবে না বোধ হয়। তবে নিখোঁজ মেয়েরা ওখানকার কোন খৃষ্টানের ঘরে আত্মগোপন করেছে। তাদেরকে খুঁজে বের করে আনা আবশ্যক।

আলোচনার পর সুলতান আইউবীর কমান্ডো বাহিনীর সৈনিকদের ন্যায় একটি জানবাজ বাহিনী গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয় খৃষ্টানরা। বিচক্ষণ ও দূরদর্শী হতে হবে এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্য। আরবী কিংবা মিসরী ভাষা জানা থাকতে হবে প্রত্যেকের। মুসলিম বেশে শোবক যাবে তারা। গিয়ে বলবে, খৃষ্টানদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমরা কার্ক থেকে পালিয়ে এসেছি। শোবকে আটকেপড়া গোয়েন্দা মেয়েদের খুঁজে বের করে নিয়ে আসা হবে তাদের দায়িত্ব।

বিভিন্ন জেল থেকে যেসব কয়েদীকে তাদের ইচ্ছায় সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হয়েছিল, এ বাহিনীতে আনতে হবে তাদেরকে। যারা শোবকে ছিল এবং শোবকের অলিগলি যাদের পরিচিত।

প্রখ্যাত ইতিহাস লেখক উইলিয়াম অফ টায়ার শোবক বিজয়ের পর্যালোচনা করতে গিয়ে খৃষ্টানদের সমালোচনা করে বলেছেন–

'খৃষ্টানরা সুন্দরী মেয়েদের দ্বারা মুসলমানদের দেশে গুপ্তচরবৃত্তি, নাশকতা ও মুসলমানের চরিত্র ধ্বংস করার প্রতি বেশী মনোযোগী ছিল। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাদের চরিত্রটা ছিল কত নোংরা। তারা মুসলমানদের কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাকে হাত করতে সক্ষম হয়েছিল ঠিক; কিন্তু কোন জাতি এবং তার সেনা বাহিনীর জাতীয় চেতনাকে ধ্বংস করা যে সহজ নয়, তা তারা বুঝে উঠতে পারেনি। তাদের রূপসী মেয়েদের অপহরণ করে, বিজিত অঞ্চলসমূহে ব্যাপকহারে নারীর সম্ভ্রমহানী ও গণহত্যা চালিয়ে, সর্বোপরি নিরপরাধ মুসলমানদেরকে ধরে ধরে বেগার ক্যাম্পে নিক্ষেপ করে খৃষ্টানরা মুসলমানদের ক্ষতি করতে চেয়েছিল। কিন্তু ফল হয়েছে বিপরীত। এসব ঘটনা উল্টো মুসলমানদের জাগিয়ে তুলেছিল। প্রতিশোধ-স্পৃহায় তারা আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। কোনভাবেই খৃষ্টানরা তখন মুসলমানদের জাতীয় ও সামরিক চেতনাকে ক্ষুণ্ন করতে পারেনি। মুসলমানের সারিতে কয়েকজন গাদ্দার তৈরি করে ইসলামের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা যায় না কখনো।'

ঐতিহাসিকগণ আরো লিখেছেন–

'যখন খৃষ্টানদের শোবক আক্রমণ করা ছিল একান্ত প্রয়োজন, যখন সুলতান আইউবী ছিলেন সামরিক শক্তিতে দুর্বল, তখন কিনা খৃষ্টানরা শোবক থেকে কয়েকটি মেয়েকে মুক্ত করার চিন্তায় ছিল বিভোর। সালাহুদ্দীন আইউবীর সামরিক দূরদর্শিতার প্রশংসা না করে পারা যায় না। সমরশক্তিতে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তিনি খৃষ্টানদের মনে আতংক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কৌশলের মারপ্যাচে আটকিয়ে তিনি খৃষ্টান বাহিনীকে এদিক-সেদিক বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিলেন। ফলে তারা বড় ধরনের কোন অভিযান পরিচালনার সাহস-ই হারিয়ে ফেলেছিল। তাছাড়া মুসলিম বাহিনী ছিল দেশ-প্রেম ও ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়েও যুদ্ধ থেকে পিছপা হয়নি তারা কখনো।

কিন্তু খৃষ্টান বাহিনী ছিল এ চেতনা থেকে বঞ্চিত। তারা যখন তাদের কমান্ডারদের পিছপা হতে দেখল, সঙ্গে সঙ্গে তাদের যুদ্ধ করার মনোবল হারিয়ে গেল। সাহস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে আইউবীর বাহিনীকে বিপর্যস্ত করা খৃষ্টানদের পক্ষে কঠিন ছিল না। কিন্তু তখন তারা গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযান বাদ দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।'

সে কালের খৃষ্টান ঐতিহাসিকদের সুর টেনে দু'তিনজন ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, 'সালাহুদ্দীন আইউবী লাগাতার দু'টি বছর শোবক অবরোধ করে রেখে অবশেষে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। সালাহুদ্দীন আইউবী ও নুরুদ্দীন জঙ্গীর মধ্যে একটি ভুল বুঝাবুঝি তার কারণ। জঙ্গীর উপদেষ্টাগণ তাঁকে তথ্য দেয় যে, সালাহুদ্দীন আইউবী মিসরকে নিজের একচ্ছত্র অধিকারে রেখে ফিলিস্তীনেরও একক রাষ্ট্রনায়ক হতে চাইছেন। তাঁর পরিকল্পনা, ফিলিস্তীন কব্জা করে তিনি জঙ্গীকে ক্ষমতাচ্যুত করবেন।'

ঐতিহাসিক লিখেছেন– 'এ তথ্য পেয়ে নুরুদ্দীন জঙ্গী শোবক অভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য, শোবকের সামরিক ক্ষমতা হাতে নেয়া। আইউবীর সহযোগিতার নাম করে জঙ্গীর বাহিনী শোবক এসে পৌঁছে। কিন্তু আইউবী তাদের গোপন পরিকল্পনার কথা টের পেয়ে যান। গোয়েন্দা মারফত এ তথ্য পেয়ে সুলতান আইউবী মনে প্রচন্ড আঘাত পান এবং অবরোধ তুলে নিয়ে ভগ্নহৃদয়ে মিসর ফিরে যান।'

তবে খৃষ্টানরা নুরুদ্দীন জঙ্গীকে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে উস্কে দেয়ার অপচেষ্টা করেনি যে, তা নয়। সুলতান আইউবীর পিতাও সে অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।

আইউবীর পিতা নাজমুদ্দীন আইউব দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে হঠাৎ একদিন শোবক এসে হাজির হন। হঠাৎ পিতাকে দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে পড়েন। ভাবলেন, তিনি হয়ত পুত্রকে বিজয়ের মোবারকবাদ দিতে-ই এসেছেন।

পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎ হল। সুলতান বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সালাম-মোসাফাহা

করলেন। কিন্তু নাজমুদ্দীন আইউব কোন ভূমিকা ছাড়াই অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'যে নুরুদ্দীন জঙ্গী আমার ন্যায় অখ্যাত-অপরিচিত ব্যক্তির পুত্রকে মিসরের রাষ্ট্রনায়ক বানালেন, সে কি অজ্ঞ? 'তোমার পুত্র ব্যক্তিগত ক্ষমতার মোহে ইসলামী সাম্রাজ্যের অতন্দ্র প্রহরী নুরুদ্দীন জঙ্গীর দুশমন হয়ে গেছে' এ কথাটাও শুনতে হল আমাকে! যাও, নুরুদ্দীন জঙ্গীর পায়ে পড়ে ক্ষমা নিয়ে আস।'

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হল। ভুল ভাঙ্গল নাজমুদ্দীন আইউবের। স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এটি খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচারের-ই ফল।

সুলতান আইউবী তাঁর বিশেষ দূত ও বিখ্যাত ফকীহ ঈসা এলাহকারীকে সঙ্গে দিয়ে পিতাকে বিদায় করেন এবং এলাহকারীর কাছে নুরুদ্দীন জঙ্গী বরাবর একটি পত্র দেন। সঙ্গে শোবকের কিছু উপহার সামগ্রীও দিয়ে দেন। সেই পত্রে তিনি লিখেছেন–

'মূল্যবান হাদিয়া শোবকের দুর্গ। তা-ও আমি আপনার পায়ে নিবেদন করছি। এরপর কার্ক দুর্গও পেশ করব ইনশাআল্লাহ।'

এ পত্রে সুলতান আইউবী প্রচ্ছন্নভাবে নুরুদ্দীন জঙ্গীকে খৃষ্টানদের নিত্য নতুন ষড়যন্ত্রের কথা স্মরণ করিয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন।

পত্রে সুলতান আইউবী শোবকের বর্তমান পরিস্থিতি ও তার বাহিনীর অবস্থান বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন এবং কয়েকটি বৈপ্লবিক প্রস্তাব পেশ করেন। জঙ্গীকে তিনি লিখেন–

'দুশমন আমাদের ভূখণ্ডে জেঁকে বসে আছে। তারা যুদ্ধ করছে আমাদের সাথে। গভীর চক্রান্তের মাধ্যমে গাদ্দার সৃষ্টি করছে তারা আমাদের মাঝে। আমাদের অ-সামরিক নেতৃত্ব কেবল ব্যর্থ-ই নয়– ইসলামী সাম্রাজ্যের জন্য বিরাট এক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ঘর-বাড়ি ছেড়ে অনেক দূরে উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে জীবনের মায়া ত্যাগ করে আমরা শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছি। আমাদের অকুতোভয় মুজাহিদরা লড়াই করছে আর জীবন দিচ্ছে। দিনের পর দিন না খেয়েও তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়েও থামছে না। শাহাদাতের পর কাফন পর্যন্ত জুটছে না তাদের। ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হচ্ছে তাদের লাশ। শৃগাল-শকুনের খোরাকে পরিণত হচ্ছে তাদের মৃতদেহ। ইসলামের মাহাত্ম্য ও জাতির মর্যাদা তারা যতটুক বুঝে, আর কেউ বুঝে না। ইসলাম ও জাতির জন্য আমাদের অ-সামরিক শাসকবর্গের এক ফোঁটা রক্তও ঝরে না। তারা যুদ্ধের ময়দান থেকে বহু দূরে নিরাপদ প্রাসাদে ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকে। অপরূপা সুন্দরী ও বাকচতুর নারী আর ইউরোপের মদ দিয়ে শত্রুরা তাদেরকে নিজেদের ভক্ত-অনুরক্তে পরিণত করছে। দ্বীন-ঈমানের সমুন্নতির জন্য আমরা জীবন দিচ্ছি আর তারা কিনা দুশমনের হাতে ঈমান বিক্রি করে আয়েশ করছে, শক্ত করছে কাফেরদের হাত।'

সুলতান আইউবী আরো লিখেন–

'আমি ফিলিস্তীনের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছেছি। সংকল্প নিয়েছি, সমগ্র ফিলিস্তীন জয় না করে ফিরব না। আপনি অ-সামরিক নেতৃবর্গের উপর কড়া নজর রাখুন। আলেমদের বলে দিন, যেন তারা মসজিদে মসজিদে এবং সর্বত্র এ ঘোষণা জানিয়ে দেন যে, ইসলামী সাম্রাজ্যের খলীফা শুধু একজন– বাগদাদের খলীফা। এক খলীফার আনুগত্য মেনে চলতে হবে সব মুসলমানের। খোতবায় খলীফার নাম যেন কেউ উচ্চারণ না করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাম-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। খলীফা কিংবা তাঁর কোন গভর্নর বাইরে বের হলে রক্ষী বাহিনী ছাড়া কোন সাধারণ মানুষ তাদের পিছনে যেন না হাঁটে, মাথা নত করে তাদের সালাম না করে, বলে দেবেন।'

পত্রে সুলতান আইউবী সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি লিখেছেন, তাহলো–

'শিয়া-সুন্নী বিরোধ বেড়ে চলেছে। ফাতেমী খেলাফতের পতন এ বিরোধকে বেশী উস্কে দিয়েছে। এর অবসান ঘটাতে হবে। খেলাফত ও হুকুমত সুন্নী বটে, কিন্তু তাই বলে শিয়াদের গোলামে পরিণত করার অধিকার কারুর নেই।'

পত্রখানা নুরুদ্দীন জঙ্গীর হাতে গিয়ে পৌঁছে। আইউবীর প্রস্তাবাবলীর প্রতি তিনি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তার বাস্তবায়ন শুরু করে দেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও প্রেম-ভালবাসার মাধ্যমে সুলতান আইউবীও নিজ অঞ্চলের শিয়া-সুন্নী বিরোধেরও অবসান ঘটাতে শুরু করেন।

সুলতান আইউবীর উপর পাল্টা আক্রমণের পরিকল্পনা নিচ্ছে খৃষ্টানরা। সংঘাত এড়িয়ে কৌশলে বেরিয়ে আসার নির্দেশ প্রেরণ করে তারা মরুভূমির বিক্ষিপ্ত সৈনিকদের প্রতি। পাশাপাশি চল্লিশ সদস্যের একটি কমান্ডো বাহিনীও গঠন করে ফেলে। নির্যাতিত মুসলিম বেশে শোবক প্রবেশ করে আটকেপড়া গুপ্তচর মেয়েদের বের করে আনবে তারা।

সুলতান আইউবীর অনুপস্থিতির সুযোগে খৃষ্টানরা মিসরে তাদের নাশকতার কার্যক্রম জোরদার করারও সিদ্ধান্ত নেয়। দ্রুত সুদানী ও ফাতেমীদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে কায়রো দখল করে নেয়ার পরিকল্পনা আঁটে তারা।

শোবক ও কার্কের মধ্যবর্তী অঞ্চলে চলছে ব্যাপক রক্তপাত। এলাকাটি সম্পূর্ণ অসমতল। স্থানে স্থানে মাটি ও বালির উঁচু উঁচু টিলা। ঢুকে পড়লে বের হওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এ দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে ধুঁকে ধুঁকে মরছে যেমন খৃষ্টানরা, তেমনি মুসলিম বাহিনীও। মুসলমানদের ভয়ে শোবক থেকে পালিয়ে আসা বেসামরিক খৃষ্টানরাও এখানে এসে পথ ভুলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াচ্ছে শকুনের দল। আনন্দের সীমা নেই ওদের। মানুষের গোশ্তে পরিপূর্ণ তাদের পেট। হিংস্র প্রাণীরা খাবলে খাচ্ছে নিহতদের লাশ। মরুভূমির কোথাও আছে খেজুর বাগান, আছে পানির ঝর্ণা। ক্ষুৎ-পিপাসায় ক্লান্ত ও আহত অনেক মানুষ জীবন বাঁচাবার আশায় ছুটে আসছে ওখানে। কিন্তু জীবন নিয়ে আর ফিরে যেতে পারছে না একজনও।

❁ ❁ ❁

আম্মাদ হাশেমী। মুসলিম বাহিনীর এক প্লাটুন কমাণ্ডার। বাড়ি সিরিয়া। খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে তার প্রচণ্ড ক্ষোভ। অন্যদের তুলনায় বেশী আক্রোশ তার ক্রুসেডারদের প্রতি।

সঙ্গীরা জানে, আম্মাদ এতীম। পিতা নেই। মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই তার। কিন্তু নিজের এতীম হওয়ার বিষয়টি তার কাছে নিশ্চিত নয়। কারণ, পিতা তার চোখের সামনে মরেনি।

তের-চৌদ্দ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়েছে আম্মাদ। শৈশবে খৃষ্টানরা হানা দিয়েছিল তার শোবকের বাড়িতে। সেই লোমহর্ষক ঘটনাটি স্পষ্ট মনে আছে তার। তখন মুসলমানদের উপর অমানুষিক নির্যাতনে মেতে উঠেছিল খৃষ্টানরা। খৃষ্টানদের নির্মম নির্যাতন চোখে দেখে বড় হয়েছে সে। সে দেখেছে পিটিয়ে পিটিয়ে হাঁকিয়ে নিয়ে মুসলিম বন্দীদের বেগার ক্যাম্পে নিক্ষেপ করার দৃশ্য। হাঁটতে না পারার কারণে চোখের সামনে দু'জন কয়েদীর দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করার এবং পিতা-মাতার সম্মুখ থেকে মেয়েদের তুলে নেয়ার হৃদয় বিদারক ঘটনা মনে পড়লে এখনো সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠে আম্মাদের। শহরে খৃষ্টানরা হঠাৎ নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিলে, মুসলমানদের অকারণে ধরে ধরে বেগার ক্যাম্পে পাঠাতে শুরু করলে, মুসলমানদের বাড়ি-ঘরে হানা দিতে আরম্ভ করলে মুসলমানরা মনে করত, এই বুঝি খৃষ্টানরা কোথাও মুসলমানদের হাতে পরাজয়ের শিকার হয়েছে।

এ অত্যাচার থেকে আম্মাদ হাশেমীর ঘরও রক্ষা পায়নি। একটি বোন ছিল তার। বয়স সাত-আট বছর। নাম আয়েশা। সে বোনটির কথাও মনে আছে তার। অতিশয় সুশ্রী ও ফুটফুটে মেয়ে। ঘরে ছিল তার পিতা, মা ও বড় এক ভাই।

একদিন বাইরে খেলতে গিয়ে আয়েশা আর ফিরে আসেনি। নিখোঁজ হয়ে যায় মেয়েটি। সর্বত্র পাতিপাতি করে সন্ধান নিয়েও পাওয়া গেল না তাকে। অবশেষে এক প্রতিবেশী জানাল, খৃষ্টানরা ওকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

নগর প্রশাসকের কাছে ফরিয়াদ জানাতে গেলেন আম্মাদের পিতা। কিন্তু অপহৃতা মেয়েটি মুসলমান একথা জানতে পেরে গর্জে উঠে প্রশাসক। বলে, তোমার এত বড় স্পর্ধা! শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এত হীনকর্মের অপবাদ দিলে তুমি! কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন আম্মাদের পিতা।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঘরে ফিরে আসেন তিনি। আর্জির ফল জানালেন সকলকে। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা পেয়ে ব্যাথ্যায় ছ্যাৎ করে জ্বলে উঠে সবার মন। সোচ্চার হয়ে উঠে তারা খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে।

শাসক গোষ্ঠীর এ অত্যাচারের প্রকাশ্য প্রতিবাদ জানায় তারা।

শাসক খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিবাদ! এর নিদারুণ পরিণতির শিকার হতে হয় আম্মাদের পরিবারকে। সে রাতেই খৃষ্টানরা হানা দেয় তাদের ঘরে। হত্যা করে আম্মাদের মা ও ভাইকে। নিজে পালিয়ে আশ্রয় নেয় এক প্রতিবেশী মুসলমানের ঘরে। সেই যে পালিয়ে আসা; আর ঘরে ফিরেনি আম্মাদ।

কিছুদিন লুকিয়ে থাকার পর এক ব্যক্তির সহায়তায় সাবধানে– অতি সন্তর্পণে শহর ত্যাগ করে আম্মাদ। এক কাফেলার সঙ্গে যোগ দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সিরিয়া পৌঁছে যায়। চাকুরী পেয়ে যায় এক ধনাঢ্য শিল্পপতির ঘরে।

পরের ঘরে নোকরী করে জীবন কাটাচ্ছে আম্মাদ। পাশাপাশি মানসিকভাবেও জাগ্রত হয়ে উঠে সে। মনে তার প্রতিশোধের আগুন। জ্বলছে দাউ দাউ করে।

সৈনিকদের ভাল লাগে আম্মাদের। শিল্পপতির বাসার নোকরী ছেড়ে তারও মন চায় সৈনিক হয়ে যুদ্ধ করতে। কিন্তু আপাততঃ সৈনিক হতে না পারলেও এক সেনা অফিসারের ঘরে চাকরি মিলে যায় তার। কাটে কিছুদিন। নিজের করুণ কাহিনী শোনায় অফিসারকে। সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছের কথাও ব্যক্ত করে তার কাছে। আম্মাদের দুঃখের কাহিনী শোনেন অফিসার। সান্ত্বনা দেন তাকে। উপদেশ দেন ধৈর্য ধারণের। মনের আশাও তার পূরণ হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। নিজ সন্তানের মত বরণ করে নেন তিনি অসহায় আম্মাদকে।

ষোল বছর বয়সে অফিসার আম্মাদকে সেনা বাহিনীতে ভর্তি করে নেন। প্রতিশোধ স্পৃহায় ব্যাকুল হয়ে আছে আম্মাদ। তিন চারটি লড়াইয়ে অংশ নেয়। অল্প ক'দিনে বীরত্ব ও প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠে তার।

এক যুগ পর এক বাহিনীর সঙ্গে আম্মাদকে পাঠিয়ে দেয়া হয় মিসরে। সুলতান আইউবীর সাহায্যে নুরুদ্দীন জঙ্গী প্রেরণ করেছিলেন এ বাহিনীটি। মিসরে কাটে তার দু'বছর।

এবার তার মনের আশা পূরণ হওয়ার পালা। শোবক অভিযানে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের তালিকায় আম্মাদের নামও এসে যায়। মরুভূমিতে খৃষ্টান বাহিনীর উপর আক্রমণ পরিচালনাকারী মুসলিম বাহিনীগুলোর একটির কমান্ডার নিযুক্ত হয় সে। মনের ক্ষোভ প্রশমিত করার সুযোগ পেয়ে যায় আম্মাদ।

এই সেই খৃষ্টান বাহিনী, যারা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল আম্মাদের সাত বছর বয়সের নিষ্পাপ অবুঝ বোন আয়েশাকে। এই সেই ঘাতকের দল, যারা নির্মমভাবে খুন করেছে আম্মাদের মা ও ভাইকে, যাদের ভয়ে নিজ বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালাতে হয়েছিল তাকে, যাদের নির্দয় নিষ্পেষণের শিকার হয়ে ধুঁকে ধুঁকে জীবন দিতে হচ্ছে শোবকের নিরপরাধ মুসলমানদেরকে।

খৃষ্টান বাহিনী এখন প্রতিশোধ স্পৃহায় প্রজ্বলিত আম্মাদের বৈধ শিকার। অতীব

বে-পরোয়া হয়ে উঠে আম্মাদ। খৃষ্টান বাহিনীর জন্য এক ভয়াবহ গজব হয়ে আবির্ভূত হয় সে।

দলের সৈন্যদের নিয়ে আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় বারবার গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করছে সে খৃষ্টানদের। অল্প সময়ে তার অশ্বারোহী গেরিলা বাহিনীর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। তবু বুকের প্রজ্বলিত আগুন নিভছে না তার। শত্রুদের উপর এত প্রলয় সৃষ্টি করার পরও মনের ক্ষোভ তার প্রশমিত হতে চাইছে না; মিটছে না হৃদয়ের জ্বালা।

একমাস পর।

আম্মাদের দলে মুজাহিদের সংখ্যা এখন চারজন। তাকে সহ পাঁচজন। বাকীরা সব শহীদ হয়ে গেছে। এক রাতে এই চার আরোহী আক্রমণ করে বসে খৃষ্টান বাহিনীর পঞ্চাশজনের এক প্লাটুনের উপর। সে এক অভাবিতপূর্ব দুর্ধর্ষ অভিযান। একস্থানে তাঁবু গেড়ে রাতের বেলা অবস্থান করছিল খৃষ্টান বাহিনী। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তারা। পাহারাও দিচ্ছে বেশ ক'জন সান্ত্রী। রাত তখন দ্বি-প্রহর। চার সঙ্গীকে নিয়ে বিদ্যুদ্বেগে ঘোড়া ছুটায় আম্মাদ। ঘুমন্ত খৃষ্টান সৈনিকদের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে অন্য দিকে যাওয়ার সময় বর্শা দ্বারা প্রবলবেগে আঘাত হানে ডানে-বাঁয়ে। তার সঙ্গীরাও একই প্রলয় সৃষ্টি করে। খৃষ্টানরা ঘটনা আঁচ করার পূর্বে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় আম্মাদ। ঘুমন্ত খৃষ্টানদের অনেকে আহত হয় বর্শার আঘাতে। চার চারটি ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়ে নিহত হয় বেশ ক'জন। সান্ত্রীরা অন্ধকারে তীর ছুঁড়ে। ব্যর্থ যায় তাদের লক্ষ্য।

কিন্তু মনে তৃপ্তি পেল না আম্মাদ। মোড় ঘুরে দাঁড়ায় সে। সঙ্গীদের থামায়। আস্তে আস্তে সরে আসে পিছনে। এতক্ষণে দুশমন সজাগ হয়ে গেছে, তা একটুও ভাবল না সে। সঙ্গীদের নিয়ে চলে যায় তাঁবুর নিকটে। দ্রুত ঘোড়া ছুটাতে নির্দেশ দেয়। অন্ধকারে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় শত্রু সেনাদের। দু'দিকে সমান গতিতে আক্রমণ চালিয়ে শত্রু শিবিরের উপর দিয়ে তীরবেগে ছুটে যায় পাঁচটি ঘোড়া। কিন্তু শিবির অতিক্রম করার পর এবার তারা পাঁচজন নয়– তিনজন। তীরের আঘাতে খৃষ্টানরা ফেলে দিয়েছে দু'জনকে।

আম্মাদ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। রক্তের তেজ বেড়ে যায় তার। সঙ্গী দু'জনকে ডেকে বলে, 'এক্ষুণি আমি এর প্রতিশোধ নিচ্ছি।' সীমাহীন বেপরোয়া হয়ে উঠে আম্মাদ। ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে খৃষ্টানদের সন্নিকটে এসেই আক্রমণ করার নির্দেশ দেয় সঙ্গীদের। তাদের ঘোড়াগুলো এবার ক্লান্ত। দুশমনও পূর্ণ সজাগ-সচেতন। বেশ কিছুক্ষণ হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে আম্মাদ সরে আসে পিছনে।

দুশমনের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসার সময় তার পিছন পিছন ছুটে আসে দু' অশ্বারোহী। তারা আম্মাদের সঙ্গী নয়– শত্রুসেনা। ধাওয়া করছে তাকে। অন্ধকারে পিছন থেকে হাঁক দিলে ঘটনাটি টের পায় আম্মাদ। সঙ্গী দু'জন পান করে শাহাদাতের অমীয় সুধা।

দুই শত্রুসেনা চলে আসে আম্মাদের মাথার কাছে। হাতে তাদের তরবারী। আঘাত হানে আম্মাদের উপর। আম্মাদের হাতে বর্শা। প্রথমবার শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে দাঁড়ায় সে। মোকাবেলা করে দুই শত্রুর। তরবারীর মোকাবেলায় বর্শা। ঘোড়ার পিঠে বসে মুখোমুখি লড়াই করছে আম্মাদ। শত্রুর তরবারীর আঘাত প্রতিহত করছে, কৌশলে নিজে আঘাত করছে বর্শা দ্বারা।

দীর্ঘক্ষণ চলে এ লড়াই। আম্মাদের হাতে পরাজিত হয়ে পালাতে চেষ্টা করে শত্রু সেনাদ্বয়। কিন্তু আম্মাদ ওদের পালিয়ে বাঁচতে দেবে কেন? খৃষ্টানদের খুন করায়-ই যে তার আনন্দ! ছুটে গিয়ে পিছন থেকে আঘাত করে পলায়নপর দুই খৃষ্টান সৈন্যের উপর। অম্‌নি মাটিতে পড়ে যায় তারা। এবার মনটা খানিক হালকা হল আম্মাদের।

শোবক পাঠানোর জন্য ধরে নিল ঘোড়াগুলো। তুলে নিল তরবারী দু'টো। কিন্তু কোথায় এসে পৌঁছেছে, তা সে জানে না। দিনে আক্রমণ করা যাবে না বলে পিছু নিয়েছিল শত্রুদের। এসে পড়েছে মূল ঘাঁটি ছেড়ে বহু দূরে এখানে। নিজেকে এবং ক্লান্ত ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেয়ার জন্য সে অবস্থান নেয় এক জায়গায়। কিন্তু পাছে কোথাও থেকে হঠাৎ কোন শত্রু এসে আক্রমণ করে বসে কিনা, এ আশংকায় ঘুমায় না আম্মাদ। জেগে কাটায় সারা রাত। তারকা দেখে শোবক ও কার্কের দিক নির্ণয় করে। মরুভূমিতে কোন্ দিকে গেলে মুসলিম সৈন্যদের পাওয়া যাবে, তা-ও ঠিক করে নেয় সে।

ভোর হওয়া মাত্র উঠে রওনা দেয় আম্মাদ। মরুভূমির সন্তান সে। মরুভূমিতে তার জন্ম, ওখানেই তার লালন-পালন ও বড় হওয়া। তাই পথ হারাবার ভয় নেই তার। তাছাড়া সে একজন অভিজ্ঞ গেরিলা যোদ্ধা। দূর থেকে বিপদের গন্ধ পায় সে।

বহু দূরে শত্রু বাহিনীর চার-পাঁচজনের কয়েকটি ক্ষুদ্র দল চোখে পড়ে আম্মাদের। সাথে অতিরিক্ত ঘোড়া দু'টি না থাকলে কান্ড একটা ঘটিয়ে ছাড়ত। কিন্তু মূল্যবান ঘোড়া দু'টো রক্ষা করার নিমিত্ত সন্তর্পণে শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে এগিয়ে চলে আম্মাদ। পথে বিভিন্ন স্থানে মৃত উট-ঘোড়া ও খৃষ্টান সৈন্যদের মরা লাশ দেখতে পায় সে। শকুন-শৃগালেরা খাবলে খাচ্ছে ওদের গোশত। তাতে দু'চারজন মুসলিম সৈনিকের লাশ থাকাও বিচিত্র নয়।

গন্তব্য অভিমুখে এগিয়ে চলে আম্মাদ। সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। সম্মুখের পার্বত্য ভূমিতে এসে পৌঁছে সে। আঁকাবাঁকা পথ। কয়েক পা পরপরই ডানে-বাঁয়ে

মোড় নিয়েছে এখানকার রাস্তাগুলো। খৃষ্টান বাহিনীর ক্ষুদ্র কোন দল এ অঞ্চলে অবস্থান নিয়ে থাকতে পারে বলে আশংকা জাগে আম্মাদের মনে। তাই সূর্যাস্তের আগে-ভাগেই এখান থেকে কেটে পড়তে চাইছে সে। টিলার উপর কোন তীরান্দাজ ওঁৎ পেতে বসে থাকার আশংকাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। উপর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চলছে আম্মাদ।

❁ ❁ ❁

দু'টি টিলার মধ্য দিয়ে মোড় নিয়েছে সামনের গলি। পথের বাঁক ধরে মোড় নিতেই আচম্‌কা কারো ধাবমান পায়ের শব্দ শুনতে পায় আম্মাদ। কে একজন লুকিয়ে ছিল পাশের টিলায়। ঘোড়ার লাগামে ঝাঁকুনি দেয় আম্মাদ। বেড়ে যায় ঘোড়ার গতি। তীরবেগে চলে যায় সে টিলার পিছনে। কিন্তু একি! পথ নেই যে আর! সম্মুখে আরেকটি টিলা রোধ করে রেখেছে আম্মাদের পথ।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় দাঁড়িয়ে আছে আম্মাদ। এদিক-সেদিক চোখ ফিরিয়ে পথের সন্ধান করছে সে। দৃষ্টি পড়ে সামনের টিলায়। দেখে, টিলার চড়াই বেয়ে উপরে উঠার চেষ্টা করছে একজন লোক। গায়ে তার লম্বা জুব্বা। মাথাটা এক খণ্ড বস্ত্র দ্বারা আবৃত। পিঠটা আম্মাদের দিকে। দু'হাত ও কনুইয়ে ভর করে উঠার চেষ্টা করছে সে।

লোকটিকে নিরস্ত্র হওয়ার জন্য পিছন থেকে হাঁক দেয় আম্মাদ। বলে, নেমে এস, নইলে পরিণতি ভাল হবে না। কিন্তু তাতে কর্ণপাত করল না লোকটি। উপরে উঠার চেষ্টা চালিয়ে-ই যাচ্ছে সে। বেশ দুর্গম টিলা।

সামনে এগিয়ে যায় আম্মাদ। দ্রুত উপরে উঠে যাওয়ার চেষ্টা করে লোকটি। কিন্তু হাত-পা বসাতে পারছে না সে কোথাও। এতক্ষণে এক পা-ও উঠতে পারেনি সে। ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে পড়েছে তার দেহ। টিলা থেকে ঢিলে হয়ে আসে তার মুষ্টি। হাত ফস্‌কে গড়িয়ে পড়ে নীচে; আম্মাদের ঘোড়ার ঠিক পায়ের কাছে। নেকাব সরে গিয়ে অনাবৃত হয়ে পড়ে তার মাথা ও মুখমন্ডল। কিন্তু একি! এযে পুরুষ নয়– নারী! অপূর্বদৃশ্য অপরূপা এক সুন্দরী যুবতী! বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে আম্মাদ।

ঘোড়া থেকে নামে আম্মাদ। ভয়ে কাঁপছে মেয়েটি। ভীতি অবশিষ্ট শক্তিটুকুও শেষ করে দিয়েছে তার। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে মেয়েটি। কিন্তু পারল না, বসে পড়ল।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করে আম্মাদ।

'পানি দাও।' জবাবে বলল মেয়েটি।

ঘোড়া থেকে মশক খুলে মেয়েটিকে পানি দেয় আম্মাদ। হাতে নিয়ে মেয়েটি ঢক্‌ঢক্‌ করে খেয়ে ফেলে সবটুকু পানি। চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসে মেয়েটির। তাকে কিছু খাবার এনে দেয় আম্মাদ। ক্ষুধায় কাতর মেয়েটি খাবার খেয়ে কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠে। জীবনীশক্তি ফিরে পায় সে।

'আমাকে ভয় কর না; বল তোমার পরিচয় কি?' বলল আম্মাদ।

'শোবক থেকে পরিবারের সঙ্গে পালিয়ে এসেছিলাম। পথে মারা গেছে সব ক'জন। বেঁচে আছি একা আমি। পথে মুসলমানরা আক্রমণ করেছিল।' অব্যক্ত কণ্ঠে জবাব দেয় মেয়েটি।

'না। সত্যি করে বল তুমি কে? যা বলেছ সব মিথ্যে।'

'মিথ্যে হলে হল। আমার প্রতি দয়া করুন; আমাকে কার্ক পৌঁছিয়ে দিন।'

'কার্ক নয়– আমি তোমাকে শোবকে নিয়ে যাব। বুঝতেই তো পারছ, আমি মুসলমান। পথে আমি খৃষ্টানদের হাতে মরতে চাই না।'

'তাহলে আমাকে একটি ঘোড়া দিন। আমি মেয়ে মানুষ। পথে কারুর হাতে পড়ে গেলে জানেন তো পরিণতি কী হবে।'

আমি তোমাকে ঘোড়াও দিতে পারব না। একাও পাঠাতে পারব না। সঙ্গে করে তোমাকে শোবক নিয়ে যাওয়া আমার অর্পিত কর্তব্য।'

'সেখানে নিয়ে আমাকে কার হাতে তুলে দিবেন?'

'শোবকে নিয়ে আমি তোমাকে সেখানকার নতুন শাসকদের হাতে তুলে দেব। তুমি অমূলক ভয় পাচ্ছ। ইসলাম নারীকে ইজ্জত করতে শেখায়-অপমান করা নয়। শোবকে নিয়ে তোমাকে আমি যাদের হাতে তুলে দেব, তাঁরা মুসলমান, ইসলামী আদর্শে বলিয়ান। তারা পরনারীর গায়ে হাত দিতে জানে না। আর আমিও সেই একই আদর্শের অনুসারী। সব ভয়-ভীতি মন থেকে ঝেড়ে ফেলে আমার সঙ্গে চল।'

তবু শোবক যেতে চাইছে না মেয়েটি। কার্ক যাওয়ার জন্যই জিদ্ ধরে আছে সে। আম্মাদ বলে, শোবকের কোন নাগরিক যেন পালিয়ে যেতে না পারে, সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখার নির্দেশ রয়েছে আমাদের উপর। যারা নগর থেকে বের হয়ে এসেছে, তাদেরও ধরে ধরে ফেরত পাঠাতে বলা হয়েছে। তাছাড়া তুমি এখান থেকে রওনা হয়ে কার্ক পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছতে পারবে না। পথেই শেষ হয়ে যাবে তোমার সব সম্পদ। তোমার স্বজাতি ভাইয়েরাই খাবলে খাবে তোমাকে। নারীর ইজ্জতের গ্যারান্টি থাকলে আছে একমাত্র ইসলামে, আছে মুসলমানদের কাছে। দেরি না করে চল, রওনা হই।

আম্মাদের কোন কথাই কানে ঢুকছে না মেয়েটির। তার প্রবল আশংকা, এই মুসলমান সৈনিকটি কোথাও নিয়ে গিয়ে তাকে অপমান করবে। ইজ্জত লুট করে কেটে পড়বে। আম্মাদের সঙ্গে উপরে উঠছে না মেয়েটি। মনে মনে কৌশল আঁটে, আম্মাদকে খুন করে তার-ই ঘোড়া নিয়ে চম্পট দিবে। বলে, 'ঠিক আছে, তা-ই হবে। তবে এ অবসন্ন শরীর নিয়ে এখন আমি পথ চলতে পারব না। রাতটা দু'জনে এখানেই কাটাই। ভোরে উঠে আমরা রওনা হব।'

আম্মাদ নিজেও ক্লান্ত। ঘোড়াগুলোরও বেহাল অবস্থা। মেয়েটির ভগ্নদশাও তার চোখের সামনে। তাই প্রস্তাবে সম্মত হল সে।

প্রথমে মেয়েটি আম্মাদকে ভাল করে দেখেনি। লম্বা দাড়ি, দীর্ঘ দেহ আর মুখের গঠনে আম্মাদকে এক হিংস্র প্রাণী বলেই মনে হয়েছিল তার। তাছাড়া তার ধারণা, মুসলমান মানেই হিংস্র পশু, যাদের কাছে মায়া-দয়ার আশা করা বৃথা। কিন্তু এবার পুনর্বার গভীর দৃষ্টিতে, নিরীক্ষার চোখে ভাল করে দেখে নেয় সে আম্মাদকে। ভাবান্তর ঘটে যায় তার; না, মুসলমান মানেই হিংস্র নয়।

গভীর অপলক দৃষ্টিতে আম্মাদও তাকিয়ে আছে মেয়েটির প্রতি। ও ভাবছে, মেয়েটির অসহায়ত্বের কথা, এমনি এক অপরূপা সুন্দরী যুবতীর একাকী এই মরুভূমিতে পড়ে থাকার বিপদের কথা। আজ বেশ ক'দিন হল যুদ্ধ চলছে এই মরু অঞ্চলে। দু' পক্ষের সৈন্যরা ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় ছুটে বেড়াচ্ছে এদিক-সেদিক। এভাবে একাকী পড়ে থাকলে কখন কার হাতে পড়ে মেয়েটিরও ইজ্জত হারাতে হত, তা বলা মুশকিল। এমনও তো হতে পারে যে, দখল প্রতিষ্ঠার জন্য মেয়েটিকে নিয়ে সৈনিকরা নিজেরাই পরস্পর যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিবে! ভাগ্যিস, মেয়েটি আমার হাতে পড়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবে সে, তাতে কি হল? আমিও তো ফেরেশতা নই। আমারও তো রক্ত-মাংস আছে, আছে কামনা-বাসনা, আছে যৌন-লালসা!

মেয়েটির চোখে চোখ রাখে আম্মাদ। মেয়েটিও তাকায় আম্মাদের প্রতি। লজ্জা পেল আম্মাদ। চোখ সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে সে। কিন্তু রূপের চুম্বকার্ষণে মেয়েটির চোখে চোখ আটকে যায় তার। নিজের মধ্যে কেমন এক অনুভূতি আবিষ্কার করে সে, যা তার কাছে নিতান্ত অপরিচিত, একেবারে নতুন।

বহু কষ্টে দৃষ্টি অবনত করে আম্মাদ। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য মাত্র। পরক্ষণেই আবার চোখাচোখি হয় দু'জনের। অভাবিতপূর্ব এক শিহরণ খেলে যায় আম্মাদের মনে। হৃদয়টা যেন কেমন তোলপাড় করতে শুরু করে দেয় তার। অস্থির হয়ে উঠে সে। মেয়েটির দু' ঠোঁটের ফাঁকে ফুটে উঠে একটুখানি মুচকি হাসি।

'বোধ হয় তোমার এখনো বিয়ে হয়নি!' আম্মাদের মনে কৌতূহল।

'হ্যাঁ, আমি এখনো কুমারী।' জবাব দিয়েই ঝট্ করে বলে ফেলে, 'জগতে কেউ নেই আমার। আমার সঙ্গে কার্ক চল, আমি তোমার বউ হব।'

চৈতন্য ফিরে আসে আম্মাদের। বলে, 'হ্যাঁ, তারপর বলবে, এবার ধর্ম বদল কর। ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্টান হও; তাই না? তারচে' বরং শোবক চল। মুসলমান বানিয়ে আমি তোমায় বিয়ে করে নেব। তুমি ঈমানী জিন্দেগীর স্বর্গীয় স্বাদ অনুভব করবে।'

'যে করে হোক, কার্ক আমার যেতেই হবে। আমার সঙ্গে ওখানে গেলে তোমার জগত পাল্টে যাবে।' টোপ ফেলে মেয়েটি। ঈমান বেচা-কেনার হাট বসিয়ে দেয় সে।

কিন্তু হঠাৎ ভাবান্তর ঘটে যায় আম্মাদের মনে। মেয়েটির মুখমন্ডল, রেশমী চুল আর মায়াবী চোখ দু'টো সে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছে আর মাথা ঝুঁকিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে গভীর চিন্তার জগতে। মেয়েটির কোন কথাই যেন ঢুকছে না আম্মাদের কানে।

মাথা তুলে উঠে দাঁড়ায় আম্মাদ। ঘোড়ায় বাঁধা থলে থেকে কিছু খাবার এনে খায় দু'জনে। কারো মুখেই রা নেই।

ঘুমিয়ে পড়ে আম্মাদ। অবসন্ন দেহটি মাটির শয্যায় এলিয়ে দেয়া মাত্র বুজে আসে তার দু' চোখের পাতা। গভীর নিদ্রায় তলিয়ে যায় সে। ঘুমিয়ে পড়ে মেয়েটি।

মধ্যরাতের পর পার্শ্ব পরিবর্তন করে মেয়েটি। চোখ খুলে যায় তার। কিছুক্ষণ আড়মুড়িয়ে আচ্ছন্ন ভাবটা দূর করে আম্মাদের প্রতি তাকায় সে। নাক ঢেকে ঘুমুচ্ছে আম্মাদ। কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াগুলো। টিলার উপর নেমে এসেছে আকাশের চাঁদ। স্বচ্ছ কাচের মত পরিষ্কার মরুভূমির জোৎস্না। চন্দ্রালোকে ভেসে যাচ্ছে যেন প্রকৃতি। ঘোড়াগুলোর প্রতি তাকায় মেয়েটি। সব ক'টি ঘোড়ার পিঠে জিন বাঁধা। শোয়ার আগে জিনগুলো খুলে রাখবে, তা মনেই ছিল না আম্মাদের।

অনুকূল পরিবেশ পেয়ে জুব্বার পকেটে হাত ঢুকায় মেয়েটি। বের করে আনে চক্চকে একটি খঞ্জর। শক্ত করে ধরে প্রস্তুতি নেয় সে। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আম্মাদকে। গভীর নিদ্রায় অচেতন সে। মেয়েটি একবার চক্মকে খঞ্জরের প্রতি আবার আম্মাদের মুখমন্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। ক্ষীণ স্বরে বিড়বিড় করে কি যেন বলছে আম্মাদ।

আম্মাদের বুকটা কোথায়, গভীর দৃষ্টিতে দেখে নেয় মেয়েটি। হৃদপিন্ডটা কোথায় থাকতে পারে তা-ও আন্দাজ করে নেয় সে। একবারের স্থলে দু'বার আঘাত করা যাবে না। তাই আঘাতটা হানতে হবে হৃদপিন্ডে, যেন আহ! বলার আগেই প্রাণটা বেরিয়ে যায়। অন্যথায় মরতে মরতেও পাল্টা আঘাত হেনে মেরে ফেলবে তাকে।

হাতের খঞ্জর আরো শক্ত করে ধরে মেয়েটি। পরিকল্পনাটা সম্পূর্ণ কল্পনায় নিয়ে আসে আরেকবার– হৃদপিন্ডে খঞ্জর বিদ্ধ করব। ছুটে গিয়ে একটি ঘোড়ায় চড়ে বসব। তীরবেগে ঘোড়া ছুটাব।

মেয়েটি সৈনিক নয়। অন্যথায় তার এত কিছু ভাবতে হত না। এক আঘাতে আম্মাদকে খতম করেই পালিয়ে যেত। কারণ হিসেবে এটা-ই যথেষ্ট ছিল যে, আম্মাদ মুসলমান ও তার শত্রু।

কিন্তু ও তা পারছে না। বারবার চোখ দু'টো চলে যাচ্ছে আম্মাদের মুখের প্রতি। আম্মাদের বুকে বিদ্ধ করার জন্য খঞ্জরের বাঁট শক্ত করে ধরে কাছে গেলেই কেন যেন মনটা তার ধড়ফড় করতে শুরু করে। খঞ্জরের হাতল ধরা হাতটা তার নেমে আসে নীচে।

আবারো বিড়বিড় করে আম্মাদ। এবার ঘুমের ঘোরে উচ্চারিত শব্দগুলো তার কিছুটা বুঝা যায়। স্বপ্নে বাড়ি গিয়েছিল সে। মাকে ডাকে, ডাকে বোনকে। আরও এমন কিছু শব্দ, যাতে বুঝা গেল, তাদেরকে কেউ খুন করেছে। খুনীদের খুঁজে বেড়াচ্ছে সে।

কি এক অজানা অনুভূতি চেপে ধরেছে মেয়েটির হাত। সীমাহীন বিচলিত হয়ে পড়ে সে। আম্মাদকে হত্যা করার সংকল্প ত্যাগ করে। খঞ্জর হাতে পা টিপে টিপে এগিয়ে যায় ঘোড়ার কাছে। কিন্তু বালিতে পা আটকে যায় তার। থেমে পিছন ফিরে আম্মাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আরেকবার। হঠাৎ এক ঝাঁক প্রশ্ন জেগে উঠে তার মনে। আমার মত রূপসী এক যুবতীকে একাকী হাতের মুঠোয় পেয়েও কি লোকটির মনে কোন ভাবান্তর ঘটল না? জ্বলে উঠল না তার কামনার আগুন? একটি খৃষ্টান মেয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে হত্যা করে ফেলতে পারে, সে কথা কি একটিবারও ভাবল না? লোকটি ঘোড়ার জিনও খুলে রাখেনি, নিজের অস্ত্রগুলোকেও সাবধানে রাখেনি। কেন? তবে কি আমার উপর তার পূর্ণ আস্থা ছিল। লোকটা কি এতই অনুভূতিহীন যে, আমার যৌবন তার দেহে একটুও লালসা সৃষ্টি করতে পারল না? তবে কি সে নিজেকে তার ঘোড়া অপেক্ষা বেশী মূল্যবান মনে করেনি?

মেয়েটি ধীরে ধীরে পৌঁছে যায় একটি ঘোড়ার নিকট। মানুষের আগমন টের পেয়ে ডেকে উঠে ঘোড়া। ভয় পেয়ে যায় মেয়েটি। আম্মাদ জেগে গেল কিনা, তাকায় সেদিকে। কিন্তু না, গভীর ঘুম ঘুমাচ্ছে আম্মাদ। নীরব-নিস্তব্ধ নিশীথে একটি ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনিতেও ঘুম ভাঙল না তার।

নিশ্চিন্ত হয় মেয়েটি। তিনটি ঘোড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে একটিতে চড়ে বসার সংকল্প করে সে। এক পা তার ঘোড়ার রেকাবে। ঠিক এমনি সময়ে পিছন থেকে একটি কণ্ঠ ভেসে আসে তার কানে, 'কে?'

চমকে উঠে মেয়েটি। মাথা ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকায়। এক ব্যক্তি শিস্ বাজিয়ে বলে, 'এ আমাদের সৌভাগ্য'।

তারা দু'জন। হাসিতে ফেটে পড়ে অপরজন।

মুখের ভাষায় মেয়েটি বুঝে ফেলে লোক দু'জন খৃষ্টান। দ্রুতপদে ধেয়ে আসে তারা মেয়েটির কাছে। ক্ষুধার্ত হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর। একজন বাহু ঝাঁপটে ধরে মেয়েটিকে টেনে নেয় নিজের দিকে। 'আমি খৃষ্টান' বলে নিজের পরিচয় দিয়ে রক্ষা পেতে চায় মেয়েটি। হেসে উঠে দু'জন-ই। হাসি থামিয়ে একজন বলে, 'তবে তো তোমার সবটাই আমাদের, এস'।

'একটু থাম; আগে আমার কথা শোন। আমি শোবক থেকে পালিয়ে এসেছি। নাম আইওনা। আমি গোয়েন্দা বিভাগের কর্মী। যাচ্ছি কার্কে। ঐ যে দেখ, একজন

মুসলিম সৈনিক ঘুমিয়ে আছে। ও আমাকে ধরে ফেলেছিল। তাকে ঘুমন্ত রেখে পালাতে চেয়েছিলাম। আমাকে তোমরা সাহায্য কর। দয়া করে আমাকে কার্কে পৌঁছিয়ে দাও।'

খৃষ্টান বাহিনীর জন্য কতটুকু মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ মেয়ে সে, তা খুলে বলল আইওনা। তবু ওরা নিরস্ত হল না।

একজন তাকে হায়েনার মত বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরে বলল, 'যেখানে বলবে, সেখানে-ই তোমায় পৌঁছিয়ে দেব।' অশ্লীল এক মন্তব্য ছুঁড়ল অপরজন। একদিকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যেতে শুরু করল তারা আইওনাকে।

ওরা দু'জন খৃষ্টান বাহিনীর সৈন্য। মুসলিম কমান্ডো বাহিনীর ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। রাতে নিরিবিলি লুকিয়ে একটু বিশ্রাম নেয়ার জন্য এসেছিল এখানে। আইওনার রূপ পশুতে পরিণত করেছে তাদের। ক্রুশের প্রতিও লোক দু'টোর কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই। উচ্চস্বরে চীৎকার করে উঠে আইওনা। আম্মাদ জেগে উঠে তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে, এই তার আশা। সৈন্যরা হেঁচড়াতে শুরু করে মেয়েটিকে।

হঠাৎ ভয়ার্ত কণ্ঠে চীৎকার করে একজন তার সঙ্গীর নাম নিয়ে বলে, সাবধান! কে যেন আসছে! কিন্তু না, সাবধান হওয়ার আগেই বর্শা আমূল বিদ্ধ হয়ে গেছে তার পিঠে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে।

তরবারী হাতে নিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় দ্বিতীয়জন। হঠাৎ মেয়েটির মনে পড়ে যায়, তার হাতে খঞ্জর। বিলম্ব না করে খৃষ্টান সৈন্যের পাঁজরে ঢুকিয়ে দেয় সেটি। পর পর আরো দু'টি আঘাত হানে সে। চীৎকার করে বলে, 'তোমাদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। তোমরা ক্রুশের কলংক।'

লাশ হয়ে গেছে দু' খৃষ্টান সৈন্য। আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অঝোরে কাঁদছে আইওনা। আম্মাদ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'এখন আর এখানে থাকা ঠিক নয়। অন্য কোন খৃষ্টান সেনাদল এদিকে এসে পড়তে পারে। চল, এক্ষুণি শোবক রওনা হই।' বলে আম্মাদ জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, 'ওরা কি তোমাকে জাগিয়ে তুলেছিল?

'না, আমি জাগ্রত-ই ছিলাম। ঘোড়ার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'ওখানে কেন?'

'ঘোড়ায় চড়ে পালাবার জন্য। তোমার সঙ্গে যাব না, আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম।'

'খঞ্জর পেলে কোথায়?'

'আমার সঙ্গে ছিল। ওরা আসার পূর্বে-ই এটি আমার হাতে ছিল।'

'কারণ?' আম্মাদের কণ্ঠে প্রচণ্ড কৌতূহল। কপালে ভাজ পড়ে যায় তার। বলে, 'বোধ হয় এজন্যে যে, জাগ্রত হওয়ার পর আমাকে হত্যা করবে।'

মেয়েটি নিরুত্তর। মাথা নত করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সে। খানিক পর মাথা তুলে আম্মাদের মুখপানে তাকায়। তারপর চোখ সরিয়ে জড়তামাখা কণ্ঠে বলে, 'তোমাকে খুন করে আমি পালাতে চেয়েছিলাম। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তোমাকে হত্যা করারই জন্য জুব্বার পকেট থেকে এটি বের করেছিলাম। কিন্তু পারিনি; কেন জানি শত ইচ্ছার পরও তোমাকে খুন করার জন্য আমার হাত উঠেনি। তোমার জীবন ছিল আমার হাতের মুঠোয়। তাছাড়া আমি ভীরুও নই। তারপরও কেন যে তোমায় খুন করতে পারলাম না, আমি তা জানিনা। তুমি হয়ত বলতে পারবে।'

'মানুষের জীবন-মৃত্যু আল্লাহর হাতে। তিনি-ই তোমার হাত স্তব্ধ করে রেখেছিলেন। আর তোমার সম্ভ্রমও রক্ষা করেছেন তিনি-ই। আমি তো একটি উপলক্ষ্য মাত্র। যাক্ গে ও-সব। একটি ঘোড়ায় চড়ে বস, রওনা হই।' বলল আম্মাদ।

হাতের খঞ্জর আম্মাদের প্রতি এগিয়ে ধরে মেয়েটি বলল, 'এই নিন, আমার খঞ্জরটি আপনার কাছে রাখুন। অন্যথায় আমি আপনাকে হত্যা করে ফেলতে পারি।'

'আমার তরবারীটিও তুমি নিজের কাছে রাখতে পার। তুমি আমায় হত্যা করতে পারবে না।' পরম গাম্ভীর্যের সাথে বলল আম্মাদ। মেয়েটির মুখেও গম্ভীরতার ছাপ।

দু'টি ঘোড়ায় চেপে বসে দু'জন। তৃতীয় ঘোড়াটিও সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করে তারা।

সূর্যোদয়ের আগেই তারা এগিয়ে যায় বহুদূর। খৃষ্টান সৈনিকদের আনাগোনা চোখে পড়ছে না এখন। একদল মুসলিম সৈনিকের দেখা পেল আম্মাদ। ঘোড়ার বাগ টেনে কথা বলে তাদের সাথে। আবার রওনা হয়।

এপ্রিল মাস। প্রচন্ড তাপ। গরমে সিদ্ধ হয়ে যায় যেন আম্মাদের সমস্ত শরীর। দূরে ধূ-ধূ বালুকারাশি সমুদ্রের পানির মত চিক্‌চিক্ করছে। বাঁ-দিকে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বালির পর্বত। পথের দু'ধারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পড়ে আছে অসংখ্য লাশ। অক্ষত নেই একটিও। শকুন-শিয়ালেরা খেয়ে খেয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে ওদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কোন কোন লাশের হাড় আর মাথার খুলি ছাড়া কিছুই নেই। প্রচন্ড খরতাপের সঙ্গে যোগ হয়ে পঁচা লাশগুলোর উৎকট দুর্গন্ধ বিষিয়ে তুলেছে আম্মাদকে।

এ যাবত কোন কথা হয়নি দু'জনের। মেয়েটির ঘোড়াকে পাশাপাশি নিয়ে আসে আম্মাদ। মুখ খুলে সে।

'এরা তোমার স্বজাতির সৈনিক। ইসলামী সাম্রাজ্যের পতন ঘটানোর নিমিত্ত বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইটালী প্রভৃতি দেশ থেকে আসা রাজ-রাজড়াদের ইচ্ছার বলি এরা।'

কথা বলে না মেয়েটি। কেবল একবার আম্মাদের মুখপানে তাকিয়ে আহ! বলে এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথা নত করে সে। বাঁয়ের পর্বতের প্রতি মোড় ফেরায় আম্মাদ।

পিপাসা নিবারণের জন্য পানি আর বিশ্রামের জন্য ছায়া দুই-ই পাওয়া যাবে ওখানে।

আকাশের সূর্যটাকে পিছনে ফেলে পার্বত্য এলাকায় ঢুকে পড়ে দু'জন। ঘোড়াগুলোকে ঘাসে ছেড়ে দিয়ে একটি ঝর্ণা খুঁজে নিয়ে পানি পান করে তারা। ঘোড়াগুলোকেও পান করায়। দু'জনে বসে পড়ে একটি গাছের ছায়ায়। প্রথমে মুখ খোলে মেয়েটি।

'তুমি কে? তোমার নাম কি? বাড়ি কোথায়?' আম্মাদকে প্রশ্ন করে মেয়েটি। মনে তার প্রচন্ড কৌতূহল। জবাবের জন্য অধীর চোখে তাকিয়ে আছে আম্মাদের মুখের প্রতি।

'আমি মুসলমান। নাম আম্মাদ। বাড়ি সিরিয়া।' জবাব দেয় আম্মাদ।

'রাতে ঘুমের ঘোরে তুমি কাকে স্মরণ করছিলে?'

'মনে নেই। স্বপ্নে আমি কথা বলছিলাম, না? আমার এক সহকর্মীও আমাকে বলত, আমি নাকি ঘুমের ঘোরে কথা বলি!'

'তোমার মা আছেন? বোন আছে? বোধ হয় তুমি ওদের কথা-ই স্মরণ করছিলে।'

আহ! বলে উত্তপ্ত এক দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে আম্মাদ। বলে, 'ছিল এক সময়। এখন কেবল স্বপ্নযোগেই তাদের সাথে সাক্ষাৎ করি।'

আরো অনেক কিছু জানতে চায় মেয়েটি। কিন্তু এড়িয়ে যায় আম্মাদ। আর কোন প্রশ্নের-ই জবাব দেয় না সে। মেয়েটিকে উদ্দেশ করে বলে—

'তুমি নিজের মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিলে। তবে 'আসলে তুমি কে' এ প্রশ্ন করার এখন আর আমি প্রয়োজন মনে করি না। আমাদের পথ আর বেশী নেই। শোবক পৌঁছে নগর প্রশাসকের হাতে তোমায় তুলে দিয়ে-ই আমি ফিরে আসব। যদি সত্য বল, তাহলে নিজের সম্বন্ধে তুমি কিছু বলতে পার। কি বলবে, তুমি-ই জান; আমি কোন প্রশ্ন করব না। তবে, যেসব খৃষ্টান মেয়ে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য আমাদের দেশে আসে, তুমি তাদের কেউ নও, একথা বলতে পারবে না আগেই বলে দিচ্ছি।'

'তোমার ধারণা যথার্থ। আমি গোয়েন্দা মেয়ে-ই বটে। আমার নাম আইওনা।' বলল মেয়েটি।

'বাবা-মা কি জানেন, তুমি কী কর?'

'বাবা-মা নেই। কখনো তাদের চেহারাও দেখিনি। আমি যে বিভাগে চাক্‌রী করি, সেই বিভাগ আমার মা; আর বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা হরমুন আমার পিতা।' বলেই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ফেলে মেয়েটি। বলে—

'লুজিনা নামে আমার এক সহকর্মী ছিল। এক মুসলিম সৈনিকের জন্য সে বিষপানে আত্মহত্যা করেছিল। তখন আমি বিস্মিত হয়েছিলাম এই ভেবে যে, একটি খৃষ্টান মেয়ে একজন মুসলমান সৈনিকের জন্য এত বড় ত্যাগ দিতে পারে! কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, হ্যাঁ, এমনটি হওয়া সম্ভব।

শুনেছিলাম, ঐ মুসলিম সৈনিকটিও নাকি তোমার ন্যায় একদল ডাকাতের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজের দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে লুজিনার জীবন-সম্ভ্রম রক্ষা করেছিল। আহত হওয়া সত্ত্বেও কর্তব্যবোধে সে লুজিনাকে শোবক পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। লুজিনা ছিল আমার-ই মত ভীষণ সুন্দরী। কিন্তু তার প্রতি তোমার ন্যায় সেই মুসলিম সৈনিকটিও ছিল নির্মোহ। আমার তো এখন নিশ্চিত মনে হচ্ছে, লুজিনার মত প্রয়োজনে আমিও তোমার জন্য জীবন দিতে পারব। আচ্ছা, নারীর প্রতি তোমরা এত নির্মোহ হও কি করে? এত সংযম তোমাদের শেখায় কে?

'ইসলাম। কু-চিন্তায় পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করাও ইসলামে নিষিদ্ধ। তাই নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ স্বাভাবিক হওয়া সত্ত্বেও আমরা সংযম অবলম্বন করে চলি।

ইসলামের প্রতি আমি নিবেদিতপ্রাণ বলেই ইজ্জত নিয়ে তুমি এ পর্যন্ত আসতে পেরেছ। অন্যথায় তোমার স্বজাতির দু' সৈনিকের মত আমিও রক্ত-মাংসের মানুষ। যৌনতাবোধ আছে আমারও। সেই ইসলামের-ই জন্য আমরা তোমাদের সঙ্গে লড়াই করছি। আর তোমরা আমাদের এই চরিত্রটা ধ্বংস করে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইছ!'

'আবেগের তাড়নায়-ই কিনা জানি না, আমার মনে হচ্ছে, এর আগেও কোথাও যেন আমি তোমাকে দেখেছি।' বলল আইওনা।

'দেখতে পার। মিসরে হবে হয়ত।' বলে আম্মাদ।

'মিসরে আমি গিয়েছি ঠিক, কিন্তু ওখানে তোমাকে দেখেনি।' বলেই মুচকি হেসে আইওনা জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা আমার ব্যাপারে তোমার ধারণা কি? আমি কি অতিশয় সুন্দরী নই?'

'তোমার রূপের কথা আমি অস্বীকার করি না। তোমার এ প্রশ্নের মর্ম আমার বুঝতে বাকী নেই। কিন্তু একজন নিবেদিতপ্রাণ ও কর্তব্যপরায়ণ মুসলমান কোন নারীর কাছে হার মানে না। হোক সে শত সুন্দরী। তা না হলে মুসলমান কেন? মুসলমান তো আর খৃষ্টানদের মত নয় যে, ধর্ম রক্ষার সৈনিক হওয়া সত্ত্বেও বিপদগ্রস্ত স্বজাতির এক মেয়েকে দেখামাত্র পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপর!

তাছাড়া–

আমার বয়স যখন তের-চৌদ্দ বছর। তখন খৃষ্টানরা আমার ছোট্ট একটি বোনকে আমাদের শোবকের বাড়ি থেকে অপহরণ করেছিল। তার বয়স ছিল তখন সাত বছর। এখন সে বেঁচে আছে কিনা জানি না। থাকলেও কোথায় কি অবস্থায় আছে জানা নেই। কোন আমীরের হেরেমে আছে নাকি তোমার-ই মত গুপ্তচরবৃত্তি করছে, তা আল্লাহ ভাল জানেন। তাই এখন যে মেয়েই আমার চোখে পড়ে, তাকেই আমার সেই বোন বলে মনে হয়। আমি কোন মেয়ের প্রতি কু-দৃষ্টিতে তাকাতে পারি না।

পাছে সে-ই যদি হয় আমার অপহৃতা বোন! তোমাকে আমি শোবক নিয়ে যাচ্ছি শুধু তোমার নিরাপত্তার জন্য। মরুভূমিতে একাকী ছেড়ে আসলে তোমার কি দশা হত, তা আমার জানা ছিল। তোমার স্বজাতির দু'জন সৈনিকই তো তার প্রমাণ রেখে গেল। আমি এখন অন্য জগতের মানুষ। মা-বোন আছে কিনা তুমি জানতে চেয়েছিলে। শোন, আমার মাকে খৃষ্টানরা খুন করেছে। সঙ্গে বড় এক ভাইকে। বোনের কথা তো বললাম। আমি প্রতিশোধের আগুনে পুড়ে মরছি। এখন এই মরু অঞ্চলে খৃষ্টান বাহিনীকে ধাওয়া করে ফিরতে আর ওদের রক্ত ঝরানোতে আমি শান্তি পাই। আমার সব সুখ এখন জড়ো হয়েছে এসে এখানে।

বিস্ময়াভিভূত নেত্রে আইওনা তাকিয়ে আছে আম্মাদের প্রতি। এক অতৃপ্তির ভাব ফুটে উঠেছে তার চোখে-মুখে। এ যাবত এমন কথা বলেনি কেউ তাকে। অশ্লীলতা আর বেহায়াপনার দীক্ষা-ই পেয়েছে সে। তার কথাবার্তা আর চালচলনে কর্মকর্তারা সৃষ্টি করেছে যৌনতার আকর্ষণ। বড় সুদর্শন এক ফাঁদ রূপে গড়ে তুলেছে তাকে। সতীত্বের মত মহামূল্যবান সম্পদ থেকে করেছে বঞ্চিত। দীক্ষা লাভ করার পর আইওনা নিজেকে পুরুষের হৃদয়-রাণী ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেনি। নিজের বাড়ি কোথায়, বাবা-মা কেমন ছিলেন, কিছু-ই তার মনে নেই। কিন্তু এখন আম্মাদের আবেগময় কথাগুলো আইওনার ব্যক্তিসত্ত্বায় তার নারীসুলভ অনুভূতিগুলো সজাগ করে দিয়েছে। গভীর এক ভাবনার জগতে ডুবিয়ে ফেলে সে নিজেকে। আম্মাদের উপস্থিতির কথাও মন থেকে হারিয়ে যায় তার।

ভাবনার জগতে নিজের হারানো অতীত হাতড়ে ফিরছে আইওনা। হঠাৎ বলে উঠে, আমার একটি ঘটনার কথা স্বপ্নের মত মনে পড়েছে। কোন এক সময় আমাকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বয়সটা তখন কত ছিল মনে নেই। দু'হাতে মাথার চুলে বিলি কাটে আইওনা। চুলগুলো মুঠি করে ধরে ঝাঁকুনি দেয় নিজের মাথাটা। অতীতের স্মৃতি স্মরণে আনার চেষ্টা করছে যেন সে। অবশেষে বিরক্ত হয়ে বলে উঠে, কিছু মনে পড়ছে না, ছাই! মদ, বিলাসিতা, বেহায়াপনা আর প্রতারণার বানে ভেসে গেছে আমার অতীত। আমার বাবা-মা কে ছিলেন, কেমন ছিলেন, আমি কখনো ভাবিনি; তাদের প্রয়োজনও পড়েনি কোনদিন। চেতনা বলতে কিছু-ই ছিল না আমার মধ্যে। পুরুষ যে বাপ-ভাইও হতে পারে, তা জানতাম না। পুরুষরা আমাকে মনে করে তাদের ভোগের সামগ্রী। রূপের ফাঁদে আটকিয়ে আমি তাদের ব্যবহার করি। আমার রূপ-যৌবনের নেশা যাকে মাতাল করতে ব্যর্থ হয়, তাকে ঘায়েল করি মদ আর হাশীশ দিয়ে। কিন্তু মোহাবিষ্ট মনের দুয়ারে আঘাত করা তোমার এই অশ্রুতপূর্ব কথাগুলো খুলে দিয়েছে আমার বিবেকের দ্বার। সজাগ করে দিয়েছে আমার

সুপ্ত নারীসুলভ অনুভূতিগুলো। নারী যে পুরুষের ভোগের সামগ্রী নয়, নারী যে প্রতারণার ফাঁদ নয়, নারীরও যে মা-বাবা, ভাই-বোন থাকতে পারে, মা-বোন-স্ত্রী হওয়া-ই যে নারীর প্রকৃত পরিচয়, তা আমি স্বচ্ছ আয়নার মত পরিষ্কার বুঝতে পারছি এখন।

অস্থিরতা বেড়ে-ই চলেছে আইওনার। থেমে থেমে কথা বলছে সে। এক সময়ে সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায় তার কণ্ঠ। হারানো অতীত আর বর্তমানের মাঝে শত পাকে যেন আটকে গেছে মেয়েটা। হাজার চেষ্টা করেও বেরই যেন হতে পারছে না সে। নিজের অতীতটা খুঁজে ধরে আনার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে আইওনা। কিন্তু না, পাচ্ছে না আর কিছু-ই।

'চল, রওনা হই'।

আম্মাদের কণ্ঠ শুনে প্রকৃতিস্থ হওয়ার চেষ্টা করে আইওনা। সহজ-সরল নিষ্পাপ বালিকার মত উঠে দাঁড়ায় সে। ঘোড়ায় চড়ে আম্মাদের পিছনে পিছনে এগুতে শুরু করে।

পার্বত্য অঞ্চল ছেড়ে বহুদূর এগিয়ে গেছে আম্মাদ ও আইওনা। আম্মাদের মুখপানে তাকিয়ে আছে মেয়েটি। হঠাৎ মুখে হাসি টেনে বলে উঠল, 'পুরুষের কথায় আর প্রতিশ্রুতিতে আমি কখনো বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এখন কেন যেন মনে হচ্ছে, আমার তোমার সঙ্গে যাওয়া-ই উচিত, বিষয়টা আমি বুঝতে পারছি না।'

আম্মাদ চোখ তুলে আইওনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে একটুখানি হাসল শুধু।

❁ ❁ ❁

পরদিন সূর্যোদয়ের সময় আইওনাকে নিয়ে আম্মাদ শোবকের প্রধান ফটকে এসে পৌঁছে। মরুভূমিতে কেটেছে তাদের আরো একদিন একরাত।

ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে তারা। এগিয়ে চলছে একটি গলিপথ ধরে।

একটি বাড়ির সামনে গিয়ে থেমে যায় আম্মাদ। ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে আইওনা। বাড়ির বন্ধদ্বারের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে ইতিউতি করে কি যেন দেখে নিয়ে খানিকক্ষণ ভেবে ঘোড়ায় বসে বসেই দরজায় নক্ করে আম্মাদ। দু'-তিনটি করাঘাতের পর খুলে যায় দরজা। ভিতরে সচকিত কৌতূহলী দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে এক বৃদ্ধ।

'এখানে কে থাকে?' বৃদ্ধকে আরবী ভাষায় জিজ্ঞেস করে আম্মাদ।

'কেউ নয়। বাস করত একটি খৃষ্টান পরিবার। সুলতান আইউবীর শোবক দখলের পর তারা স্বপরিবারে পালিয়ে গেছে।' জড়তামাখা কণ্ঠে জবাব দেয় বৃদ্ধ।

'তারপর আপনি বাড়িটি দখল করে নিয়েছেন, তাই না?'

শোবক দখল করার পর সুলতান আইউবী হুকুম জারি করেছিলেন যে, কোন খৃষ্টান

যেন কোন মুসলমানের হাতে কষ্ট না পায়। অন্যথায় তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। আর এখন কিনা বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে তারই একজন সৈনিক এক বৃদ্ধের কাছে জবাব চাইছে, খৃষ্টানদের বাড়ি কেন দখল করল সে!

ভয় পেয়ে যায় বৃদ্ধ। কাঁপা কণ্ঠে বলে, 'না, দখল করিনি; বাড়িটি পাহারা দিচ্ছি শুধু। আপনি বললে বাড়িটি বন্ধ করে আমি চলে যাব, আর আসব না। বাড়ির মালিক এখনো বেঁচে আছেন। তিনি মুসলমান। পনের-ষোল বছর ধরে তিনি বেগার ক্যাম্পে পড়ে আছেন।'

'কেন, আমীরে মেসের কি ক্যাম্প থেকে তাদের মুক্ত করেননি? জানতে চায় আম্মাদ।

'ওখানকার মুসলমানরা তো এখন স্বাধীন। কিন্তু এখনো তারা ক্যাম্পে-ই আছে। সুলতান আইউবী আপাতত ওখানেই তাদের জন্য উন্নত থাকা-খাওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বেশ ক'জন অভিজ্ঞ ডাক্তার তাদের চিকিৎসা করছেন। যখন-ই যার শরীর ঠিক হয়ে যাচ্ছে, পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে তাকে নিজ বাড়িতে। এখনও যারা আছেন, আত্মীয়-স্বজনরা অবাধে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছে, খোঁজ-খবর নিচ্ছে। এ বাড়ির মালিকও সেখানে আছেন। লোকটি একে তো বৃদ্ধ, তদুপরি পনের-ষোল বছরের নির্যাতনে ক্লিষ্ট। বেচারা বেঁচে-ই আছেন শুধু। হাড্ডিসার-কংকাল তার দেহ। আমি তাকে মাঝে-মধ্যে দেখে আসি। আশা করি, সুস্থ হয়ে যাবেন। বাড়িটা খালি হয়েছে, তা আমি তাকে জানিয়ে দিয়েছি।'

'তার আত্মীয়-স্বজন কোথায়?' জিজ্ঞেস করে আম্মাদ।

'কেউ বেঁচে নেই। ঐ যে তিনটি বাড়ির পরে যে বাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন, ওটি আমার। আত্মীয়তার বন্ধন না থাকলেও আমাকেই তার আপনজন বলতে পারেন।' জবাব দেয় বৃদ্ধ।

ভিতরে কোন মহিলা নেই জেনে নিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ভিতরে ঢুকে পড়ে আম্মাদ। ঘুরে ঘুরে দেখে বাড়ির কক্ষগুলো। হাত বুলায় দেয়ালে। আইওনাও তার সঙ্গে। লুকিয়ে লুকিয়ে চোখ মুছে আম্মাদ। কিন্তু আইওনার নজরে পড়ে যায় বিষয়টি। কান্নার কারণ জানতে চায় আইওনা। রুদ্ধ কণ্ঠে আম্মাদ বলে, 'আমি আমার শৈশব খুঁজছি। এটি আমার বাড়ি। এ ঘর থেকেই আমি পালিয়েছিলাম। দু' চোখ গড়িয়ে অশ্রু ঝরতে শুরু করে আম্মাদের। অশ্রুভেজা চাঁপা কণ্ঠে সে বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, লোকটির স্বজনরা কি সবাই মারা গেছে? তার কি ছেলে-মেয়ে নেই কেউ?'

'একটি পুত্র বেঁচে ছিল। খৃষ্টান দস্যুদের কবল থেকে রক্ষা পেয়ে সে আমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। আমি তাকে সিরিয়া পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এখানে থাকলে তাকেও জীবন দিতে হত।' জবাব দেয় বৃদ্ধ।

আম্মাদ এখন নিশ্চিত, এটি-ই তাদের বাড়ি। ষোল বছর আগে যার ঘরে আশ্রয় নিয়ে জীবন রক্ষা করেছিল, ইনি-ই তিনি। এ বাড়ির মালিক বলে যার পরিচয় দেয়া হয়েছে, তিনি-ই তার পিতা।

কিন্তু নিজের পরিচয় গোপন রাখে আম্মাদ। বাড়ির মালিকের সেই পুত্রের সঙ্গে-ই যে কথা হচ্ছে, সে-ই যে এখন সামনে দাঁড়িয়ে, বৃদ্ধকে তা বুঝতে দেয়নি আম্মাদ। এমনি এক পরিস্থিতিতে আবেগ ধরে রাখা ভারী কষ্টকর, বলা যায় অসম্ভব। আম্মাদের হৃদয়ও আবেগে উদ্বেলিত হয়ে আসে। দুনিয়ার কান্না এসে জড়িয়ে ধরে তাকে। কিন্তু আম্মাদ কঠিন-প্রাণ এক সৈনিক। আবেগ পরাজিত হয় তার বীরত্বের কাছে। নিজেকে সামলিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বৃদ্ধকে বলে, 'আমি এ বাড়ির মালিকের সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাই। নামটা কি তার বলুন।'

বাড়ির মালিকের নাম বলেন বৃদ্ধ। পিতার নাম জানা ছিল আম্মাদের। শুনে আরেকবার রুদ্ধ হয়ে আসে আম্মাদের কণ্ঠ।

'ছেলেটার এক বোন ছিল। বয়স বোধ করি সাত হবে। তাকেও তুলে নিয়ে যায় পাষন্ড খৃষ্টানরা। তার সূত্র ধরেই পরিবারের সবাইকে জীবন দিতে হল ক্রুসেডারদের হাতে।' বললেন বৃদ্ধ।

'আইওনা! 'চাঁদ তারকা'র উপর 'পবিত্র ক্রুশে'র নির্মমতার কাহিনী শুনছ তো?' মেয়েটির প্রতি দৃষ্টিপাত করে কটাক্ষ করে আম্মাদ।

কোন জবাব দেয় না আইওনা। উপর দিকে মাথা তুলে ছাদ দেখছে সে। ছাদ থেকে চোখ নামিয়ে ছুটে যায় সে একটি কক্ষের দরজার কাছে। দরজার একটি কপাট বন্ধ করে উল্টো পিঠে কি যেন দেখে আইওনা। কপাটে গভীর করে খোঁদাই করা ছোট ছোট তিন-চারটি দাগ। বসে পড়ে গভীর মনোযোগ সহকারে নীরিক্ষা করে রেখাগুলো দেখতে শুরু করে আইওনা। আম্মাদ তাকিয়ে আছে সেদিকে। রেখাগুলোয় হাত বুলাচ্ছে আইওনা। এবার উঠে সে চলে যায় আরেক কক্ষে। বড় ব্যস্ত দেখাচ্ছে আইওনাকে। সেখানেও দরজার পাল্লায় কি যেন হাতড়াতে শুরু করে সে। কৌতূহল জাগে আম্মাদের মনে। করছে কি মেয়েটি! ছুটে যায় আইওনার নিকট। জিজ্ঞেস করে, 'অমন করে দেখছ কি তুমি?'

মুখে হাসি টেনে আইওনা বলে, 'তোমার মত আমিও আমার শৈশব খুঁজছি।' বলেই সে আম্মাদকে জিজ্ঞেস করে, 'এটি কি তোমাদের বাড়ি ছিল? তুমি কি এ বাড়ি থেকে-ই পালিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, আমি এখান থেকেই পালিয়েছিলাম।' এই বলে আম্মাদ কিভাবে তার বোন অপহৃতা হয়েছিল, কিভাবে তাদের ঘরে খৃষ্টানরা আক্রমণ করেছিল, কিভাবে খৃষ্টানরা তার মা ও ভাইকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল, সব ঘটনা আইওনাকে জানায়। খানিক পূর্ব পর্যন্তও আম্মাদের ধারণা ছিল, তার পিতাও বুঝি হায়েনাদের শিকারে পরিণত হয়ে

নিহত হয়েছেন। কিন্তু এই বৃদ্ধ বলছেন, তিনি নাকি জীবিত আছেন।

'তুমি কি বৃদ্ধকে বলেছ যে, তিনি যাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তুমি-ই সেই ছেলে?' আইওনার মনে কৌতূহল।

'না, এখন-ই সেকথা বলতে চাই না।' জবাব দেয় আম্মাদ।

কিন্তু আম্মাদের মনে দোদুল্যমানতার ভাব। একবার ইচ্ছে হয়, পরিচয়টা দিয়েই ফেলি। আবার বলে, না, এখন থাক।

আম্মাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আইওনা। তার সাত বছর বয়সের চেহারাটা হৃদয়পটে ধরে আনার প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে। কিন্তু পারছে না। সেই ষোল বছর আগের কথা। আইওনার বয়স তখন মাত্র সাত বছর।

দু'টি ছেলে-মেয়ের অস্বাভাবিক কান্ড দেখে বিহ্বলের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ। এই ঘরে এরা করছে কি, এই তার কৌতূহল। কি খুঁজে ফিরছে দু'জনে, তাও তিনি বুঝতে পারছেন না। অবশেষে জিজ্ঞেস করে, 'বলুন, আমার জন্য কি হুকুম?'

বৃদ্ধের প্রতি চকিতে ফিরে তাকায় আম্মাদ। আদেশের সুরে বলে, 'আপনি-ই বাড়িটি দেখা-শুনা করুন। আপাতত এটি আপনার দায়িত্বে রইল। আম্মাদ আইওনার প্রতি তাকিয়ে বলে, 'চল, এবার যাই।'

'কেন, পিতার সঙ্গে দেখা করবে না?' জিজ্ঞেস করে আইওনা।

আগে কর্তব্য পালন করে নিই। মরুভূমিতে আমায় খুঁজে ফিরছেন কমাণ্ডার। না পেয়ে এতদিনে তিনি হয়ত আমাকে মৃত ঘোষণা করেই দিয়েছেন। ওখানে আমার বড্ড প্রয়োজন। চল, জল্‌দি আস। আগে এই আমানত কাউকে বুঝিয়ে দিয়ে আসি। আইওনার প্রতি ইংগিত করে সহাস্যে বলল আম্মাদ।

নারী, নারী, নারী।

বদ্‌মাশ খৃষ্টানরা পেয়েছেটা কি? ওরা কি আমার চলার পথে নারীর প্রাচীর দাঁড় করাতে চায়? আমার সম্মুখে মেয়েদের নাচিয়ে কি তারা শোবক দুর্গ পুনর্দখল করতে চায়?' গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ানের উদ্দেশে বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

'না, আমীরে মোহ্‌তারাম! এরা দেয়াল নয়– এরা হচ্ছে উঁইপোকার দল। এরা উঁইপোকার ভূমিকা-ই পালন করছে। কাগজ কেটে টুকরো টুকরো করার ন্যায় মুসলিম জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য ও চরিত্র-ব্যক্তিত্ব কুরে কুরে খাওয়ার জন্য এদেরকে লেলিয়ে দিয়েছে খৃষ্টানরা। আপনার ও নুরুদ্দীন জঙ্গীর মাঝে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করার অপপ্রয়াস এই মেয়েদের-ই মাধ্যমে ঘটাতে চাচ্ছে। এরা হাশীশ আর মদ দ্বারা হাত করে নিয়েছে আমাদের মুসলিম শাসক ও আমীরদের।'

'যাক্ গে ওসব। এই মেয়েগুলোর ব্যাপারে আমায় কিছু বল। এরা আটজনই যে

গোয়েন্দা, তা তো প্রমাণিত। এদের থেকে এ যাবত নতুন কোন তথ্য পাওয়া গেছে কি?' জিজ্ঞেস করলেন সুলতান আইউবী।

এদের থেকে এ পর্যন্ত যতটুকু উদ্ধার করতে পেরেছি, তা হল শোবকে এখনো বেশ কিছু খৃষ্টান গোয়েন্দা ও সন্ত্রাসী আছে। কিন্তু তাদের নাম-ঠিকানা পাওয়া যায়নি। এদের তিনজন নাকি মিসরে কিছু সময় কাটিয়ে এসেছে।'

'ওরা আছে কোথায়? কয়েদখানায়?' জানতে চাইলেন সুলতান আইউবী।

'না, ওদেরকে ওদের-ই আগের জায়গায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। বাড়ির চারদিকে কঠোর প্রহরার ব্যবস্থা করেছি।' জবাব দেন আলী বিন সুফিয়ান।

ঠিক এ সময়ে কক্ষে প্রবেশ করে দারোয়ান। সালাম করে বলে, আম্মাদ শামী নামক এক প্লাটুন কমাণ্ডার এসেছেন। সঙ্গে তাঁর একটি খৃষ্টান মেয়ে। মেয়েটিকে নাকি তিনি কার্কের পথ থেকে ধরে এনেছেন। মেয়েটি গুপ্তচর।

'দু'জনকেই ভেতরে পাঠিয়ে দাও।' বললেন সুলতান আইউবী।

বেরিয়ে যায় দারোয়ান। ভেতরে প্রবেশ করে আম্মাদ ও আইওনা। আম্মাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সুলতান বললেন, 'বোধ হয় তুমি বহু দূর থেকে এসেছ। তা আছ কার সঙ্গে?'

আমি সিরীয় বাহিনীতে আছি। আমার কমাণ্ডারের নাম এহতেশাম বিন মুহাম্মদ। আমি 'আল-বারক্' প্লাটুনের দায়িত্বশীল।

'আল-বারক্' কি হালে আছে?' বলেই আম্মাদের জবাবের অপেক্ষা না করে সুলতান আইউবী আলী বিন সুফিয়ানের প্রতি তাকিয়ে বললেন, 'আল-বারক্' আসলেই বিদ্যুৎ। সুদানীদের উপর যখন আমরা কমান্ডো আক্রমণ চালিয়েছিলাম, তখন নেতৃত্বে ছিল এই আল-বার্ক। মরু অঞ্চলে গেরিলা আক্রমণে এদের জুড়ি নেই।' থামলেন আইউবী।

'মহান সেনাপতি! বাহিনীর সব ক'জন সৈনিক আল্লাহর পথে জীবন কোরবান করেছে। বেঁচে আছি আমি একা।' সুলতানের প্রশ্নের জবাব দেয় আম্মাদ।

'এতগুলো জীবন নষ্ট করনি তো আবার? মৃত্যুবরণ আর কোরবান কিন্তু এক নয়; দু'য়ের মাঝে বিস্তর ব্যবধান। তা বুঝ তো?'

'না, নষ্ট করিনি মাননীয় সেনাপতি! আল্লাহ সাক্ষী, আমাদের এক একটি জীবনের বিনিময়ে আমরা শত্রু বাহিনীর অন্ততঃ বিশ বিশটি জীবন খেয়েছি। গুটিকতক আহত সৈনিক ছাড়া ওদের কেউ গন্তব্যে পৌঁছতে পারেনি। ক্রুসেড বাহিনীর রক্তে লাল করে দিয়েছি আমরা ফিলিস্তীনের মাটি। আমাদের অপরাপর বাহিনীগুলোও শত্রু বাহিনীর উপর প্রলয় সৃষ্টি করেছে। সহসা পরবর্তী লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার শক্তি শেষ হয়ে গেছে তাদের।' দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে জবাব দেয় আম্মাদ।

'আর তুমি?' মেয়েটির প্রতি মুখ ঘুরিয়ে সুলতান বললেন, 'লুকোচুরি না করে নিজের সব কথা খুলে বল, ভাল হবে।'

'বলব, সব বলব, যা জানি একেবারে সমস্ত।' বলেই ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেলে আইওনা।

'আম্মাদ শামী! তুমি ফৌজি বিশ্রামাগারে চলে যাও। নাওয়া-খাওয়া করে আরাম কর। আগামীকাল তোমার বাহিনীতে গিয়ে যোগ দিতে হবে।' সুলতান বললেন।

'আমি শত্রু বাহিনীর দু'টি ঘোড়া আর দু'টি তরবারী নিয়ে এসেছিলাম।' বলল আম্মাদ।

'ঘোড়া দু'টো আস্তাবলে আর তরবারীগুলো অস্ত্রাগারে জমা দাও।' বলে খানিক কি যেন ভেবে নিয়ে সুলতান পুনরায় বললেন, এর মধ্যে তোমার ঘোড়া অপেক্ষা ভাল ঘোড়া থাকলে বদল করে নাও। আর শোন, বাইরের রণাঙ্গনের ঘোড়াগুলোর অবস্থা কি?'

চিন্তার কারণ নেই মহান সেনাপতি! আমাদের একটি ঘোড়া নষ্ট হলে আমরা শত্রুর দু'টি পেয়ে যাই।' জবাব দেয় আম্মাদ।

সালাম করে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায় আম্মাদ। তার আমানত যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছে সে। এদিক থেকে তো আম্মাদ এখন সম্পূর্ণ দায়মুক্ত। কিন্তু তার হৃদয়জুড়ে জগদ্দল পাথরের মত জেঁকে বসে আছে যে অন্য কতগুলো বোঝা! সে বোঝা আবেগের। সে বোঝা শৈশব-স্মৃতির। সে বোঝা পিতার ভালবাসার। স্থির হতে পারছে না আম্মাদ। মনটা কেমন যেন ব্যাকুল হয়ে উঠে তার। পিতৃস্নেহ এবং হৃদয়ের পুরণো ক্ষত কর্তব্য পালনের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, এ আশংকায় পিতার সঙ্গে এখুনি দেখা করতে চাইছে না আম্মাদ।'

আম্মাদ নিজের ঘোড়ার পিছনে অপর দু'টি ঘোড়া বেঁধে নিয়ে আস্তাবল অভিমুখে আনমনে এগিয়ে চলেছে। আশপাশের কোন খবর নেই তার। ভাবাবেগে একেবারে মুষড়ে পড়েছে আম্মাদ।

'পথ ছেড়ে দাঁড়াও আরোহী!'

পিছন থেকে ভেসে আসা কারো কণ্ঠস্বরে মোহ ভাঙ্গে আম্মাদের। চৈতন্য ফিরে আসে তার। মাথা ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকায় সে। ছোট্ট একটি অশ্বারোহী সেনাদল এগিয়ে আসছে এদিকে। রাস্তার একধারে সরে ঘোড়া থামায় আম্মাদ। বাহিনীর একেবারে সামনের আরোহী আম্মাদের নিকট এসে থেমে যায়। দাঁড়িয়ে যায় পুরো কাফেলা। সম্মুখের আরোহী আম্মাদকে জিজ্ঞেস করে, তুমি বাইরে থেকে এসেছ? ওখানকার খবর কি?

'আল্লাহর রহমতে সব ভাল দোস্ত! কচুকাটা হচ্ছে শত্রু বাহিনী। আপাতত শোবকের ব্যাপারেও কোন আশংকা নেই।'

এগিয়ে চলে বাহিনী। ডান দিকে মোড় নিয়ে ঘোড়া হাঁকায় আম্মাদ।

❁ ❁ ❁

'আমি আপনার নিকট কিছুই গোপন রাখিনি।'

সুলতান সালাহুদ্দীন ও আলী বিন সুফিয়ানের সামনে বসে কথা বলছে আইওনা। সে যে গোয়েন্দা, তা-ও সে বলে দিয়েছে। একথা-ও জানিয়েছে যে, কায়রোতে সে একমাস ডিউটি করে এসেছে। কায়রোতে আইউবী বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত ছিল, এমন কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক মুসলমানের নাম বলেছে আইওনা। আইওনা আরো জানায়, সুদানীরা খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে বিপুল সহযোগিতা পাচ্ছে এবং খৃষ্টান বাহিনীর অভিজ্ঞ কমান্ডো সুদানীদের কমান্ডো আক্রমণের প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছে।

কোন রকম জিজ্ঞাসাবাদ করার আগেই আইওনা এমন সব তথ্য বলে দেয়, যা নির্যাতনের মুখেও গোয়েন্দাদের নিকট থেকে আদায় করা যায় না। সন্দেহে পড়ে যান আলী।

'আইওনা! আমিও তোমার বিদ্যায় পারদর্শী। আমি স্বীকৃতি দিচ্ছি যে, তুমি একজন উঁচু স্তরের গুপ্তচর। আমাদের জেল-শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তুমি যে পন্থা অবলম্বন করেছ, তা প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু আমি তো আর তোমার এ প্রতারণার ফাঁদে পা দিতে পারি না।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'আপনার নাম?' জিজ্ঞেস করে আইওনা।

'আলী বিন সুফিয়ান। তুমি হরমুনের নিকট থেকে আমার নাম শুনে থাকবে হয়ত।' জবাব দেন আলী।

হঠাৎ চমকে উঠে আইওনা। বসা থেকে উঠে দাঁড়ায় সে। ধীরে ধীরে আলী বিন সুফিয়ানের কাছে গিয়ে হাটু গেড়ে বসে। আলীর ডান হাতটা নিজের মুঠোয় নিয়ে চুমো খায় আইওনা। আলীর মুখপানে তাকিয়ে বলে, 'আপনাকে জীবিত দেখে আমার ভীষণ আনন্দ লাগছে। আপনার সম্বন্ধে আমি অনেক কিছু শুনেছি। হরমুন বলতেন, আলী বিন সুফিয়ান মরে গেলে মুসলমানদের বুকে বসেই বিনা যুদ্ধে আমরা তাদের পতন ঘটাতে পারব।'

উঠে গিয়ে নিজ জায়গায় বসে আইওনা। বলে–

'কায়রোতে আমি আপনাকে দেখার অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু পাইনি। আমার উপস্থিতিতে আপনাকে হত্যা করার পরিকল্পনা আঁটা হয়েছিল। সে অভিযান সফল হল কি না পরে আর আমি জানতে পারিনি। আমাকে ডেকে পাঠান হয়েছিল শোবকে।'

'তুমি যা কিছু বলেছ, তার সব যে সত্য, আমরা তা বিশ্বাস করি কি করে?' জানতে চান আলী।

'আপনি আমায় কেন বিশ্বাস করছেন না?' বলে আইওনা।

'কারণ, তুমি খৃষ্টান।' পাশের থেকে বললেন সুলতান আইউবী।

'আমি যদি বলি, আমি খৃষ্টান নই– মুসলমান, তবে তখনও কি আপনারা বলবেন, বাপু! এটিও তোমার মিথ্যে কথা? আমার নিকট তো কোন প্রমাণ নেই! ষোল-সতেরটি বছর কেটে গেছে, আমি এই পল্লী থেকে অপহৃতা হয়েছিলাম। এখানে এসে জানতে পারলাম, আমার পিতা ক্যাম্পে আছেন।'

পিতার নাম বলে আইওনা। এ-ও জানায় যে, পিতার নামটি তার মনে ছিল না, এখানে এসে জানতে পেরেছে। মরুভূমিতে হায়েনার হাত থেকে আম্মাদ কিভাবে তার জীবন-সম্ভ্রম রক্ষা করেছে, রাতে তার আম্মাদকে হত্যা করার প্রচেষ্টা, আম্মাদকে হত্যা করার জন্য তার খঞ্জরধারী হাত না উঠা ইত্যাদি সব ঘটনার আনুপুংখ বিবরণ দেয় আইওনা। বলে–

দিনের বেলা আম্মাদের মুখমন্ডল ও চোখের প্রতি নজর পড়লে আমার হৃদয়ে এমন এক অনুভূতি জেগে উঠে, যা আমাকে সংশয়ে ফেলে দেয় যে, লোকটিকে আমি আগেও কোথায় যেন দেখেছি। ও যেন আমার পরিচিত লোক। কিন্তু কোথায় দেখেছি, কখন দেখেছি, কিভাবে পরিচয় তার কিছু-ই স্মরণ আসল না। আমার এ সন্দেহের কথা তার নিকট ব্যক্ত করলে সে বলল, না এমনটি হতে পারেনা; তুমি আমায় দেখবে কোথায়! রাতে দু'জন খৃষ্টান সৈনিক আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওরা আমার সম্ভ্রম লুট করতে চেয়েছিল। আমার চীৎকার শুনে আম্মাদ ঘুম থেকে জেগে উঠে। আমাকে রক্ষা করার জন্য সে এগিয়ে আসে। বর্শার আঘাতে হত্যা করে ফেলে একজনকে। তখন পর্যন্ত আমি নিজেকে খৃষ্টান-ই মনে করতাম। ক্রুশের নিবেদিতপ্রাণ এক কর্মী ছিলাম আমি। কিন্তু এ মুহূর্তে আমার ভাবান্তর ঘটে যায়। যে জাতির সৈনিকেরা স্বজাতির এক অসহায় নারীর ইজ্জতে আঘাত হানতে পারে, তারা অমানুষ, মানুষ নামের কলংক। আমার হৃদয়ে প্রচন্ড ঘৃণা জন্মে যায় খৃষ্টানদের প্রতি।

হাতে ছিল আমার খঞ্জর। এক আঘাতে মাটিতে ফেলে দিলাম অপরজনকে। আম্মাদ আমার ইজ্জত রক্ষা করেছে, তাতে আমার যা আনন্দ, তারচে' বেশী প্রীত আমি আমার খঞ্জরাঘাত থেকে আম্মাদ রক্ষা পাওয়ায়। আহ! কি যে হত যদি আম্মাদকে আমি খুন করেই ফেলতাম!'

আইওনা আরো বলে–

'চলার পথে আম্মাদের মুখনিসৃত আবেগময় কিছু কথা শুনে আমি আরো আপ্লুত হয়ে পড়ি। আমার চেতনার দুয়ারে আঘাত করে তার কথাগুলো। সমস্ত পথে আমি তার মুখপানেই তাকিয়ে থাকি। আমার মনে পড়ে যে, শৈশবে আমাকে অপহরণ করা হয়েছিল। কিন্তু এই স্মৃতি আরো অস্থির করে তুলে আমাকে।

আপনাদের নিশ্চয় জানা আছে যে, আমার মত মেয়েদেরকে কিভাবে প্রস্তুত করা হয়। প্রশিক্ষণের পর শৈশবের স্মৃতি আর নিজের মৌলিক পরিচয় মুছে যায় মন

থেকে। আমারো হয়েছে একই হাল। কিন্তু আমার সংশয় ক্রমেই দূর হয়ে যায়। নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হল যে, আম্মাদকে আমি জানি। এ ছিল রক্তের টান। আমার চোখ চিনে নিয়ে নিয়েছে আম্মাদের চোখকে আর হৃদয় চিনেছে হৃদয়কে।

বোধ হয় আম্মাদের হৃদয়েও এমনি এক অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল। হয়ত সে কারণেই সে আমার ন্যায় হৃদয়কাড়া এক যুবতীকে হাতের কাছে পেয়েও বিন্দুবিসর্গ ভ্রুক্ষেপ করেনি, যেন আমি তার সঙ্গে-ই নেই। বহুবার গভীর দৃষ্টিতে সে আমার প্রতি তাকিয়েছিল বটে, তবে সে দৃষ্টি ছিল পবিত্র, তাতে লালসার লেশমাত্র ছিল না।'

বলেই চলেছে আইওনা।

'শোবকে প্রবেশ করে খানিকটা অগ্রসর হয়ে একটি বাড়ির সামনে এসে থেমে যায় আম্মাদ। দু'জনে ভিতরে প্রবেশ করলাম। বাড়িটি ভিতর থেকে দেখামাত্র ধীরে ধীরে আমার মনের পর্দা অপসারিত হতে শুরু করে। কেমন যেন মনে হল, এ বাড়িটি আমি চিনি। আস্তে আস্তে চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল শৈশবের হারানো স্মৃতি।

বাড়িটি ঘুরে-ফিরে দেখলাম। মনে আমার প্রচন্ড কৌতূহল। হঠাৎ কে যেন চোখের সামনে মেলে ধরে শৈশব-স্মৃতির আরেকটি পাতা। দৌড়ে গেলাম একটি কক্ষের দরজার কাছে। দরজার একটি পাল্লার উল্টো পিঠ নিরীক্ষা করে দেখলাম। কতগুলো রেখা চোখে পড়ল। মনে পড়ল, বড় ভাইয়ার খঞ্জর দ্বারা ছোটকালে আমি-ই এগুলো এঁকেছিলাম। ছুটে গেলাম আরেকটি দরজার পিছনে। সেখানেও একই রকম আঁকিবুকি খুঁজে পেলাম। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম আম্মাদের প্রতি। মুখজোড়া একরাশ ঘন দাঁড়ি থাকা সত্ত্বেও তার ষোল-সতের বছর আগের আকৃতি মনে পড়ে যায় আমার। বুক ফেটে কান্না আসে। উচ্ছ্বসিত আবেগে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। বহু কষ্টে ধরে রাখলাম নিজেকে। আম্মাদকে বলিনি, আমি যে তার বোন। সাহস পাইনি। কত পূত-পবিত্র চরিত্রবান পুরুষ সে, আর আমি আপাদমস্তক একটি নাপাক মেয়ে! ও কত আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষ আর আমার মর্যাদাবোধ বলতে কিছু নেই! বললে জানি না ওর প্রতিক্রিয়া কি হত।'

থামল আইওনা।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ান তন্ময় হয়ে শুনছিলেন আইওনার আবেগঝরা কথাগুলো। এ সময়ে আলী বিন সুফিয়ান বেশ ক'বার চোখ তুলে তাকান আইউবীর প্রতি। আইওনার প্রতি সন্দেহ তার দূর হয়নি এখনো। কিন্তু মেয়েটির আবেগময় কণ্ঠ, উদগত অশ্রুধারা ও অপ্রতিরোধ্য দীর্ঘশ্বাস দু'জনকে প্রভাবিত করে ফেলে, তার প্রতিটি কথা-ই সত্য।

আইওনা বলে, 'এত কিছুর পরও যদি আমাকে বিশ্বাস করতে আপনাদের কষ্ট হয়,

তাহলে বিষয়টি আপনারা তদন্ত করে দেখুন। তাতে যদি আমি মিথ্যুক প্রমাণিত হই, তবে আমার সঙ্গে আপনারা যেমন ইচ্ছা আচরণ করুন। দুনিয়ার প্রতি আমার আর কোন আকর্ষণ নেই; আমি আর একদন্ডও বেঁচে থাকতে চাইনা। তবে আপনাদের অনুমতি পেলে আমি একটা কাজ করে পাপের বোঝা হালকা করে মরতে চাই।'

'কি করতে চাও তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন সুলতান আইউবী।

'আপনি যদি নিরাপদে আমাকে কার্ক পৌঁছিয়ে দেন, তা হলে খৃষ্টানদের তিন-চারজন সম্রাট এবং গোয়েন্দা প্রধান হরমুনকে হত্যা করতে পারি।' বলল আইওনা।

'আমরা তোমাকে কার্ক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে পারি বটে, কিন্তু কাউকে খুন করার জন্য নয়। ইতিহাসের পাতায় আমি এ অপবাদ লিখিয়ে মরতে চাই না যে, সালাহুদ্দীন আইউবী নিজে শোবকে বসে থেকে একজন নারীকে দিয়ে শত্রু নিধন করেছিল। আমি তো বরং যদি জানতে পাই যে, একজন খৃষ্টান সম্রাট দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে কষ্ট পাচ্ছে, তাহলে তার চিকিৎসার জন্য আমি ডাক্তার পাঠিয়ে দেব। তা ছাড়া তোমার উপর ভরসাও করতে পারি না। তবে তুমি চাইলে ক্ষমা করে তোমাকে নিরাপদে কার্ক পৌঁছিয়ে দেয়া যায় কিনা, ভেবে দেখতে পারি।' বললেন সুলতান আইউবী।

'না। অন্তরে সেই সুখ আমার নেই। কার্ক আর আমার যেতে হবে না। যেখানে জন্মেছি, সেখানে-ই আমার মৃত্যু হোক, এই আমার কামনা। আমি যে আম্মাদের হারিয়ে যাওয়া বোন, তা ওকে বলবেন না যেন। ক্যাম্পে বাবার সঙ্গে আমি সাক্ষাত করব, তবে তাকেও জানাব না, আমি তার অপহৃতা কন্যা।' এই বলে ফুঁফিয়ে কাঁদতে শুরু করে আইওনা। অশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে আসে তার দু'চোখ। বড় বড় অশ্রুফোঁটা টপ্‌টপ্ করে ঝরে পড়তে লাগল তার দু'গন্ড বেয়ে।

আলী বিন সুফিয়ান প্রয়োজনীয় অনেকগুলো কথা জিজ্ঞেস করেন আইওনাকে। তারপর আইউবীর প্রতি মুখ ফিরিয়ে বলেন, একে কোথায় পাঠাব? কিছুক্ষণ চিন্তা করে সুলতান বললেন, একে সসম্মানে আরামে রাখতে হবে। ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নাও।

আইওনাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যান আলী। আইউবীর শোবক দখলের আগে খৃষ্টানদের গোয়েন্দা মেয়েরা যে কক্ষে থাকত, তার একটি কক্ষে থাকতে দেন তাকে। কিন্তু এখানে থাকতে অস্বীকৃতি জানায় আইওনা। বলে, 'এই কক্ষগুলোকে আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি। আমি যে বাড়িটি থেকে অপহৃত হয়েছিলাম, আমাকে কি সেখানে থাকতে দেয়া যায় না?

'না, আবেগের বশবর্তী হয়ে আমি নিয়ম লংঘন করতে পারি না।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

প্রহরী ও চাকর-বাকরদের জরুরী উপদেশ দিয়ে আইওনাকে ওখানেই রেখে আসেন আলী।

সেনা বিশ্রামাগারে গিয়ে গা-গোসল সেরে খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ে আম্মাদ। কিন্তু এত ক্লান্তি সত্ত্বেও কিছুক্ষণ পর হঠাৎ চোখ খুলে যায় তার। শত চেষ্টা করেও দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না আর সে। পিতার সঙ্গে সাক্ষাত করবে কি করবে না– এই একটি প্রশ্ন তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে তার মাথায়।

ক্লান্তি ঝেড়ে শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় আম্মাদ। হাঁটা দেয় ক্যাম্পের দিকে। ক্যাম্পে পৌঁছে পিতার নাম উল্লেখ করে লোকটি কোথায় আছে জিজ্ঞেস করে সে। খুঁজে বের করে পিতাকে।

আম্মাদের সামনে শুয়ে আছেন এক বৃদ্ধ। সালাম করে মাথা নুইয়ে তার সঙ্গে হাত মিলায় আম্মাদ।

ষোলটি বছর পর পিতাকে দেখল আম্মাদ। বৃদ্ধের গায়ে গোশ্‌ত নেই। আছে শুধু হাড্ডি আর চামড়া– যেন পূর্ণাঙ্গ একটি মানব-কংকাল পড়ে আছে তার সামনে। এখন পুষ্টিকর খাদ্য ও ঔষধপত্র চলছে।

নিজের পরিচয় না দিয়ে পিতা কেমন আছেন জানতে চায় আম্মাদ। জবাবে বৃদ্ধ বললেন, কেমন আর থাকব? ষোলটি বছরের নির্মম নির্যাতন, এতদিনের দীর্ঘ বন্দী জীবন আর পুত্র-কন্যার শোক আমাকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। এই ধকল বোধ হয় কেটে উঠা আমার সম্ভব হবে না। এত উন্নত খাবার আর উন্নত চিকিৎসা এতটুকু ক্রিয়াও করছে না। আমি সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছি।

ক্ষীণ কণ্ঠে নিজের অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয় আম্মাদের পিতা। কিন্তু আম্মাদ চলে যায় ষোল বছর পিছনে। চোখের সামনে ধরে আনে সে সময়কার পিতার চেহারা। সেকি নাদুস-নুদুস স্বাস্থ্যবান এক বলিষ্ঠ পুরুষ। আর এখন? তবু এই হাড্ডিসার কংকাল চেহারাও পিতাকে চিনতে পারে আম্মাদ।

আম্মাদ একবার ভাবে, নিজের পরিচয় দিয়ে বলি, আমি আপনার পালিয়ে যাওয়া সেই পুত্র আম্মাদ। আবার ভাবে– না এত বড় শুভ সংবাদের ধাক্কা তিনি হয়ত সামলাতে পারবেন না। পারলেও তিনি আমার কর্তব্যের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারেন। বড় কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে পিতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফিরে আসে সে।

বিশ্রামাগারে শুয়ে আছে আম্মাদ। আগামী দিন ভোর পর্যন্ত ছুটি আছে তার। তারপর চলে যেতে হবে ময়দানে। কিন্তু হঠাৎ কেন্দ্র থেকে নির্দেশ আসে, পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে এখানেই থাকতে হবে। সর্বদা বিশ্রামাগারে উপস্থিত থাকতে হবে। বিস্মিত হয় আম্মাদ। ঘটনা কি? তার সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমান্ডের এমন কি কাজ থাকতে পারে, বুঝতে পারছে না সে। আইওনার ব্যাপারে তদন্ত নেয়ার জন্য আলী বিন সুফিয়ান এ নির্দেশ পাঠিয়েছেন। মেয়েটির কাহিনী কতটুকু সত্য, তা যাচাই করে দেখতে চান আলী।

ক্যাম্পে যান আলী। আইওনার বলা নামের লোকটিকে খুঁজে বের করেন। প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পর ছেলে-মেয়ে আছে কিনা বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করেন তিনি। জবাবে বৃদ্ধ জানান–

দু'টি ছেলে আর একটি মেয়ে ছিল। ষোল বছর আগে আমার এই ক্যাম্পে নিক্ষিপ্ত হওয়ার প্রাক্কালে খৃষ্টান দস্যুদের হাতে নিজ ঘরে মায়ের সঙ্গে খুন হয় বড় ছেলে। ছোট ছেলে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় পাশের এক বাড়িতে। এই ক্যাম্পে বসে শুনেছিলাম, ওকে নাকি পরে সিরিয়া পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। এখন বেঁচে আছে কিনা জানিনা। আর– আর মেয়েটিকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে বদমাশরা। মেয়ের কথা বলতে গিয়ে সংযম হারিয়ে ফেলেন বৃদ্ধ। কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন তিনি। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে করুণ কণ্ঠে ভাঙ্গা গলায় বৃদ্ধ আবার বলেন, হায়! আমার সাত বছরের ফুটফুটে দুরন্ত মেয়েটিকে তুলে নিয়ে গেল ওরা! আহ্! জানি না মেয়েটির আমার পরিণতি কি হয়েছে! অশ্রুতে ভিজে গেছে বৃদ্ধের দু'চোখের পাতা। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে তার কপোল বেয়ে।

মধ্যরাত। বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ায় আইওনা। ঘুম আসছে না তার। এ পর্যন্ত কেবল এপাশ-ওপাশ করে ছট্ফট্ করে কাটিয়েছে সে। আলী বিন সুফিয়ানের আচরণে আইওনা আন্দাজ করেছে যে, তাকে তারা এখনো বিশ্বাস করতে পারেনি। না জানি এখন পরিণতি কি ঘটে! আলীর মনে কিভাবে বিশ্বাস জন্মানো যায়, তা ভাবছে আইওনা।

পাশাপাশি প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে তার মনে। আম্মাদের সঙ্গে নিজ বাড়িতে ঢুকে শৈশবের অনেক স্মৃতি-ই খুঁজে পেয়েছে সে। অপহরণের পর সীমাহীন আদর-যত্ন, আমোদ-আহলাদ আর উন্নত খাবার দিয়ে দেহে তার রূপের এই যে জোয়ার সৃষ্টি করা হয়েছিল, তারপর সেই জোয়ারে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিল তার অতীত, তার পরিচয়, তার সতীত্ব-সম্ভ্রম। তাকে পরিণত করা হয়েছে পাপের এক কালিমূর্তিতে, স্মৃতিপটে সব ভেসে উঠে আইওনার। এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য উথাল-পাথাল করছে তার মন। ত্বরা সইছে না এক মুহূর্তও। আবার পিতার সঙ্গে সাক্ষাত করার ইচ্ছাও তার প্রবলতর হচ্ছে ধীরে ধীরে।

কিন্তু কক্ষ থেকে বের হওয়ার পথ কি? বাইরে দু'জন প্রহরী টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। কিছুই ভেবে পায়না আইওনা। কোন বুদ্ধি আসল না তার মাথায়।

গাত্রোত্থান করে উঠে দাঁড়ায় আইওনা। কক্ষের দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করে উঁকি দেয় বাইরে। কারো কথা বলার শব্দ কানে আসে তার। ডান দিকে গজ বিশেক দূরে সান্ত্রী দু'জনকে ছায়ার মত চোখে পড়ে। ওরাই ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। দরজার

দুই কপাটের ফাঁক দিয়ে মাথা বের করে ওদের প্রতি তাকিয়ে থাকে আইওনা। কেন যেন আরো খানিকটা দূরে অন্ধকারে সরে যায় সান্ত্রীদ্বয়।

বেরিয়ে পড়ে আইওনা। পা টিপে টিপে অতি সাবধানে-সন্তর্পণে ভবনের আড়ালে প্রহরীদের দৃষ্টির বাইরে চলে যায় সে।

বেগার ক্যাম্পের অবস্থা আইওনার পূর্ব থেকে-ই জানা। এই ক্যাম্প যে এখন কারাগার নয়– অতিথিশালা, তাও তার অবিদিত নয়। কাজেই ক্যাম্পে গিয়ে সান্ত্রীর হাতে ধরা পড়ার আশংকা তার নেই।

দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে আইওনা। হঠাৎ পিছনে কারো পায়ের আওয়াজ শুনতে পায় সে। পিছনে ফিরে তাকায় মেয়েটি। কিন্তু দেখতে পায় না কিছু-ই। ভ্রম মনে করে আবার হাঁটা শুরু করে। পিছনে আবারো সেই পদশব্দ। কে যেন লম্বা পায়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

কেউ আসছে কিনা পিছনে ফিরে তাকায় আইওনা। চলার গতি থামিয়ে এই পিছন পানে দৃষ্টি দিবে বলে, হঠাৎ তার মাথা ও মুখমন্ডলে এসে পড়ে একটি মোটা বস্ত্র। চোখের পলকে বস্ত্রটি জড়িয়ে ধরে আইওনাকে। দু'টি শক্ত বাহু ঝাঁপটে ধরে তুলে নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

কেঁপে উঠে আইওনা। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠে তার। ঝাপটা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় সে।

অন্ধকার রাত। জনমানবহীন অনাবাদী এলাকা। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর একটি কম্বলে পেঁচিয়ে গাঠুরীর মত করে কাঁধে তুলে নেয়া হয় মেয়েটিকে। তারা ছিল দু'জন।

আঁধা ঘন্টা পর কাঁধ থেকে নামিয়ে পুটুলি থেকে বের করা হয় আইওনাকে। আইওনা নিজেকে একটি কক্ষে আবিষ্কার করে। টিম্ টিম্ করে দু'টি প্রদীপ জ্বলছে কক্ষে।

চারজন লোক তাকিয়ে আছে তার প্রতি। বিস্ময়াভিভূ নেত্রে এক এক করে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আইওনা। বলে, 'তোমরা এখনো এখানে? একি, মিঃ জেরাল্ড আপনি? আপনিও এখানে?'

'আমরা গিয়ে আবার এসেছি– তোমাকে বের করে নেয়ার জন্য। ভালো-ই হল যে, তোমাকে পেয়ে গেছি!'

দুর্গ দখলের পর যেসব খৃষ্টান গোয়েন্দা মেয়ে মুসলমানদের হাতে ধরা পড়েছে, তাদেরকে বের করে নেয়ার জন্য এবং যারা শোবকে আত্মগোপন করে আছে, তাদের সংগঠিত করে সম্ভব হলে তাদের দ্বারা নাশকতামূলক কাজ করানোর উদ্দেশ্যে কার্ক থেকে চল্লিশ সদস্যের একটি কমান্ডো বাহিনীকে শোবকে প্রেরণ করা হয়েছিল। এ চারজন সে বাহিনীর সদস্য।

আস্তাবলে ঢুকে ঘোড়ার খাদ্যে ও লঙ্গরখানায় মানুষের খাবারে বিষ মেশানো আর আগুন লাগানো এদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের প্রধান অংশ। গ্রুপ কমান্ডার জেরাল্ড এ কাজে বেশ পারদর্শী। আইওনা তার শিষ্য। গলায় গলায় ভাব ছিল দু'জনের।

কিন্তু এখন? লোকটিকে দেখামাত্র প্রবল ঘৃণা ও প্রতিশোধ-স্পৃহায় মাথায় খুন চড়ে যায় আইওনার। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলে নেয় সে নিজেকে। এটা ঘৃণার বহিঃপ্রকাশের জায়গা নয়। এখানে বসে প্রতিশোধ নেয়া যাবে না। কিন্তু আইওনা যে সম্পূর্ণ বদলে গেছে, জেরাল্ড তা জানবে কি করে?

'কোথায় যাচ্ছিলে তুমি?' আইওনাকে জিজ্ঞেস করে জেরাল্ড।

'সুযোগ পেয়ে পালাতে চেয়েছিলাম।' জবাব দেয় আইওনা।

মিঃ জেরাল্ড আইওনাকে জানায়, নির্যাতিত মুসলমানের ছদ্মবেশে চল্লিশজনের কমান্ডো গুপ্তচর নিয়ে আমি এখানে এসেছি। সেদিন শোবকের প্রধান ফটকে তেমন কোন কড়াকড়ি ছিল না। যুদ্ধের কারণে মুসলিম সৈনিকরা হরদম যাওয়া-আসা করছিল। আশপাশের পল্লী অঞ্চলের মুসলমানরাও দলে দলে শহরে প্রবেশ করছিল। এ সুযোগে আমরাও বিনা বাধায় ভিতরে ঢুকে পড়ি।

জেরাল্ড আইওনাকে আরও জানায়, যে বাড়িটিতে আমাদের গোয়েন্দা মেয়েরা বন্দী হয়ে আছে, দু'দিন ধরে তার উপর আমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখছি। প্রহরীদের গতিবিধির প্রতিও আমাদের বেশ কড়া নজর। সৌভাগ্যবশত আমরা তোমাকে পেয়ে গেলাম। অন্যদেরও বের করে আনা যায় কি করে বল। আইওনা বলে, ওদেরকে বের করে আনা দুরুহ হলেও অসম্ভব নয়। কৌশলে চেষ্টা করলে সফলতা আশা করা যায়।

রাতে-ই পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়ে যায়। আইওনা জেরাল্ডকে জানায়, মেয়েরা যেখানে থাকে, সেটি জেলখানা নয়- উন্মুক্ত ক'টি কক্ষ মাত্র। প্রহরী মাত্র দু'জন। এ জাতীয় আরো অনেক তথ্য দেয় আইওনা।

মেয়েদের বের করে আনার জন্য কয়েকজন লোক সেখানে যাবে বলে সিদ্ধান্ত হল। অন্যরা থাকবে অমুক বাড়িতে।

সিদ্ধান্তের পর আইওনা বলে, আমার ফিরে যাওয়া দরকার। কারণ, আমার পলায়নের সংবাদ জানাজানি হয়ে গেলে মেয়েদের প্রহরা কঠোর হয়ে যাবে। ফলে আমাদের এ অভিযান ব্যর্থ হবে।

আইওনার প্রস্তাবটি জেরাল্ডের মনঃপূত হল। সঙ্গে করে রাতারাতি আইওনাকে তার কক্ষের নিকটে পৌঁছে দিয়ে যায় সে। আইওনাকে বাইরে থেকে আসতে দেখে প্রহরীরা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে, সে কোথায় গিয়েছিল, কেন গিয়েছিল, কি আশয়-বিষয় ইত্যাদি। আইওনা শান্ত কণ্ঠে বলে, বেশী দূরে নয়- ঐ তো ওখানে একটু ঘুরতে গিয়েছিলাম। মনটা ভাল লাগছিল না কিনা তাই।

কক্ষে প্রবেশ করে আইওনা। প্রহরীরাও নিজেদের কর্তব্যে অবহেলার কথা স্মরণ করে চুপসে যায়।

পরদিন।

আইওনা প্রহরীদের বলে, আমাকে তোমরা একটু আলী বিন সুফিয়ানের নিকট নিয়ে চল; তাঁর সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে। প্রহরীরা অসম্মতি জানিয়ে বলে, প্রয়োজন হলে তিনি-ই তোমাকে ডেকে পাঠাবেন, তোমাকে নিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আইওনা প্রহরীদের প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝাবার চেষ্টা করে। বলে, দেখ, তার সঙ্গে অত্যন্ত জরুরী কথা আছে, দয়া করে আমাকে দিয়ে আস। অন্যথায় কারো মাধ্যমে শুধু এ সংবাদটা পৌঁছিয়ে দাও যে, আমার তাকে বড্ড প্রয়োজন। আইওনা একথাও বলে, তোমাদের অবহেলায় যদি সংবাদটা না পৌঁছে, তবে এর জন্য যে ক্ষতি হবে, তার মাশুল তোমাদেরও ভোগ করতে হবে বলে দিচ্ছি।

আলী বিন সুফিয়ান তার কক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এক কাজে ব্যস্ত। ইত্যবসরে সালাম দিয়ে এক ব্যক্তি কক্ষে প্রবেশ করে। মাথা তুলে তাকান আলী। আগন্তুকের সালামের জবাব দেন। আগন্তুক নিজের পরিচয় দিয়ে বলে, গতকাল আইওনা নামের যে গোয়েন্দা মেয়েটিকে রেখে এসেছিলেন, সে আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করতে চায়। আপনার সঙ্গে নাকি তার জরুরী কথা আছে। সংবাদটা আপনাকে না জানালে যে ক্ষতি হবে, তার জন্য প্রহরীদের শাস্তি ভোগ করতে হবে বলেও সে শাসিয়ে দিয়েছে।

সংবাদ পাওয়া মাত্র আলী বিন সুফিয়ান আইওনাকে ডেকে পাঠান। কক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে আইওনা। সেই কক্ষে আর ফিরে যায়নি সে।

❁ ❁ ❁

নীরব-নিস্তব্ধ গভীর রজনী। শোবকের কোথাও কেউ জেগে নেই। গভীর সুষুপ্তিতে নিমগ্ন সমগ্র নগরী। গোয়েন্দা মেয়েদের বন্দী করে রাখা ভবনটির চারদিকে নড়াচড়া করছে আট-দশটি ছায়ামূর্তি। কোন প্রহরী নেই। অবাক্ হল ওরা। হামাগুড়ি দিয়ে কাছে এগিয়ে যায় লোকগুলো। বন্দী মেয়েরা কোথায় কিভাবে থাকে, সব বলে এসেছিল আইওনা। দু'জন ঢুকে পড়ে এক কক্ষে। বাকীরা ঢুকে পড়ে অন্য কক্ষগুলোতে। কোন প্রহরী আছে কি-না, নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি তারা। আইওনা বলেছিল, প্রহরী থাকে মাত্র দু'জন। এখন থাকলেও দু'জনকে ঘায়েল করা আট-দশজনের পক্ষে কঠিন হবে না। অবলীলায় সব ক'জন ঢুকে পড়ে মেয়েদের কক্ষগুলোতে। কিন্তু তারপর আর বের হল না একজনও।

গত রাতে আইওনাকে যে ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, গেরাল্ড সে ভবনের একটি কক্ষে বসা। পরিকল্পনা মোতাবেক এ বাড়িতে বিশজন লোক অবস্থান করছে। অন্যরা লুকিয়ে আছে এক খৃষ্টানের বাড়িতে। গেরাল্ড অপেক্ষা করছে অধীর চিত্তে। এতক্ষণে অভিযান সফল করে মেয়েদের নিয়ে ওদের ফিরে আসার কথা! কিন্তু আসছে না

এখনো! অস্থির হয়ে উঠে গেরাল্ডে মন। এ অভিযান তো ব্যর্থ হবার কথা নয়!

ঠক্ ঠক্ ঠক্।

দরজায় করাঘাতের শব্দ শুনতে পায় গেরাল্ড। তারই নির্ধারিত সাংকেতিক শব্দ। অতএব সন্দেহের কোন কারণ নেই। দ্রুত উঠে গিয়ে গেরাল্ড নিজে দরজার অর্গল খুলে দেয়। অমনি কে একজন ঝাপ্‌টে ধরে টেনে হেঁচড়ে বাইরে নিয়ে যায় গেরাল্ডকে। দেখতে না দেখতে ছুটে আসে একদল সৈনিক। দ্রুতপদে ঢুকে পড়ে তারা ভিতরে।

প্রশস্ত একটি কক্ষে বসে আছে বিশজন সন্ত্রাসী গোয়েন্দা। আত্মসংবরণ করার সুযোগ পেল না তারা। একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে সৈন্যরা কেড়ে নেয় তাদের অস্ত্র। তীর-তরবারী-খঞ্জর, যা ছিল সব।

ভবনটির মালিক একজন ধনাঢ্য খৃষ্টান। এখানেই স্বপরিবারে বাস করছে সে। পরিবার-পরিজনসহ তাকে এবং গ্রেফতারকৃত বিশ সন্ত্রাসী খৃষ্টানকে হাতকড়া পরিয়ে বের করে নিয়ে যায় সৈনিকরা।

বাদ বাকী খৃষ্টান সন্ত্রাসী অপর যে বাড়িটিতে প্রস্তুতি নিয়ে বসে ছিল, একই সময়ে হানা হয় সেখানেও। এ রাতে এভাবে আকস্মিক হানা হয় দশ–এগারটি বাড়িতে। রাতভর চলে মুসলিম বাহিনীর এ বিস্ময়কর অভিযান।

এ অভিযানে গ্রেফতারকৃত সন্ত্রাসী গুপ্তচরদের পরদিন সকালে সুলতান আইউবীর সামনে হাজির করা হয়। তন্মধ্যে খৃষ্টানদের প্রেরিত কমান্ডো বাহিনীর চল্লিশজন সদস্য, বাহিনী প্রধান গেরাল্ড ছাড়াও ছিল বিভিন্ন বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ধৃত আরো চল্লিশজন গুপ্তচর। এসব বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পাওয়া গিয়েছিল বিপুলসংখ্যক অস্ত্র, প্রচুর পরিমাণ বিষ, অসংখ্য তীর, বিস্ফোরক ও মোটা অংকের নগদ অর্থ।

এ অভিযানের কৃতিত্ব সম্পূর্ণ আইওনার। গেরাল্ডের সঙ্গে পরিকল্পনা তৈরি করে সহকর্মীদের কে কোথায় লুকিয়ে আছে জেনে নিয়ে ফিরে এসেছিল সে। আইওনার প্রতি পূর্ণ আস্থা ছিল গেরাল্ডের। পরদিন সকালে আইওনা সব পরিকল্পনা ফাঁস করে দেয় আলী বিন সুফিয়ানের নিকট। আলী বিন সুফিয়ানের গুপ্তচররা দিনাদিন সবগুলো বাড়ির অবস্থান জেনে নেয়।

এসব ঠিকানায় অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে সন্ধ্যার পর সুলতান আইউবীর বিশেষ কমান্ডো বাহিনীকে তলব করা হয়। বন্দী মেয়েদেরকে সরিয়ে নিয়ে লুকিয়ে রাখা হয় অন্যত্র। তাদের পরিবর্তে প্রতিটি কক্ষে বসিয়ে রাখা হয় তিনজন করে কমান্ডো সদস্য। তুলে নেয়া হয় প্রহরীদের। রাতের বেলা খৃষ্টান কমান্ডো সদস্যরা যেই মাত্র কক্ষগুলোতে হানা দেয়, অম্‌নি ওঁৎ পেতে থাকা মুসলিম কমান্ডোরা ধরে ফেলে তাদের।

এভাবে শোবকে লুকিয়ে থাকা প্রায় সব খৃষ্টান গুপ্তচর-সন্ত্রাসী ধরা পড়ে যায়। তন্মধ্যে **সর্বাপেক্ষা** দামী হল গেরান্ড। সুলতান আইউবী তাদের সকলকে পাঠিয়ে দেন জেলে।

যেসব বিশ্বাসঘাতক মুসলমান কায়রোতে সুলতান আইউবী বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত, আইওনা তাদের কথাও ফাঁস করে দেয়। হাশীশীদের হাতে সুলতান আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ানকে হত্যা করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল, আইওনা তা-ও জানিয়ে দেয়। সবশেষে সে সুলতান আইউবীর মুখপানে তাকিয়ে সহাস্যে বলে, 'এবার বোধ হয় আমাকে আপনার বিশ্বাস করা উচিত!'

আইওনাসহ সুলতান আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ান কক্ষে বসে আছেন। ইতিমধ্যে সুলতান ডেকে পাঠান আম্মাদকে। সংবাদ পেয়ে চলে আসে আম্মাদ। সালাম দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে সে। অপূর্ব এক গাম্ভীর্য বিরাজ করছে কক্ষ জুড়ে। তিনজন-ই নীরব। বসে আছেন চুপচাপ। সালামের জবাব দিয়ে সুলতান ইঙ্গিতে আইওনার সম্মুখের চেয়ারটায় বসতে বলেন আম্মাদকে। গম্ভীর মুখে সুলতান তাকান আম্মাদের প্রতি। বলেন–

'আম্মাদ! আইওনা তোমার হারিয়ে যাওয়া বোন আর তুমি ওর পালিয়ে যাওয়া ভাই!'

ছল্ছল্ করে উঠে দু'জনের চোখ। অশ্রুভেজা চোখে অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছে একজন অপরজনের প্রতি।

ভাই-বোনকে নিয়ে যাওয়া হল পিতার সামনে। পরিচয় করিয়ে দেন সুলতান নিজে। আবেগের আতিশয্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন বৃদ্ধ। চৈতন্য ফিরে আসলে বুকে টেনে নেন পুত্র-কন্যাকে। বললেন, ওর নাম আইওনা নয়– আয়েশা।

সুলতান আইউবী এ বৃদ্ধের পরিবারের জন্য ভাতা চালু করে দেন। এরূপ সব মেয়ের ব্যাপারে অনুসন্ধান নেয়ার নির্দেশ দেন গোয়েন্দা বিভাগকে। না জানি এমন কত মুসলিম ঘরানার মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে এই কুকর্মে লিপ্ত করেছে খৃষ্টানরা। সুলতান ফরমান জারি করেন যে, এমন কোন মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেলে যেন তার বাড়ি-ঘর খুঁজে বের করে, তাকে পিতা-মাতার হাতে তুলে দেয়া হয়।

ভয়ানক এক বিপদ থেকে বেঁচে গেলেন সুলতান আইউবী। শোবকের বাইরে– দূরের যুদ্ধক্ষেত্রগুলোর সংবাদ সন্তোষজনক। কিন্তু এক্ষুণি যে কাজটি একান্ত প্রয়োজন, তা হল মরুভূমিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাহিনীগুলোকে একস্থানে সমবেত করা। এ লক্ষ্যে সুলতান আইউবী শোবকের সেনানিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সহকারীদের হাতে ন্যস্ত করে নিজে চলে যান ময়দানে। নিজের হেডকোয়ার্টার স্থানান্তর করেন সুদূর মরু অঞ্চলে। সঙ্গে রাখেন বিদ্যুদ্গতিসম্পন্ন একদল দূত।

তাদের মাধ্যমে এক মাসের মধ্যে বিক্ষিপ্ত সৈন্যদের একত্রিত করেন তিনি।

সুলতান আইউবী কায়রোর ন্যায় শোবকের প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্যও তাঁর সেনাবাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করে নেন। এক ভাগ নিয়োজিত করেন সীমান্ত অঞ্চলে। এক ভাগ তাঁবু ফেলে সীমান্তে– বাহিনীর পাঁচ-ছয় মাইল পিছনে। তৃতীয় ভাগকে রাখা হয় পেট্রোল ডিউটির জন্য।

যেসব খৃষ্টান সৈন্য জীবনে রক্ষা পেয়ে কার্কে এসে পৌঁছেছে, এক্ষুণি আবার অভিযান পরিচালনা করবে, এমন শক্তি তাদের নেই। যুদ্ধ করার শক্তি-সাহস সব হারিয়ে ফেলেছে তারা।

এদিকে সুলতান আইউবী সেনাভর্তির গতি আরো জোরদার করে দেন। মরুভূমির খোলা ময়দানে নয়া ভর্তি হওয়া সেনাদের প্রশিক্ষণের আয়োজন চলছে। কার্কে গুপ্তচর প্রেরণের জন্য তিনি আলীকে নির্দেশ দেন, যেন তারা খৃষ্টানদের তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি সেখানকার মুসলিম যুবকদেরকে কার্ক থেকে বেরিয়ে ময়দানে এসে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

বিদ্রোহ

খৃস্টানদের পায়ের তলায় কাতরাচ্ছে ফিলিস্তীন। ক্রুশের মাথায় ঝুলছে জেরুজালেম। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঝরছে এই নগরীর পবিত্র দেহ থেকে। খৃস্টান হায়েনাদের লোমশ থাবায় পিষ্ট হচ্ছে এখানকার মুসলমানরা। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর অপেক্ষায় দিন গুণছে তারা। জেরুজালেমের নির্যাতিত মুসলমানরা সংবাদ পেয়ে গেছে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ফিলিস্তীনের ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছেন এবং শোবক দুর্গ এখন মুসলমানদের দখলে।

জেরুজালেমের মুসলমানদের জন্য এটি এক সুসংবাদ। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই এই সুসংবাদ পরিণত হয়ে যায় মৃত্যুর পরোয়ানায়। জেরুজালেম ও অন্যান্য নগর-পল্লীর মুসলমানদের থেকে শোবকের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে শুরু করে খৃস্টানরা। বেশী অত্যাচার চলছে কার্কের মুসলমানদের উপর।

শোবকের পর কার্ক বিশাল এক দুর্গ। খৃস্টানদের অতি গর্বের ধন। শোবক নিয়েও ছিল তাদের এমনি গৌরব। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সূক্ষ্ম কৌশল ও তাঁর মুজাহিদদের বীরত্ব ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে তাদের সেই অহংকার।

কার্ককে আরো দুর্ভেদ্য- শক্ত করে তুলছে খৃস্টানরা। নির্যাতন চালিয়ে অথর্ব করে তুলছে মুসলমানদের। তাদের ধারণা, জেরুজালেমের মুসলমানরা গুপ্তচরবৃত্তি করছে। খৃস্টানদের গোপন তথ্য পৌঁছিয়ে দিচ্ছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর কাছে। তাই শোবকের ন্যায় এখানেও তারা 'সন্দেহভাজন' মুসলমানদের ধরে ধরে নিক্ষেপ করছে বেগার ক্যাম্পে।

'ফিলিস্তীন জয় করা আমাদের এক মহান লক্ষ্য। কিন্তু কার্ক থেকে মুসলমানদের বের করে আনা তদপেক্ষা মহত্তর লক্ষ্য হওয়া উচিত।' গোয়েন্দা বিভাগের এক তুর্কী কর্মকর্তা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে বলল একথা। নাম তার তলআত চেঙ্গীস। চেঙ্গীস ছয়জন গুপ্তচর নিয়ে শোবকের নির্যাতিত খৃস্টানের বেশে কার্কে প্রবেশ করেছিল। তিন মাস পর ফিরে এসে এখন আলী বিন সুফিয়ানের উপস্থিতিতে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট রিপোর্ট পেশ করছে।

যেসব খৃস্টান সৈন্য পালিয়ে কার্ক পৌঁছে গিয়েছিল, চেঙ্গীস জানায়, তাদের অবস্থা বড় শোচনীয়। সহসা যুদ্ধ করার শক্তি-সাহস তাদের নেই। এই পরাজিত খৃস্টান

সৈন্যরা কার্ক পৌঁছামাত্র অত্যাচারের ঝড় নেমে আসে সেখানকার মুসলমানদের উপর। মুসলিম মহিলাদের ঘরের বাইরে বের হওয়ার সাধ্য নেই। সামান্যতম সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ামাত্র তারা একজন মুসলমানকে অমনি নিক্ষেপ করছে বেগার ক্যাম্পে, যেখানে তাদের পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট জীবনযাপন করতে হয়। কাকডাকা ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তাদের খাটতে হয় গাধার মত।

'আমরা সেখানে গোপন তৎপরতা শুরু করেছি। সেখানকার যুবক মুসলমানদের বের করে আনার চেষ্টা করছি, যাতে শোবক এসে তারা সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে পারে। কারো সাহায্যের অপেক্ষা না করেই যাতে আমরা কার্ক আক্রমণ করতে পারি, আমি সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সেখানে থাকা অবস্থাতেই বেশকিছু যুবক সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু কাজটি বড় দুরূহ। কারণ, খৃস্টান সৈন্যরা চারদিকে গিজ গিজ করছে। তাছাড়া আত্মীয়-স্বজন, বিশেষত মহিলাদেরকে খৃস্টানদের দয়ার উপর ফেলে আসতে পারে না। তাই কালক্ষেপণ না করে কার্ক আক্রমণ করে সেখান থেকে মুসলমানদের উদ্ধার করা প্রয়োজন।' বলল চেঙ্গীস তুর্কী।

এর আগে অপর এক গুপ্তচর তথ্য দিয়েছিল যে, খৃস্টানদের বর্তমান পরিকল্পনা হল, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী কার্ক অবরোধ করলে তাদের একটি বাহিনী পেছন দিক থেকে আক্রমণ চালাবে। তবে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী আগেই তাঁর সেনা কর্মকর্তাদের এরূপ একটি ধারণা দিয়ে রেখেছেন। এ পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য তাঁর অতিরিক্ত সৈন্যের প্রয়োজন।

চেঙ্গীস তুর্কীকে বিদায় দিয়ে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন, 'আবেগের দাবী অনুসারে এই মুহূর্তে কার্ক আক্রমণ করাই উচিত। সেখানকার মুসলমানরা কোন্ জাহান্নামে পড়ে আছে , আমি তা ভাল করেই বুঝতে পারছি। কিন্তু বাস্তবতার দাবী হল, পূর্ণ প্রস্তুতি ব্যতীত এক পা-ও অগ্রসর হয়ো না। আঘাত হানো তখন, যখন তুমি নিশ্চিত হবে যে অভিযান ষোল আনা সফল হবে। যেসব নারী ও শিশু দুশমনের হাতে অপদস্ত, নিগৃহীত ও নিহত হচ্ছে, আমরা তাদের ভুলে থাকতে পারি না। তাদের-ই জীবন-সম্ভ্রমের খাতিরে আমি ফিলিস্তীন উদ্ধার করতে চাই। এই যদি আমার লক্ষ্য না হয়, তাহলে যুদ্ধের উদ্দেশ্য লুটতরাজ ছাড়া আর কিছু থাকে না। যে জাতি দুশমনের হাতে নিগৃহীত শিশু ও নারীদের কথা ভুলে থাকে, তারা দস্যু-ডাকাতদেরই দলভুক্ত হয়ে যায়। সে জাতির জনগণ দুশমন থেকে প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে একে অপরকে প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে, সে জাতির শাসকগোষ্ঠী জনগণকে শোষণ করে বিলাসিতায় দিন কাটায়। অবশেষে দুর্বলতার সুযোগে দুশমন যখন মাথার উপর এসে পড়ে. ফাঁকা স্লোগান তুলে জনগণকে বোকা ঠাওরায় আর তলে তলে দুশমনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী এরূপ কয়েকটি জাতির নাম উচ্চারণ করে বললেন, 'ওরা ছিল সম্প্রসারণবাদী। ওদের স্বপ্ন ছিল, কিভাবে সমগ্র পৃথিবীকে নিজেদের করতলে নিয়ে আসবে, কিভাবে সারা জগতের সমুদয় সম্পদের অধিকারী হবে। ওরা বিজাতীয় নারীদের সম্ভ্রমে হাত দিয়েছে আর বিজাতীয়দের দ্বারা ওদের বোন-কন্যাদের সম্ভ্রমহানী ঘটিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ ওদের নাম-চিহ্ন মুছে দিয়েছেন।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী আরো বললেন, 'আমরা আক্রমণ পরিকল্পনায় ব্যস্ত আর দুশমনও আক্রমণোদ্যত। পার্থক্য হল, খৃস্টানরা দূরদেশ থেকে এসেছে আমাদের জাতি-ধর্ম ও কৃষ্টি-কালচারকে নিশ্চিহ্ন করতে। এসেছে আমাদের মুসলিম নারীদের গর্ভে খৃস্টান সন্তান জন্ম দিতে। আর আমরা তাদের প্রতিরোধ করছি মাত্র। কুফরের এই সয়লাবকে যদি আমরা প্রতিরোধ করতে না পারি, তাহলে প্রমাণিত হবে- আমরা অথর্ব, আমরা মুসলামান নই। পক্ষান্তরে যদি এমনটা হয় যে, আমরা দুশমনের অপেক্ষায় ঘরে বসে রইলাম, দুশমন আমাদের সীমানায় প্রবেশ করে আক্রমণ করল আর আমরা নিজ ঘরে বসে প্রতিরোধ করলাম আর মনে মনে ভাবলাম, আহ! আমরা শত্রুর মোকাবেলা করেছি; তাহলে বুঝতে হবে আমরা কাপুরুষ। দুশমনের প্রতিরোধের নিয়ম হল, দুশমন যদি তোমাকে আঘাত করার জন্য তরবারী কোষমুক্ত করতে উদ্যত হয়, তাহলে তোমার তরবারী ততক্ষণে তার মস্তক দ্বিখন্ডিত করে ফেলেছে। দুশমন তোমার উপর হামলা করার প্রস্তুতি নিয়েছে আগামীকাল, তো তুমি আজই তাকে চরম শিক্ষা দিয়ে দাও।'

'আমার মতে বর্তমান পরিস্থিতিতে সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গীর সাহায্য নিয়ে কার্ক আক্রমণ করা উচিত।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'এটাও হবে ক্ষতিকর। জঙ্গীর কাছে এত পরিমাণ সৈন্য থাকা প্রয়োজন যে, খৃস্টানরা যদি আমাদের উপর পেছন থেকে আক্রমণ করে বসে, তাহলে জঙ্গীও তাদের পেছন থেকে হামলা করতে সক্ষম হবেন। আমি সাহায্য চাওয়ার পক্ষপাতী নই। তার পরিবর্তে আমরা এ-ও করতে পারি যে, কার্কে কমান্ডো বাহিনী প্রেরণ করে খৃস্টানদের আরামের ঘুম হারাম করে দিই। আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমাদের গুপ্তচররা খৃস্টান কমান্ডোদের শিকড় ইঁদুরের ন্যায় কেটে ফেলতে পারবে। কিন্তু তার পরিণতি ভোগ করতে হবে সেখানকার নিরপরাধ নিরীহ মুসলমানদের। গেরিলারা তো তাদের অভিযান পরিচালনা করে এদিক-ওদিক আত্মগোপন করে থাকবে। পরিণতিতে নির্যাতনের শিকার হবে আমাদের নিরস্ত্র বোন-কন্যাসহ নিরীহ মুসলমানরা। তবে সেখানকার মুসলিম পরিবারগুলোকে বের করে আনার কোন নিরাপদ পন্থা খুঁজে পাওয়া যায় কিনা ভেবে দেখতে পার। কার্ক আক্রমণে এখনো বেশ সময় নিতে হবে। সেনাসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কার্কের অনেক যুবকও বেরিয়ে এসেছে এবং অনেকে এখনও আসছে। আক্রমণ চালাতে হবে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে।

'আমি মনে করি, এখানকার মুসলমান নাগরিকদের ব্যাপারে আমাদের পলিসিতে পরিবর্তন আনা দরকার।' বলল, খৃস্টানদের গোয়েন্দা প্রধান হরমুন। কার্ক দুর্গে খৃস্টানদের গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন চলছে। কয়েকজন খৃস্টান সম্রাট, সেনা কমান্ডার ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা বৈঠকে উপস্থিত। পরাজয়ের গ্লানির ছাপ সকলের চোখে-মুখে। প্রতিশোধের আগুনে জ্বলজ্বল করছে সকলের চোখ। শোবকের পরাজয়কে বিজয়ে পরিণত করতে চায় তারা দ্রুত। শুধু গোয়েন্দা প্রধান হরমুন-ই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি কথা বলছেন বুদ্ধিমত্তার সাথে– ঠান্ডা মাথায়। কার্কের মুসলমানদের উপর তার খৃস্টান ভাইয়েরা কিরূপ অমানুষিক নির্যাতন চালাচ্ছে, তার চোখের উপর ভাসছে সব। গম্ভীর কণ্ঠে হরমুন বললেন– 'শোবকের মুসলমানদের সঙ্গেও আপনারা এরূপ আচরণ করেছিলেন। তার পরিণতি আমাদের জন্য কল্যাণকর হয়নি। আমাদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে তারা ক্যাম্প থেকে এমন এক ব্যক্তিকে পালাতে সাহায্য করেছিল, যাকে আমরা ভয়ংকর গুপ্তচর মনে করে আটক করেছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ লোকটিকে ওখানকার মুসলমানরাই আশ্রয় দিয়েছিল। লোকটি দুর্গের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য নিয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া সালাহুদ্দীন আইউবী আমাদের দুর্গের যে দেয়াল ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করেছিল. তাতে ভেতরের মুসলমানদেরও হাত ছিল। আমাদের আচরণে তারা এতই অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল যে, তারা জীবনবাজি রেখে মুসলমান সৈন্যদের সহযোগিতা করেছিল।'

'এ কারণেই তো আমরা কার্কের মুসলমানদের হাড়গোড় ভেঙ্গে দিচ্ছি, শক্তি-সাহস নিঃশেষ করে দিচ্ছি।' বলল এক খৃস্টান সেনাপতি।

'তা না করে যদি আপনারা তাদেরকে বন্ধুতে পরিণত করে নেন. তাহলে তারা আপনাদের সহযোগিতা করবে। আপনাদের অনুমতি পেলে আমি প্রেম-ভালবাসা দিয়ে ধর্ম পরিবর্তন না করেও তাদেরকে ক্রুশের ভক্তে পরিণত করতে পারি, মুসলমানদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াতে পারি।' বললেন গোয়েন্দা প্রধান হরমুন।

'জান না হরমুন! তুমি হয়ত হাতেগোনা কয়েকজন মুসলমানকে লোভ দেখিয়ে গাদ্দারে পরিণত করতে পারবে। কিন্তু প্রত্যেক মুসলমানকে ইসলামী ফৌজের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারবে না। গোটা জাতি কখনো বিশ্বাসঘাতক হয় না। শোন হরমুন! ওদের উপর তুমি এত আস্থা রেখো না। আমরা মুসলমানদেরকে বন্ধু বানাতে চাই না। আমরা চাই মুসলমানদের বংশধারা নিঃশেষ করে দিতে। তুমি যখনই একজন অমুসলিমকে কোন মুসলমানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে দেখবে, বুঝবে লোকটি ইসলামকে ভালোবাসে। অথচ আমাদের উদ্দেশ্য হল, ইসলামের মূলোৎপাটন। কার্ক, জেরুজালেম, আক্কা ও আদীসায় এবং যেখানেই আমাদের কর্তৃত্ব চলছে, সবখানে মুসলমানদের এত অস্থির করে তোল, যাতে তারা হয়তো মৃত্যুমুখে পতিত হয় নতুবা ক্রুশের সামনে মাথানত করতে বাধ্য হয়।' বললেন সম্রাট রেমন্ড।

'মুসলমানদের সাথে যখন যে আচরণ করা হচ্ছে, সবই যথারীতি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর কানে পৌঁছে যাচ্ছে। আপনারা আইউবীকে দ্রুত কার্ক আক্রমণে বাধ্য করছেন। আপনারা হয়তো ভুলে গেছেন যে, এক্ষুণি কোন আক্রমণ হলে আমাদের সৈন্যরা সে হামলার সামনে দাঁড়াবার শক্তি রাখে না।' বললেন গোয়েন্দা প্রধান হরমুন।

'তার সমাধান এই নয় যে, আমরা এখানকার মুসলমানদেরকে মাথায় তুলে নাচবো। আপনারা এখনো মুসলমান বন্দীদের খাইয়ে-পরিয়ে পুষছেন। ওদেরকে হত্যা করে ফেলছেন না কেন?' ঝাঝালো কণ্ঠে বললেন ফিলিপ অগাস্টাস।

'করছি না, তার কারণ আইউবী আমাদের বন্দীদের হত্যা করে ফেলবে। আমাদের হাতে মুসলমান বন্দীর সংখ্যা সর্বমোট ৩৬১ জন। আর মুসলমানদের হাতে আমাদের বন্দীর সংখ্যা ১২৭৫ জন।' জবাব দেন গাই অফ লুজিনান।

'একজন মুসলমান খুন করার জন্য কি আমরা চারজন খৃস্টানের জীবন বিসর্জন দিতে পারি না? আমাদের যারা এখন সালাহুদ্দীনের হাতে বন্দী, তারা কাপুরুষ। যুদ্ধের পরিবর্তে বন্দীত্ববরণ করে নিয়েছে ওরা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওরা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল না বলেই শত্রুর হাতে ধরা পড়েছে। ওরা মুসলমানদের হাতে মরে গেলেই বরং ভাল। তোমরা নিশ্চিন্তে মুসলমান বন্দীদের হত্যা করে ফেল।' বললেন অগাস্টাস।

'মুসলমান বন্দীদের সাথে পশুর ন্যায় আচরণ করে এবং মুসলিম বন্দী সৈনিকদের হত্যা করে কি তুমি সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাজিত করতে পারবে? এ মহূর্তে আমাদের সামনে বড় সমস্যা হল, আইউবী যদি তার অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখেন, তাহলে আমরা কিভাবে তাকে প্রতিহত করব এবং কিভাবে তার থেকে শোবক দুর্গ পুনরুদ্ধার করব? আচ্ছা, আমরা যদি কার্কের সব মুসলমানকে হত্যা করে ফেলি, তাহলে কি হবে? আইউবীর ন্যায় তোমরা সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করছো না কেন? হরমুন কী বলতে পারবে, মিসরে তার গোপন তৎপরতার অগ্রগতি কেমন? সাফল্য কতটুকু?' বলল সেনাপতি গোছের এক খৃস্টান।

'আশার চেয়েও অধিক। আলী বিন সুফিয়ান এখন সালাহুদ্দীন আইউবীর সাথে শোবকে অবস্থান করছেন। কায়রোতে তার অনুপস্থিতি থেকে আমি প্রচুর ফায়দা হাসিল করেছি। কায়রোর নায়েবে নাজেম মুসলেহুদ্দীনকে ফাতেমীরা দলে ভিড়িয়ে নিয়েছে। মুসলেহুদ্দীন আইউবীর একান্ত বিশ্বস্ত। কিন্তু এখন সে আমাদের অফাদার। ফাতেমীরা তলে তলে একজন খলীফা ঠিক করে রেখেছে। তিনি কায়রোর ভেতর থেকে বিদ্রোহ এবং সুদানীদের আক্রমণের অপেক্ষা করছেন। আমাদের সেনা অফিসার সুদানে সুদানীদের জন্য সৈন্য প্রস্তুত করছে। কায়রোতে সালাহুদ্দীন আইউবী যে ফৌজ রেখে এসেছেন, তার দু'জন নায়েব সালার এখন আমাদের হাতের পুতুল।

ওদিক থেকে সুদানীরা হামলা চালাবে । কায়রোতে বিদ্রোহ হবে এবং ফাতেমীরা তাদের খেলাফত ঘোষণা করবে।' জবাব দেন গোয়েন্দা প্রধান হরমুন।

'তোমরা বোধ হয় ভুলে গেছ যে, সালাহুদ্দীন আইউবী এতই চতুর ও বিচক্ষণ লোক যে, প্রয়োজনবোধে কার্ক আক্রমণ মুলতবী রেখে হঠাৎ করে তিনি কায়রো চলে যাবেন। আমাদের উচিত, জ্বালাতন করে করে তাকে শোবকেই অবস্থান করতে বাধ্য করা। তার জন্য আমরা একটি কাজ এই করতে পারি যে, আমরা তার পথ আগলে রাখব এবং তার একজন সৈন্যকেও কায়রো যেতে দেব না।' রেমন্ড বললেন।

'আমার শতভাগ আশা, কায়রোতে এখন আইউবীর যেসব সৈন্য আছে, তারা আর তার কোন কাজে আসবে না। আমার লোকেরা আইউবীর সেনাবাহিনীতে এ সংশয় ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, কায়রোতে রেখে গিয়ে সুলতান তাদেরকে গনীমত থেকে বঞ্চিত করেছেন এবং শোবকে হাজার হাজার খৃস্টান যুবতী তার হাতে এসে গেছে, যাদেরকে তিনি সেনাদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন। আমার বড় সফলতা এই যে, আমি মুসলমান সেনা কর্মকর্তাদেরই মুখে সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে এই গুজব ছড়িয়ে দিয়েছি। আমি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছি যে, কায়রোর সকল ফৌজী সুদানীদের সঙ্গ দেবে এবং সালাহুদ্দীন আইউবী বিদ্রোহ দমন করার জন্য শোবক থেকে তার সব সৈন্য প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হবেন। কিন্তু এরা যখন গিয়ে কায়রো পৌঁছুবে, ততক্ষণে কায়রোতে ফাতেমী খেলাফতের পতাকা উড্ডীন হয়ে যাবে এবং সুদানী বাহিনী দেশের ক্ষমতা হাতে নিয়ে ফেলবে। আক্রমণ করে সালাহুদ্দীন আইউবীকে শোবকে আটকে রাখা আমাদের নিষ্প্রয়োজন। মুসলমানদেরই হাতে আমরা তাকে শেষ করে দেব।' বললেন খৃস্টান গোয়েন্দা প্রধান হরমুন।

হরমুন আরো বললেন- 'আপনি মুসলমানদের মতিগতি এখনো বুঝে উঠতে পারেননি। সে কারণেই আপনি আমার অনেক কার্যকর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিচ্ছেন। মুসলমান যদি সৈনিক হয় আর প্রশিক্ষণের সময় যদি তার মাথায় একথা ঢুকিয়ে দেয়া হয় যে, তুমি দেশ ও জাতির মোহাফেজ, তাহলে সে দেশ-জাতির স্বার্থে নিজের জীবন কুরবান করতে কুণ্ঠিত হয় না। আপনি পৃথিবীর রাজত্ব তাদের পায়ের উপর রেখে দেখুন, তারা একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে কাজ করাই বেশী পছন্দ করবে। প্রকৃত মুসলমান জাতির সাথে গাদ্দারী করে না। তবে সেই মুসলমানদেরই মাঝে যদি যৌনতা, মদ, নারী আর ক্ষমতার লিপ্সা সৃষ্টি করে দেয়া যায়, তাহলে তারা নিজেদের দ্বীন-ধর্মকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতেও এতটুকু ভাববে না। আমি যেসব মুসলমান শাসককে দলে ভিড়িয়েছি, তাদের মধ্যে ঐ দুর্বলতাগুলো সৃষ্টি করেছি এবং করে চলেছি।'

বক্তব্য শেষ হয় না হরমুনের-

'কিন্তু একজন সৈনিককে গাদ্দার বানানো অতটা সহজ নয়, যতটা সহজ একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে দলে ভেড়ানো। প্রশাসনের সব কর্মকর্তাই ক্ষমতালিপ্সু। সকলেরই চেষ্টা, কি করে মন্ত্রী-গবর্নর হওয়া যায়। মুসলমানদের ইতিহাস দেখুন। দেখতে পাবেন, তাদের রাসূলের পর সব শাসকই ক্ষমতার লড়াইয়ে লিপ্ত। কিন্তু তাদের খলীফারা যখনই দেখলেন যে, অমুক সেনাপতি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে ফেলল, রাজ্যজয়ের বদৌলতে জাতি তাকে খলীফা অপেক্ষা বেশী মর্যাদা দিতে শুরু করল, তখন খলীফা ও তার সাঙ্গরা সেই সেনাপতিকে ভুল নিদের্শনা দিয়ে অপদস্ত করেছে। এই ক্ষমতালিপ্সু মুসলিম শাসকদের জাতি-ধর্ম বিধ্বংসী আচরণের ফলেই আমরা আজ আরব রাজ্যে পা রাখতে পেরেছি। সালাহুদ্দীন আইউবী সেইসব সেনানায়কদেরই একজন, যারা সালতানাতকে সেই সীমান্তরেখা পর্যন্ত নিয়ে যেতে চান. যে পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল প্রথম যুগের সেনানায়করা। এই লোকটির বিশেষ একটি গুণ হল, ইনি প্রশাসন ও খেলাফতের তোয়াক্কা করেন না। যখনই ইনি মিসরের খেলাফতকে নিজের চলার পথের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে দেখলেন, সাথে সাথে খলীফাকেই ক্ষমতাচ্যুত করে দিলেন। নিজের সামরিক শক্তি ও বিচক্ষণতার কারণেই ইনি এমন সাহসী পদক্ষেপ হাতে নিতে পেরেছেন।'

হরমুন বলে যাচ্ছেন আর গভীর মনোযোগ সহকারে শুনছে খৃস্টান কমান্ডার। হরমুন বলছিলেন– 'সালাহুদ্দীন আইউবী তার জাতির এই দুর্বলতাটা বুঝে ফেলেছেন যে, অসামরিক নেতৃত্ব ক্ষমতালোভী। আর এটি এমনি এক লোভ, যা মানুষের মধ্যে সম্পদের মোহ ও মদ-নারীর নেশার জন্ম দেয়। আমি শুধু সেই সেনা অফিসারদেরই হাত করতে পেরেছি, যাদের মধ্যে ক্ষমতার লোভ আছে। এ কারণে আমরা বেশী প্রভাব ফেলছি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উপর। সামরিক বাহিনীকে দুর্বল করার পন্থা হল, জনমনে তাদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করতে হবে। এটি আমার দায়িত্ব, যা আমি পালন করে যাচ্ছি। আপনি হয়ত বা আমার সাথে একমত হবেন না, তবু আমি আপনাকে অবহিত করতে চাই যে, সালাহুদ্দীন আইউবীকে সহজে আপনি যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত করতে পারবেন না। আইউবী শুধু লড়াই করার জন্য লড়ে না। তার প্রত্যয়ভিত্তি এমন এক পরিকল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত, যা তার সকল সৈনিকের কাছে স্পষ্ট। তার একটি মৌলিক গুণ হল, তিনি তার খলীফা কিংবা অসামরিক নেতৃত্বে থেকে নির্দেশ নেন না। তিনি একজন কট্টর মুসলমান। তিনি বলেন, আমি নির্দেশ গ্রহণ করি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে। আমার যেসব গুপ্তচর বাগদাদে অবস্থান করছে, তারা আমায় তথ্য দিয়েছে যে, আইউবী নূরুদ্দীন জঙ্গীর যোগসাজশে এখান থেকে বৈপ্লবিক কর্মসূচী প্রেরণ করেছেন, যার বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গেছে। তার একটি হল, 'আমীরুল ওলামা' থেকে ফতুয়া নিয়ে প্রচার করা হয়েছে যে, খেলাফত হবে মাত্র

একটি আর তা হবে বাগদাদের খেলাফত। এই খেলাফত অন্য দেশ সম্পর্কে কোন নির্দেশ জারি করতে হলে আগে সামরিক কর্মকর্তাদের অনুমোদন নিতে হবে। যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে সামরিক কর্মকর্তাদের ছাড়া অন্য কারো হাত থাকবে না। দূরদূরান্ত অঞ্চলে লড়াইরত সেনাপতিদের কাছে খলীফার কোন নির্দেশ পাঠাতে পারবেন না। তৃতীয়তঃ খোতবায় খলীফার নাম উল্লেখ করা যাবে না। তাছাড়া খেলাফতের প্রভাব নিঃশেষ করার জন্য আইউবী নির্দেশ জারী করেছেন যে, খলীফা, খলীফার নায়েব বা অন্য কেউ পরিদর্শন-পর্যবেক্ষণ কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে যখন বাইরে বের হবেন, তখন জনগণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, স্লোগান দিতে পারবে না, এমনকি সালাম পর্যন্ত করতে পারবে না।

'সালাহুদ্দীন আইউবী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করেছেন, তাহল, তিনি শিয়া-সুন্নী বিভেদ মিটিয়ে দিয়েছেন। তিনি শিয়াদেরকে প্রশাসন ও সেনাবাহিনীতে সুন্নীদের সমান মর্যাদা প্রদান করেছেন এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে শিয়া পণ্ডিতদের সম্মতি আদায় করে নিয়েছেন যে, তারা ইসলামের পরিপন্থী আচার-অনুষ্ঠান বর্জন করে চলবে। সালাহুদ্দীন আইউবীর এমন পদক্ষেপ আমাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এখন আমাদের উচিত মুসলমানদের প্রশাসনকে সালাহুদ্দীন আইউবী ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা। অবশ্য এ মিশনের উপর কাজ চলছেও বটে।'

'আমাদের শত্রুতা সালাহুদ্দীন আইউবীর সাথে নয়- আমাদের শত্রু ইসলাম। আমাদের যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে। আমাদের চেষ্টা করা দরকার, আইউবীর মৃত্যুর পর এ জাতি যেন আর কোন আইউবী জন্ম দিতে না পারে। এ জাতিটাকে ভুল ও ভিত্তিহীন বিশ্বাসের অস্ত্র দ্বারা শেষ করে দাও। তাদের মধ্যে ক্ষমতার মোহ ও রাজা হওয়ার উন্মাদনা সৃষ্টি করে বিলাসী বানাও এবং এমন রীতির প্রবর্তন কর, যাতে এরা মসনদের নেশায় পরস্পর খুনাখুনীতে লিপ্ত থাকে। তারপর এই খেলাফতকে তাদের সেনাবাহিনীর ঘাড়ে সাওয়ার করে দাও। আমি নিশ্চিত বলতে পারি, এরা একদিন না একদিন ক্রুশের গোলামে পরিণত হবে। এদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, এদের দ্বীন-ধর্ম ক্রুশের রঙে রঙিন হবে। এরা রাজত্ব ও খেলাফত লাভ করার জন্য পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়বে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিপক্ষকে দমন করার জন্য আমাদের শরণাপন্ন হবে। এখন এখানে আমরা যারা উপস্থিত আছি, সে সময়ে হয়তো কেউ জীবিত থাকব না। আমাদের আত্মা দেখবে, আমি যে ভবিষ্যদ্বাণী করলাম, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ইসলামকে নির্মূল করার জন্য ইহুদীরা তোমাদেরকে তাদের মেয়েদের উপহার দিচ্ছে। এদেরকে তোমরা কাজে লাগাও। ইহুদীদেরকে তোমরা শুধু এজন্য শত্রু মনে কর যে, তারা জেরুজালেমকে তাদের পবিত্র ভূমি এবং

ফিলিস্তীনকে তাদের আবাস মনে করে। তাদের বলে দাও যে, হ্যাঁ, ফিলিস্তীন তোমাদেরই। এ ভূখণ্ডটি আমরা তোমাদেরই দিয়ে দেব। এখন আমাদের সঙ্গ দাও, সহযোগিতা কর। তবে সাবধান! ইহুদীরা কিন্তু অতি চতুর জাতি। তোমাদের পক্ষ থেকে কোন আশংকা দেখা দিলে তখন কিন্তু তারা মোড় ঘুরিয়ে দাঁড়াবে, তোমাদের বিপক্ষে চলে যাবে। তাদের সম্পদ ও মেয়েদের ব্যবহার কর, বিনিময়ে তাদেরকে ফিলিস্তীনের মুলো দেখাও।

✿ ✿ ✿

শোবক ও কার্ক দুর্গ থেকে বেশ দূরের বিস্তীর্ণ একটি ভূখণ্ড। মাটি ও বালির পর্বত এবং উঁচু-নীচু টিলাবেষ্টিত এই ভূখণ্ডটি অন্তত দেড় মাইল দীর্ঘ, দেড় মাইল চওড়া। ভূখণ্ডটির বিপুল এলাকা বালুকাময় মরুপ্রন্তর। কোথাও ছোট-বড় অনেক গর্ত, কোথাওবা পাথরখণ্ড ছড়ানো।

খৃস্টান শাসকবর্গ ও সেনা কমান্ডারগণ যে সময়ে বসে বসে ইসলামের মূলোৎপাটনের পরিকল্পনা আঁটছিল এবং অতি ভয়াবহ পন্থা-পদ্ধতি ঠিক করছিল, সে সময়ে মরুভূমির এ ভূখণ্ডে চলছিল যুদ্ধের মহড়া। হাজার হাজার পদাতিক সৈন্য, ঘোড়সওয়ার ও উটসওয়ার দৌঁড়াদৌঁড়ি-ছুটাছুটি করছিল। চকমক করছিল তরবারী ও বর্শা। উট-ঘোড়ার ছুটাছুটিতে কালো মেঘের ন্যায় আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল মরুদ্যানের ধুলোবালিতে। অশ্বগতিকে হার মানাবার বাসনায় তীরবেগে দৌঁড়াবার চেষ্টা করছে পদাতিক বাহিনী। খানা-খন্দক ও গর্ত লাফিয়ে পার হচ্ছে অশ্বারোহীরা। পার্শ্ববর্তী পর্বতচূড়ায় শান্ত মনে ঘোরাফেরা করছে দু'জন সৈনিক। এক পাহাড়ের পাদদেশ থেকে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা ছুটে এসে আরেক পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে নিভে যাচ্ছে। হৈ চৈ-কলরোলে কেঁপে উঠেছে আকাশ।

উঁচু এক টিলার উপর ঘোড়ার পিঠে বসে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী গভীর মনোযোগ সহকারে অবলোকন করছেন এ দৃশ্য। দীর্ঘক্ষণ ধরে এ মাঠের আশপাশের পাহাড়-পর্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। সঙ্গে তাঁর দু'জন নায়েব।

'যেরূপ দ্রুতগতিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, তাতে আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, নতুন সৈনিকরা অল্প ক'দিনের মধ্যেই অভিজ্ঞ সৈনিকরূপে গড়ে উঠবে। যে অশ্বরোহীদের আপনি এত চওড়া গর্ত লাফিয়ে অতিক্রম করতে দেখলেন, তারা সকলেই কার্ক থেকে আগত নওজোয়ান। আমি তাদেরকে আনাড়ী ভেবেছিলাম। তীরান্দাজদের মানও দিন দিন উন্নত হচ্ছে।' বলল এক নায়েব।

'শুধু অস্ত্র চালনা আর সুস্থ-সবল দেহ দিয়ে অভিজ্ঞ সৈনিক হওয়া যায় না। অভিজ্ঞ সৈনিক হতে হলে বুদ্ধি-বিচক্ষণতা এবং আদর্শিক চেতনাও অনিবার্য। আমার এমন সৈনিকের প্রয়োজন নেই, যারা এলোপাতাড়ি দুশমনের উপর আঘাত হানবে আর

শুধুই ধ্বংস করবে। প্রয়োজন আমার এমন সৈনিকের, যাদের জানা থাকবে যে, তাদের শত্রু কে এবং তাদের লক্ষ্য কি। আমার সৈনিকদের জানা থাকতে হবে যে, তারা আল্লাহর বাহিনী এবং তারা আল্লাহর পথে লড়াই করছে। যে জোশ ও চেতনা আমি প্রত্যক্ষ করছি, তা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু লক্ষ্য যদি স্পষ্ট না হয়, নিজেদের অবস্থান-মর্যাদা যদি পরিস্কার না হয়, তাহলে এই জোশ যে কোন মুহূর্তে ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে। তাদের মন-মগজে এ কথাটা বদ্ধমূল করে দাও যে, ফিলিস্তীন আমাদের কেন উদ্ধার করতে হবে। তাদের জানিয়ে দাও, গাদ্দারী কত বড় অপরাধ। তাদের বুঝাও যে, তোমরা শুধু ফিলিস্তীনের জন্যই নয়– বরং ইসলামের সুরক্ষা ও বিস্তারের জন্য লড়াই করছ। তোমরা যুদ্ধ করছ ভবিষ্যত প্রজন্মের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য। সমর-প্রশিক্ষণের পর তাদের ওয়াজ কর, স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দাও তাদের জাতীয় মর্যাদার প্রকৃত স্বরূপ।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

'প্রতি সন্ধ্যায় তাদেরকে নসীহত করা হয় মহামান্য সালারে আজম! আমরা তাদেরকে আদর্শ বিবর্জিত শুধু হায়েনা বানাচ্ছি না।' বলল এক নায়েব।

'তাদের হৃদয়ে জাতির সেই কন্যাদের কথাও স্মরণ করিয়ে দাও, যারা কাফেরদের হাতে অপহৃত ও অপমানিত হয়েছে ও হচ্ছে। তাদের স্মরণ করিয়ে দাও সেই কুরআনের কথা, যা খৃস্টানদের পায়ের তলায় দলিত হয়েছে। তাদের স্মরণ করিয়ে দাও আল্লাহর ঘর মসজিদের কথা, যাকে আল্লাহর দুশমনরা পরিণত করেছে ঘোড়ার আস্তাবলে। মনে রেখো, নারীর ইজ্জত আর মসজিদের সম্মান মুসলমানদের জাতীয় মর্যাদার প্রতীক। আমাদের সৈনিকদের জানিয়ে দাও, যেদিন তোমরা নারীর সম্ভ্রম আর মসজিদের সম্মানের কথা ভুলে যাবে, সেদিন মনে করবে পৃথিবীটা তোমাদের জন্য জাহান্নামে পরিণত হয়ে গেছে। আর আখেরাতের শাস্তি কত ভয়াবহ হবে, তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

পাহাড়ের উপর দু'চারজন করে যে সৈনিক ঘোরাফেরা করছিল, ওরা প্রহরী। খৃস্টানদের জবাবী হামলার আশংকা আছে। তাই এই প্রহরার আয়োজন।

পাহাড়ের চূড়ায় আরোহন করছিল তাদের দু'প্রহরী। হঠাৎ তারা দাঁড়িয়ে যায়। তারা দেখতে পায় নীচে একখণ্ড পাথরের উপর দাঁড়িয়ে সালাহুদ্দীন আইউবী। তাঁর পিঠটা তাদের দিকে। দূরত্ব দু'আড়াইশ' গজ মাত্র। এক প্রহরী বলল, বেটার পিঠটা ষোলআনা আমাদের সামনে। এখান থেকে তীর ছুঁড়ে বেটার হৃদপিণ্ড পার করিয়ে দিতে পারি। তুমি কি বলো?'

'তারপর পালাবে কোথায়?' জিজ্ঞেস করে অপরজন।

'তা ঠিক, এরা যদি আমাদের ধরে নিয়ে মেরে ফেলতো, তাহলে তো ল্যাঠা চুকে

যেতো। কিন্তু তাতো করবে না। ধরতে পারলে পিঞ্জিরায় আবদ্ধ করে এমন শাস্তি দেবে যে, আমরা আমাদের সাথীদের নাম বলে দিতে বাধ্য হবো।' বলল প্রথমজন।

'এ কাজটা তারই রক্ষীদের জন্য ছেড়ে দাও। সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করা যদি এতই সহজ হত, তাহলে এখনো তিনি জীবিত থাকতেন না।' বলল একজন।

'কাজটা এখন হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। শুনেছি, ফাতেমীরা বলাবলি করছে, তোমরা আমাদের থেকে দেদারছে অর্থ নিচ্ছ আর কাজ করছ না কিছুই।' বলল দ্বিতীয়জন।

আশা করি কাজটা দ্রুত হয়ে যাবে। শুনেছি, হাশীশীরা খুব সাহসী। জীবন হাতে নিয়ে তারা একজনকে খুন করতে পারে। এ যাবত তারা কিছুই করে দেখায়নি। আমি এও জানি যে, আইউবীর রক্ষীদের মধ্যে তিনজন হাশীশী আছে। আইউবীর রক্ষী বাহিনীতে ঢুকে যাওয়া তাদের কম যোগ্যতা নয়। তারা কারা কেউ জানে না। কিন্তু তারা আইউবীকে হত্যা করবে কবে? বেটারা ভয় পাচ্ছে মনে হয়।' কথা বলতে বলতে সামনের দিকে হেঁটে যায় প্রহরীদ্বয়।

❁ ❁ ❁

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর অবর্তমানে মিসরে বিরোধী পক্ষের গোপন অপতৎপরতা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তা সামাল দেয়া কেবল কোন অলৌকিক শক্তির পক্ষেই সম্ভব ছিল। এই অপতৎপরতার নেপথ্যে ছিল খৃস্টানরা আর বাস্তবায়ন করেছে সেইসব মুসলিম শাসকবর্গ, যারা ছিল সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর একান্ত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। খৃস্টানরা বেশকিছু ইহুদী ললনা হাত করে নিয়েছিল, যারা অবলীলায় আরবী-মিসরী ভাষা বলতে পারত এবং যখন যেমন প্রয়োজন তেমন রূপ ধারণ করতে পারত। মিসরের প্রশাসনের অনেক কর্মকর্তা ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারা জাতীয় চেতনা ও মর্যাদাবোধ হারিয়ে ফেলেছিল। ফাতেমীরা তাদেরকে তাদের ক্রীড়নকে পরিণত করে এবং হাসান বিন সাব্বাহর হাশীশীদের সহযোগিতায় দেশে অরাজকতা বিস্তারে মেতে উঠে।

সে যুগের ঐতিহাসিকগণ– যাদের মধ্যে আসাদুল আসাদী, ইবনুল আছীর, আবুল ফাররা ও ইবনুল জাওযী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য- লিখেছেন, সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে খৃস্টানরা সুদানীদেরকে মিসর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত করেছিল। মিসরে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর যে অল্প ক'জন সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, তারাও বিদ্রোহ করার জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সালাহুদ্দীন আইউবীর সমর্থকরা চরম উৎকণ্ঠায় পড়ে যায় যে, সুলতান যদি সময় থাকতে এসে না পৌঁছেন, তাহলে মিসর হাতছাড়া হয়ে যাবে নিশ্চিত।

উল্লিখিত ঐতিহাসিকদের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে একটি ঘটনার উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, খিজরুল হায়াত নামক এক ব্যক্তি ছিল সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর অর্থমন্ত্রী। তিনি আইউবীর অতি বিশ্বস্ত ও বড় সৎলোক ছিলেন।

একদিনের ঘটনা। খিজরুল হায়াত রাতে বাড়ি ফিরলেন। অন্ধকার রাত। ঘরে প্রবেশ করবেন বলে। এমনি সময়ে রাতের আঁধার ভেদ করে একটি তীর ছুটে আসে তার দিকে। তীরটি তার পিঠ ভেদ করে হৃদপিন্ডে আঘাত হানে। চীৎকার দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। চীৎকার শুনে ঘরের লোকেরা ছুটে আসে। দৌড়ে আসে চাকর-বাকররা। পিঠে তীরবিদ্ধ খিজির উপুড় হয়ে পড়ে আছেন মাটিতে। হৃদয়বিদারক এক দৃশ্যের অবতারণা হল। শোকের ছায়া নেমে এলো বাড়িময়।

হঠাৎ একজন দেখতে পেল, খিজরুল হায়াতের ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলি মাটির উপর রাখা। মাটিতে কি যেন লিখেছেন তিনি। তিনি মৃত। কি লিখেছেন? দেখার জন্য কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে আসে অনেকে। একটি মাত্র শব্দ 'মোসলেহ'। আরবী শব্দ 'মোসলেহ' এর 'হা' বর্ণটিও পুরোপুরি লিখতে পারেননি। ঘাতকের তীর তার প্রাণ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তার আগেই।

লাশ তুলে নেয়া হল। সংরক্ষণ করে রাখা হল খিজরুল হায়াতের মৃত্যুর পূর্বক্ষণে লেখা শব্দটি। ব্যাপক অর্থ লুকিয়ে আছে এই একটি শব্দের মধ্যে। কোতোয়াল গিয়াসকে ডেকে পাঠানো হল। গিয়াস বিলবিস একাধারে কোতোয়াল ও পুলিশ বিভাগের প্রধান। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিশ্বস্ত আমলা। আলী বিন সুফিয়ানের ন্যায় অভিজ্ঞ গুপ্তচর।

সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন গিয়াস বিলবিস। গভীর দৃষ্টিতে দেখলেন লেখাটি। এমন সময়ে খিজরুল হায়াতের মৃত্যুসংবাদ শুনে এসে উপস্থিত হন নগর প্রশাসক মোসলেহুদ্দীন। তাকে দেখেই পা দ্বারা লেখাটি মুছে ফেললেন গিয়াস বিলবিস । নগর প্রশাসক হওয়ার সুবাদে কোতোয়ালি বিভাগ ছিল তারই অধীনে। তিনি বিলবিসকে আদেশের সুরে বললেন, 'আগামীকালের সূর্যোদয়ের আগেই আমি ঘাতকের সন্ধান পেতে চাই। এর বেশী এক মুহূর্ত সময়ও আমি দিতে পারবো না।' ঘাতককে শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে বলে নিশ্চয়তা দেন গিয়াস বিলবিস। স্থান ত্যাগ করে চলে যান তিনি।

রাতেই বৈঠকে বসেন বিলবিস। খিজরুল হায়াতের নায়েব-সহযোগী ও ঘনিষ্ঠজনদের সাথে কথা বলেন তিনি। জানতে চান, হত্যার দিনে সারাদিন খিজরুল হায়াত কি কি কাজে ব্যস্ত ছিল। তারা জানায়, গতকাল নগর প্রশাসনের উচ্চপদস্ত কর্মকর্তাদের মিটিং বসেছিল। সেনাবাহিনীর কোন প্রতিনিধি তাতে উপস্থিত ছিল না। খিজরুল হায়াতের নায়েব খিজিরের সহযোগিতার জন্য বৈঠকে উপস্থিত ছিল। বৈঠকে সামরিক খাতের ব্যয় প্রসঙ্গে আলোচনা উঠে। খিজির বলল, মিসরের সাধারণ ব্যয়ের পরিমাণ আরো হ্রাস করতে হবে, সামরিক খাতের বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। কারণ, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী শোবকে বহু নতুন সৈন্য ভর্তি করেছেন। তাদের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

নগর প্রশাসক মোসলেহুদ্দীন তার এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, সামরিক ব্যয় সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। নতুন সৈন্য ভর্তি না করে আমাদের প্রয়োজন সেই সৈন্যদের সমস্যার সমাধান করা, যারা পূর্ব থেকেই দেশের বোঝা হয়ে আছে। তিনি আরো বলেন, মিসরের সৈন্যরা অশান্ত হয়ে উঠেছে। শোবক থেকে যে গনীমত হাতে এসেছিল, এখানকার সৈন্যদেরকে তার ভাগ দেয়া হয়নি।

জবাবে খিজরুল হায়াত বললেন, 'আপনি কি ভুলে গেছেন যে, আমীরে মেসের সৈন্যদের মাঝে গনীমত বন্টন করার প্রথা বিলুপ্ত করে দিয়েছেন? তার এ ফয়সালা অতি প্রশংসনীয়। যেসব সৈন্য গনীমতের লোভে যুদ্ধ করে, তাদের কোন আদর্শ এবং দেশপ্রেম থাকে না।

বিষয়টি নিয়ে দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে মোসলেহুদ্দীন বলেই ফেললেন যে, আমীরে মেসের শামী ও তুর্কী সৈন্যদের সাথে যতটুকু সদ্ব্যবহার দেখান, মিসরীয়দের সাথে ততটুকু দেখান না। উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি আরো আপত্তিকর কিছু কথা বলেন। জবাবে খিজির বললেন, মোসলেহুদ্দীন! আমি অনুভব করছি, তোমার কণ্ঠে ক্রুসেডার ও ফাতেমী কথা বলছে। মোসলেহুদ্দীনের উত্তেজনা আরো বেড়ে যায় এবং সে অবস্থায়ই বৈঠক মুলতবী হয়ে যায়।

খিজরুল হায়াতের নায়েব জানায়, বৈঠকের পর মোসলেহুদ্দীন খিজরুল হায়াতের দফতরে আসেন। সেখানেও দু'জনের মধ্যে চটাচটি-বাকবিতণ্ডা হয়। মোসলেহুদ্দীন খিজরুল হায়াতের একথার উপর সম্মতি নিতে চেষ্টা করছিল যে, মিসরী বাহিনী আইউবীর প্রতি সন্তুষ্ট নয়। তিনি বৈঠকে বলা কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করেন। খিজরুল হায়াত বললেন, 'বিষয়টা যদি এমনই হয়, তা হলে তোমার পক্ষ থেকে আমি সমস্যাটা আমীরে মেসেরের নিকট লিখে পাঠাব। তবে আমি এ কথাটা অবশ্যই লিখব যে, তুমি বৈঠকে সভাসদদের বুঝাবার চেষ্টা করেছ যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সৈন্যদের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ করছেন। আমি আরো লিখব, তুমি আমাদের মনে এ বিশ্বাস জন্মাবারও চেষ্টা করেছ যে, সুলতান অইউবী শোবকের সব গনীমত শামী ও তুর্কীদের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে মিসরীয়দের বঞ্চিত করেছেন। পত্রে আমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে এ কথাও অবহিত করব যে, তুমি তোমার অভিযোগগুলোর পক্ষে মত দেয়ার জন্য আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছ এবং সৈন্যদের প্রচারিত গুজব সম্পর্কে বলেছ, এসব গুজব নয়– বাস্তব সত্য।'

খিজরুল হায়াতের নায়েব আরো জানায়, মোসলেহুদ্দীন যখন খিজিরের কক্ষ থেকে বের হন, তখন তাকে এ কথাও বলতে শোনা গিয়েছিল যে, ঠিক আছে, যদি জীবনে বেঁচে থাকতে পার, তাহলে এসব লিখে সুলতানকে পত্র দিও।

গিয়াস বিলবিস তৎক্ষণাৎ মোসলেহুদ্দীনকে কিছু জিজ্ঞাসা করা সমীচীন মনে করলেন না। তার কারণ, প্রথমত পদমর্যাদায় তিনি তার বড়। দ্বিতীয়ত এর পক্ষে তিনি আরো তথ্য সংগ্রহ করতে চান। তিনি আশংকা করছিলেন, সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া যদি মোসলেহুদ্দীনের প্রতি হাত বাড়ান, তবে উল্টো তিনি নিজেই বিপদে পড়তে পারেন। সুলতান আইউবী যদি কায়রো উপস্থিত থাকতেন, তাহলে বিলবিস তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে পারতেন। বিলবিস বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ হত্যাকাণ্ড ব্যক্তি আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ নয়। এর পিছনে রয়েছে জাতিবিধ্বংসী সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র। যা হোক, রাতে তিনি আরো কয়েকজনের দরজায় করাঘাত করেন। কিন্তু আর কোন তথ্য পেলেন না।

পরবর্তী সাক্ষ্য-প্রমাণে যা পাওয়া গিয়েছিল, তার সারমর্ম হল, হত্যাকাণ্ডের পরের রাত মোসলেহুদ্দীন যখন ঘরে ফিরেন, তখন তার প্রথমা স্ত্রী তাকে নিজ কক্ষে ডেকে নিয়ে যায়। স্ত্রী বিশটি স্বর্ণমুদ্রা মোসলেহুদ্দীনের সামনে রেখে বলল, খিজরুল হায়াতের ঘাতক এই মুদ্রাগুলো ফেরত দিয়েছে এবং বলে গেছে, তোমার সাথে নাকি তার পঞ্চাশ আশরাফী এবং দু'টুকরো সোনার চুক্তি ছিল। সে তার দায়িত্ব পালন করেছে। কিন্তু তুমি তাকে দিয়েছ মাত্র বিশ আশরাফী। তার ভাষায় তুমি তাকে ধোঁকা দিয়েছ! এখন সে তোমার থেকে একশত আশরাফী এবং দু'টুকরো সোনা আদায় করে ছাড়বে। দু'দিনের মধ্যে না পৌঁছুলে খিজরুল হায়াতের ন্যায় তোমারও একই পরিণতি ঘটবে বলে সে হুমকি দিয়ে গেছে।

শোনামাত্র মোসলেহুদ্দীনের মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে যায়। বিস্ফারিত নয়নে খানিক নীরব থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, 'এসব তুমি কি বলছ? কার কথা বলছ? কই আমি তো খিজরুল হায়াতকে হত্যা করার বিনিময়ে কাউকে অর্থ দেইনি!'

'না, তুমিই খিজরুল হায়াতের ঘাতক। জানি না, কেন তুমি তাকে হত্যা করেছ। আমি এতটুকু জানি, তার হত্যাকারী তুমিই।" বলল স্ত্রী।

মোসলেহুদ্দীনের প্রথমা স্ত্রী। নাম ফাতেমা। বয়স বড়জোর ত্রিশ বছর। অতিশয় রূপসী । মাস কয়েক হল মোসলেহুদ্দীনের ঘরে আগমন ঘটেছে আরেক অপরূপ এক সুন্দরী যুবতীর। সে যুগে একাধিক স্ত্রী রাখা ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। এক স্ত্রী অপর স্ত্রীকে হিংসা করত না। কিন্তু মোসলেহুদ্দীন দ্বিতীয়া স্ত্রীকে ঘরে এনে প্রথমা স্ত্রীর কথা একেবারেই ভুলে যান। নতুন স্ত্রীর আগমনের পর ফাতেমার কক্ষে যাওয়া ছেড়েই দেন মোসলেহুদ্দীন। মহিলা বেশ ক'বার ডেকেও পাঠিয়েছিল তাকে। কিন্তু তিনি যাননি একবারও। ফলে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে প্রথমা স্ত্রী। এই যে লোকটি আশরাফীগুলো ফেরত দিয়ে গেল, বোধ হয় মোসলেহুদ্দীন থেকে বড় রকমের প্রতিশোধ নিতে চায় সে। তাই লোকটি মোসলেহুদ্দীনের ক্ষুব্ধ স্ত্রীকে জানিয়ে দিল যে, মোসলেহুদ্দীনই খিজরুল হায়াতকে খুন করিয়েছে।

'এ ব্যাপারে তুমি কোন কথা বলতে পারবে না। এটি আমার কোন দুশমনের ষড়যন্ত্র হবে নিশ্চয়। আমার ও তোমার মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করতে চাচ্ছে কেউ।' কঠোর ভাষার বলল মোসলেহুদ্দীন।

তোমার হৃদয়ে আমার শত্রুতা ছাড়া আর আছেই বা কি? জানতে চায় স্ত্রী।

''আমার মনে এখনো তোমার সেই প্রথম দিনের ভালোবাসা বিরাজ করছে। আচ্ছা, লোকটিকে কি তুমি চেন?' বলল মোসলেহুদ্দীন।

'লোকটি মুখোশপরা ছিল। কিন্তু তোমার মুখোশ তো উন্মোচিত হয়ে গেল। আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি। তুমি খুনী।' বলল স্ত্রী।

মোসলেহুদ্দীন জবাবে কি যেন বলতে চাইল। কিন্তু স্ত্রী তাকে থামিয়ে দিয়ে নিজে বলল, 'আমার মনে হয়, তুমি রাজকোষের সম্পদ আত্মসাৎ করেছ। খিজরুল হায়াত সে খবর পেয়ে গিয়েছিল। তাই ভাড়াটিয়া খুনী দ্বারা তুমি তাকে হত্যা করে পথের কাঁটা দূর করেছ।'

'তুমি আমার উপর মিথ্যা অপবাদ দিও না। রাজকোষের অর্থ আত্মসাৎ করা আমার কী প্রয়োজন?'

তোমার নয়– টাকার প্রয়োজন তার, যাকে তুমি বিবাহ ছাড়াই ঘরে স্থান দিয়েছ।' অকস্মাৎ আগুনের মত জ্বলে উঠে বলল স্ত্রী, 'মদের জন্য তোমার টাকার প্রয়োজন এ অভিযোগ যদি সত্য না হয়ে থাকে, তাহলে বল, এ চারটি গোড়াগাড়ী কোথেকে এসেছে? নিত্যদিন তোমার ঘরে যে নর্তকীরা আসে, তারা কি ফ্রি আসে? প্রতিদিন যে মদের আসর বসাও, তার ব্যয় আসে কোথা থেকে? বল।'

'আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি চুপ হয়ে যাও। আমাকে খোঁজ নিয়ে জানতে দাও লোকটি কে ছিল। তবেই ঘটনার প্রকৃতরূপ তোমার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে যাবে।' বলল মোসলেহুদ্দীন।

'এখন আর আমি চুপ থাকতে পারব না। আমার বুকটা তুমি প্রতিশোধ-স্পৃহায় ভরে দিয়েছ। আমি সমগ্র মিসরকে জানিয়ে দেব, আমার স্বামী খুনী, একজন ঈমানদারের ঘাতক, তুমি আমার ভালোবাসার হন্তা। এ হত্যার প্রতিশোধ আমি নেবই।' বলল স্ত্রী।

অনুনয়-বিনয় করে স্ত্রীর মুখ বন্ধ করতে চান মোসলেহুদ্দীন। অবশেষে দু'দিন কোন কথা বলবে না বলে স্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেয় তাকে। এ সময়ে মোসলেহুদ্দীন উক্ত লোকটিকে খুঁজে বের করে প্রমাণ করবেন যে, তিনি ঘাতক নন। মোসলেহুদ্দীন তার স্ত্রীকে আরো জানান, গিয়াস বিলবিস কয়েকজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে এবং শীঘ্রই আসল ঘাতকের সন্ধান বেরিয়ে আসবে।

❁ ❁ ❁

রাত কেটে যায়। চলে যায় পরের দিনও। মোসলেহুদ্দীন ঘর থেকে উধাও। তার দ্বিতীয় স্ত্রী বা গণিকারও পাত্তা নেই। সন্ধ্যায় মোসলেহুদ্দীন ঘরে ফিরেন এবং সোজা ঢুকে পড়েন প্রথমা স্ত্রীর কক্ষে। প্রেম-ভালোবাসার কথা শুরু করেন তার সাথে। তার কাছে আসতে চাইছিল না স্ত্রী। কিন্তু এক পর্যায়ে ভালোবাসার প্রতারণার জালে আটকে যায় মহিলা। মোসলেহুদ্দীন তাকে জানায়, যে লোকটি তাকে বিশ আশরাফী দিয়ে গিয়েছিল, তাকে খুঁজছে সে। খানিক পর ঘুমিয়ে পড়ে স্ত্রী। সে রাতের জন্য মোসলেহুদ্দীন তার চাকরদের ছুটি দিয়ে দিয়েছিলেন। ঘরময় স্তব্ধতা বিরাজ করছে, যেমনটি অতীতে কখনো দেখা যায়নি। মোসলেহুদ্দীন স্ত্রীর কক্ষে শুয়ে থাকেন দীর্ঘক্ষণ। তারপর উঠে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান।

মধ্যরাত। মোসলেহুদ্দীনের ঘরের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে যায় এক ব্যক্তি। তার কাঁধের উপর চড়ে বসে একজন। দু'জনকে সিঁড়ি বানিয়ে দেয়াল টপকে ভেতরে লাফিয়ে পড়ে তৃতীয় একজন। ভেতর থেকে প্রধান ফটক খুলে দেয় সে। ভেতরে ঢুকে পড়ে তার সঙ্গীদ্বয়।

প্রহরার জন্য একটি কুকুর আছে মোসলেহুদ্দীনের ঘরে। প্রতিরাতেই ছাড়া থাকে কুকুরটি। কিন্তু আজ রশি দিয়ে বাঁধা। সম্ভবত চাকররা যাওয়ার সময় কুকুরটি ছেড়ে যেতে ভুলে গেছে।

ঘোর অন্ধকার। পা টিপে টিপে এগিয়ে চলছে তিনজন। একজনের পিছনে আরেকজন। তার পিছনে অপরজন। মোসলেহুদ্দীনের স্ত্রীর (যার নাম ফাতেমা) কক্ষের দরজায় করাঘাত করে একজন। দরজা খুলে যায়। অন্ধকার। ভিতরে ঢুকে পড়ে তিনজন। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে মহিলার খাটের কাছে চলে যায় তারা। ফাতেমার মুখে হাত পড়ে একজনের। চোখ খুলে যায় তার। মনে করেছিল স্বামী মোসলেহুদ্দীনের হাত। জাগ্রত হয়েই হাতটা ধরে ফেলে ফাতেমা জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

জবাবে একজন একটি কাপড় গুঁজে দিলো তার মুখের মধ্যে। সাথে সাথে লোকগুলো ঝাঁপটে ধরে ফাতেমাকে। আরেকটি কাপড় কষে চোখ-মুখ বেঁধে ফেলে আরেকজন। একটি বস্তা বের করে মুখ মেলে ধরে একজন। অপর দু'জন হাত-পা বেঁধে বস্তার ভেতর ভরে ফেলে ফাতেমাকে। রশি দিয়ে বেঁধে ফেলে বস্তার মুখ। দু'জন বস্তাটি কাঁধে তুলে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

ঘটনার সময়ে ঘরে কোন চাকর ছিল না। দাসীরাও সব ছুটিতে। সামান্য দূরে গাছের সাথে বাঁধা ছিল তিনটি ঘোড়া। লোক তিনজন চড়ে বসে ঘোড়ার পিঠে।

বস্তাটি নিজের সম্মুখে রেখে নেয় একজন। কায়রো থেকে বেরিয়ে ইস্কান্দারিয়া অভিমুখে রওনা হয় ঘোড়া তিনটি, ফিরে আসেন মোসলেহুদ্দীনও।

সকালবেলা চাকর-চাকরানীরা ফিরে আসে। ফাতেমাকে তালাশ করে মোসলেহুদ্দীন। দু'জন চাকরানী খোঁজাখোঁজি করে এসে জানায়, তিনি ঘরে নেই। কোথায় গেল ফতেমা? শুরু হয় তল্লাশী। কিন্তু বাড়ীময় তন্নতন্ন করে খুঁজে- পেতেও পাওয়া গেল না মোসলেহুদ্দীনের প্রথমা স্ত্রী ফাতেমাকে।

এক চাকরানীকে নির্জনে নিয়ে যায় মোসলেহুদ্দীন। দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন তার সাথে। তারপর তাকে সাথে নিয়ে চলে যান গিয়াস বিলবিসের কাছে। মোসলেহুদ্দীন গিয়াস বিলবিসকে জানায়, গত রাতে আমার স্ত্রী নিখোঁজ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, ফাতেমাই খিজরুল হায়াতকে হত্যা করিয়েছে এবং খিজির মৃত্যুর সময় হাতের আঙ্গুল দ্বারা যে মোসলেহ শব্দটি লিখেছিলেন, সেটি মূলত তিনি মোসলেহুদ্দীনের স্ত্রী লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যু তাকে বাকীটুকু লিখতে দেয়নি। তার প্রমাণস্বরূপ মোসলেহুদ্দীন সাথে নিয়ে যাওয়া চাকরানীকে পেশ করে। চাকরানী বলে—

'গত পরশু সন্ধ্যায় মুখোশ পরিহিত অপরিচিত এক ব্যক্তি ঘরে এসেছিল। আমার মনিব মোসলেহউদ্দীন তখন ঘরে ছিলেন না। আগন্তুক দরজায় করাঘাত করলে আমি দরজা খুলে দিই। আগন্তুক বলল, আমি ফাতেমার সাথে দেখা করতে চাই। আমি বললাম, ঘরে কোন পুরুষ নেই; এ মুহূর্তে আপনি তার সাথে দেখা করতে পারবেন না। লোকটি বলল, তাকে বলুন, আমি আশরাফীগুলো ফেরত দিতে এসেছি। চুক্তি অনুযায়ী সবগুলো স্বর্ণমুদ্রা না দিলে আমি নেব না। আমি ফাতেমাকে গিয়ে বললে তিনি লোকটিকে ভেতরে ডেকে নিয়ে যান।

চাকরানী আরো বলে, ম্যাডাম আমাকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে বলেন এবং বলে দেন যে, হঠাৎ কেউ এসে পড়লে আমাকে সংবাদ দিও। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি ভেতরের যে ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ শুনতে পেয়েছি, তাতে লোকটির ক্ষোভ এবং ফাতেমার অনুনয়-বিনয় প্রকাশ পাচ্ছিল। তাদের কথোপকথন থেকে আমি যা বুঝতে পেরেছি, তাহল, আমি তোমাকে বলেছিলাম, তুমি আলী বিন সুফিয়ানের নায়েব হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে হত্যা করবে। বিনিময়ে আমি তোমাকে পঞ্চাশটি আশরাফী আর দু'টুকরা সোনা প্রদান করব। কিন্তু তুমি টার্গেট মিস করেছ। হাসান ইবনে আবদুল্লাহর পরিবর্তে তুমি খিজরুল হায়াতকে হত্যা করে এসেছ। তাই যা দিলাম, নিয়ে যাও। জবাবে আগন্তুক বলল, আপনি আমাকে পরিষ্কার বলেছিলেন, হাসান ইবনে আবদুল্লাহ অমুক সময় খিজরুল হায়াতের ঘরে যাবেন। আমি আপনারই নির্দেশনা মোতাবেক ওঁৎ পেতে বসে থাকি। ঠিক সময়ে এক ব্যক্তিকে খিজরুল হায়াতের ঘরের দিকে যেতে দেখলাম। গঠন-প্রকৃতি ঠিক হাসান ইবনে আবদুল্লাহরই ন্যায়। আমি তীর ছুঁড়ে

সেখান থেকে পালিয়ে যাই। খুন করার সময় তো অত ভাবা-চিন্তা যায় না।

লোকটি ফাতেমার নিকট থেকে পঞ্চাশ আশরাফী দাবী করেছিল আর ফাতেমা অননুয়-বিনয় করছিলেন। অবশেষে তিনিও চটে গিয়ে বললেন, আসল লোককে খুন করে আসতে পারলে এই বিশ আশরাফী ছাড়া আরো পঞ্চাশ আশরাফী দেব। আর দু'টুকরা সোনাও পাবে। যাও, কাজ করে আস। লোকটি বলল, আমার কাজ আমি করেছি। পূর্ণ পারিশ্রমিক আদায় না করে আজ আমি যাচ্ছি না। কিন্তু ফাতেমা রাজি হলেন না। লোকটি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে একথা বলে চলে যায় যে, দেবেন না! আমার পাওনা আমি উসুল করে ছাড়ব। ফাতেমা আমাকে বলে দেন যে, এই লোকটির আগমনের সংবাদ কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পায়। আমাকে তিনি দু'টি আশরাফী পুরস্কারও দেন। আজ সকালে তার কক্ষে গিয়ে দেখি, তিনি নেই। আমার মনে হয়, লোকটি প্রতিশোধস্বরূপ তাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

সব শুনে গিয়াস বিলবিস মোসলেহুদ্দীনকে বাইরে বের করে দিয়ে কঠোর ভাষায় চাকরানীকে জিজ্ঞেস করেন, 'বলো, এই গল্প তোমাকে কে পড়িয়েছে? ফাতেমা না মোসলেহুদ্দীন?'

'কেউ নয়, এ তো আমার চোখের দেখা ঘটনা।' চাকরানী জবাব দেয়।

'সত্য বল, ফাতেমা কোথায়? কার সাথে গেছে সে?'

চাকরানী ভয় পেয়ে যায়। সন্তোষজনক কোন জবাব দিতে পারল না সে। বিলবিস বললেন, 'বন্দীশালার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে যেতে চাও? আজ তুমি ফিরে যেতে পারবে না।'

চাকরানী গরীব-অসহায় এক মহিলা। তার জানা ছিল, বন্দীশালার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে গেলে সত্য-মিথ্যা আলগা হয়ে যায়। তার আগে পৃথক হয়ে যায় দেহের জোড়া। মহিলা কেঁদে ফেলে। বলে, এখন আমার উপায় কি? সত্য বললে মনিবের শাস্তি ভোগ করতে হবে আর মিথ্যা বললে সাজা ভোগ করতে হবে আমার। হায় এখন আমি কি করি!

বিলবিস চাকরানীকে সাহস দেন এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। চাকরানী বলল, 'হত্যার ঘটনার দ্বিতীয় দিন মুখোশ পরিহিত এক ব্যক্তি আমার মনিবের ঘরে এসেছিল। মনিব মোসলেহুদ্দীন তখন ঘরে ছিলেন না। আগন্তুক ফাতেমাকে ডেকে পাঠায়। লোকটি সদর দরজার বাইরে আর ফাতেমা ভেতরে। দু'জনের মধ্যে কথা হয়। কিন্তু কি কথা হয়েছে আমরা তা শুনতে পাইনি। আগন্তুক চলে গেলে ফাতেমা কক্ষে ফিরে আসেন। হাতে তার ছোট্ট একটি থলে। ফাতেমা কক্ষে ফেরেন অবনত মস্তকে। পরদিন সন্ধ্যায় মনিব সব চাকর-চাকরানী ও সহিসকে পুরো রাতের জন্য ছুটি দিয়ে দেন।'

'আচ্ছা, এর আগে কি কখনো সব চাকর-চাকরানীকে এভাবে একত্রে ছুটি দেয়া হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করেন বিলবিস।

'না। ইতিপূর্বে একজনের অধিক দু'জনকে কখনো একত্রে ছুটি দেয়া হয়নি।' খানিক ভেবে চাকরানী বলল, 'মজার ব্যাপার হল, সবাইকে ছুটি দিয়ে মনিব বললেন, কুকুরটা আজ রাতে বাঁধা থাকবে। অথচ এর আগে কুকুর প্রতিরাতে ছাড়া থাকত। বড় তেজস্বী কুকুর। অপরিচিত কাউকে দেখলেই হামলে পড়ে সাথে সাথে।'

'ফাতেমার সাথে মোসলেহুদ্দীনের সম্পর্ক কিরূপ ছিল?' প্রশ্ন করেন বিলবিস।

'বড় তিক্ত। অল্প ক'দিন আগে সাহেব অপরূপ সুন্দরী এক যুবতীকে ঘরে এনেছেন। এই মেয়েটি সাহেবকে গোলামে পরিণত করে ফেলেছে। ফাতেমার সাথে সাহেবের কথাবার্তাও বন্ধ ছিল।' চাকরানী বলল।

গিয়াস বিলবিস চাকরানীকে আলগ বসিয়ে রেখে মোসলেহুদ্দীনকে ভেতরে ডেকে পাঠান। নিজে বাইরে বের হয়ে যান এবং মুহূর্ত পর দু'জন সিপাহী নিয়ে ফিরে আসেন। সিপাহীরা মোসলেহুদ্দীনের দু'বাহুতে ধরে টেনে-হেঁচড়ে বাইরে নিয়ে যেতে শুরু করে। মোসলেহুদ্দীন নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু বিলবিস 'একে কয়েদখানায় বন্দী করে রাখ' নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে যান। তার দ্বিতীয় নির্দেশ ছিল, মোসলেহুদ্দীনের ঘর ঘেরাও করে রাখ, যাতে কেউ বেরিয়ে যেতে না পারে।

✿ ✿ ✿

কায়রোর উত্তরে বহু দূরে সবুজ-শ্যামল মনোরম একটি স্থান। চারদিকে উঁচু উঁচু টিলা। ফাতেমা সূর্যোদয়ের আগেই পৌঁছে গেছে সেখানে। অপহরণকারীদের ঘোড়া থেমে গেছে। ফাতেমাকে বের করা হয়েছে বস্তা থেকে। মুখের কাপড় সরিয়ে দেয়া হল, খুলে দেয়া হল হাত-পায়ের বাঁধন। তিন মুখোশধারীর কবলে অচেতন পড়ে আছে মহিলা।

অল্প সময়ের মধ্যে চৈতন্য ফিরে আসে ফাতেমার। চীৎকার জুড়ে দেয় সে। মুখোশধারীরা তাকে খাবার খেতে দেয়। কাঁপা হাতে একটু একটু করে খাদ্য মুখে দেয় ফাতেমা। পানি পান করে। আস্তে আস্তে চাঙ্গা হয়ে উঠে, দেহের শক্তি ফিরে আসে। হঠাৎ ফাতেমা উঠে দাঁড়ায় এবং দৌড় দেয় সামনের দিকে। মুখোশধারীরা কিছুই বলছে না। বসে বসে তামাশা দেখছে তারা। খানিক দূরে গিয়ে একটি টিলার আড়ালে চলে যায় ফাতেমা।

এবার ঘোড়ায় চড়ে বসে এক মুখোশধারী। ঘোড়া হাঁকায় এবং ছুটে গিয়ে ফাতেমাকে ধরে ফেলে। দৌড়ে দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ফাতেমা। অবসন্ন দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। মুখোশধারী আরোহী তাকে ঘোড়ায় তুলে নেয় এবং নিজে তার পেছনে বসে ঘোড়া হাঁকিয়ে সাথীদের নিকট ফিরে যায়।

'পালাবে? পালিয়ে যাবে কদ্দূর? এখান থেকে পালিয়ে কায়রো পৌঁছা একজন বলিষ্ঠ সুপুরুষের পক্ষেও তো সম্ভব নয়।' শান্ত কণ্ঠে বলল অপহরণকারীদের একজন।

ফাতেমা কাঁদছে, চীৎকার করছে, বকাবকি করছে। আরেকজন বলল, আমরা যদি তোমাকে কায়রো ফিরিয়ে নিয়েও যাই, তবু তোমার রেহাই নেই। তোমার স্বামীই তোমাকে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

'মিথ্যে কথা।' চীৎকার করে বলল ফাতেমা।

'না, সত্যি বলছি। আমরা তোমাকে পারিশ্রমিক হিসেবে এনেছি। তুমি আমাকে চিনতে পারনি। ঐ যে একজন লোক তোমার হাতে বিশ আশরাফীর একটি থলে দিয়ে এসেছিল, আমি সেই লোক। তুমি তোমার স্বামীকে বলে ফেলেছ যে, সে-ই খিজরুল হায়াতের খুনী। বোকামীবশত তুমি এও বলেছ যে, তুমি কোতোয়ালকে ঘটনাটা বলে দেবে। লোকটি তোমার প্রতি পূর্ব থেকেই অতিষ্ঠ ছিল। তার মন-মেজাজ, প্রেম-ভালোবাসা সব কব্জা করে রেখেছে তার রক্ষিতা। মেয়েটি কে, কোত্থেকে এসেছে এবং কেনই বা এসেছে, তা আমি বলতে পারব না। পরদিন তোমার স্বামী আমাদের আস্তানায় আসে। লোকটা এতই বেঈমান যে, খিজরুল হায়াতের হত্যার বিনিময়ে তার আমাদেরকে পঞ্চাশ আশরাফী আর দু'টুকরা সোনা দেয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু যখন কাজ হয়ে গেল, পাঠালো মাত্র বিশ আশরাফী। আমি তোমাকে কাজে লাগালাম। আশরাফীগুলো তোমার হাতে ফেরত দিয়ে এলাম, যাতে রহস্যটা তোমারও জানা হয়ে যায়। আমাদের তীর ঠিক জায়গায় আঘাত হানে। পরদিন আমাদের আস্তানায় এসে সে দিল পঞ্চাশ আশরাফী। সোনার টুকরা দু'টির খবর নেই। আমার এই সাথীরা বলল, ওয়াদা যা ছিল, এখন আমরা তার চেয়েও বেশী আদায় করে ছাড়ব। না দিলে যে করে হোক, কোতোয়ালের কাছে সব ফাঁস করে দেব।

যা হোক, এবার তোমার স্বামীর মনে আশংকা জাগল যে, সে-ই যে খিজরুল হায়াতের ঘাতক, তুমিও তা জেনে ফেলেছ। উভয় সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে তিনি তোমাকে আমাদের হাতে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ভাবলেন, আমরা যদি তোমাকে অপহরণ করে নিয়ে যাই, তাহলে আমাদের দাবী-দাওয়ার দায় থেকেও তিনি বেঁচে গেলেন, আর তুমি যে তার পথের কাঁটা, তাও সরে গেল। তারই পরিণতিতে তুমি এখন এখানে।

কাঁদতে কাঁদতে ফাতেমার চোখের অশ্রু শুকিয়ে গিয়েছিল আগেই। এবার এই কাহিনী শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে মহিলা। বিস্ফারিত নয়নে এক এক করে তাকাতে থাকে মুখোশধারী অপহরণকারীদের প্রতি। অপহরণকারীরা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, তোমার অস্থিরতা, কান্না বা পলায়ন চেষ্টা সবই বেকার।

'আমি তোমাকে আগেই দেখেছিলাম। মোসলেহুদ্দীন যখন বললেন, ঠিক আছে, শ্রমের বিনিময়ে তোমরা ফাতেমাকে তুলে নিয়ে যাও, আমি তখন তোমার মূল্য পরিমাপ করলাম। ভাবলাম, তুমি রূপসী যুবতী। আমি তোমাকে চড়া দামে বিক্রি করতে পারব। তার প্রস্তাব মেনে নিলাম। তিনি আমাদের জানালেন, রাতে তার ঘরে কোন চাকর থাকবে না, কুকুরটাও বাঁধা থাকবে। তবে ঘরের সদর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকবে। আমরা তিনজন পরস্পরের কাঁধে দাঁড়িয়ে দেয়াল টপকে ঘরে প্রবেশ করি। খঞ্জর হাতে অতি সাবধানে আমি তোমার কক্ষের দিকে এগিয়ে যাই। তোমার স্বামীর প্রতি আমাদের বিশ্বাস ছিল না। আশংকা ছিল, ফাঁদে ফেলে তিনি আমাদের খুন করাতে পারেন। কিন্তু আমরা পথ সম্পূর্ণ পরিষ্কার পেয়েছি। নিরাপদে আমরা তোমাকে তুলে নিয়ে এলাম।' বলল অপহরণকারীদের একজন।

'তুমি নিশ্চিত থাক, আমরা তোমার সম্ভ্রমে হাত দেব না। আমরা ব্যবসায়ী। ভাড়ায় খুন আর অপহরণ করে দেয়া আমাদের পেশা। তোমার গায়ে হাত দেয়ার ইচ্ছা আমাদের নেই। তিনজন পুরুষ একজন নারীকে অপহরণ করে এনে বেকায়দায় ফেলে উপভোগ করা কোন গৌরবের বিষয় নয়।' বলল আরেকজন।

'তোমরা আমাকে ইস্কান্দারিয়ার বাজারে নিয়ে বিক্রি করে ফেলবে? আহ! এখন বুঝি আমাকে ইজ্জত বিক্রি করে বেড়াতে হবে।' কাঁদো কাঁদো করুণ কণ্ঠে বলল ফাতেমা।

'না, দেহ ব্যবসা করানোর জন্য জংলী ও যাযাবর মেয়েদের ক্রয় করা হয়। তুমি তো হেরেমের সম্পদ। বিক্রিত হয়ে তুমি সম্ভ্রান্ত কোন আমীরের ঘরে চলে যাবে। আমাদের উপযুক্ত মূল্য প্রয়োজন। আমরা তোমাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলব না। তুমি কান্নাকাটি-দুশ্চিন্তা বাদ দাও, তোমার চেহারার জৌলুস ফিরে আসুক। অন্যথায় বেশ্যাবৃত্তিই কপালে জুটবে। যাও শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর।' বলল আরেকজন।

✿ ✿ ✿

ফাতেমা শুয়ে পড়ে। অপহরণকারীরা কোন অসদাচরণ করছে না দেখে ফাতেমার মনে খানিকটা স্বস্তি ফিরে আসে। শোয়া মাত্র দু'চোখের পাতা বুজে আসে তার।

অল্পক্ষণ পরই হঠাৎ ফাতেমার চোখ খুলে যায়। দেখে অপহরণকারী তিনজন ঘুমিয়ে আছে। ফাতেমা প্রথমে ভাবে, কারো একটি খঞ্জর তুলে নিয়ে তিনজনকেই খুন করে ফেলি। কিন্তু তার অত সাহস হল না। তিনজন পুরুষকে একসাথে হত্যা করা একজন নারীর পক্ষে সহজ নয়। ঘোড়াগুলোর প্রতি তাকায় ফাতেমা। সব ক'টি ঘোড়ায় জিন বাঁধা। ফাতেমা উঠে দাঁড়ায়। পা টিপে টিপে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় ঘোড়ারগুলোর নিকটে। টিলার পেছনে আড়াল হয়ে যাচ্ছে সূর্য। ফাতেমা জানে না কায়রো এখান থেকে কোন্‌দিকে এবং কতদূর। কিন্তু তবুও তার পালাতে হবে।

অপহরণকারীদের হাতে জীবন বিপন্ন করা অপেক্ষা বিস্তীর্ণ মরু অঞ্চলে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে জীবন হারানো শ্রেয় ফাতেমার কাছে।

ফাতেমা জিনকষা একটি ঘোড়ায় চড়ে বসে। ঘোড়া হাঁকায় দ্রুত। ধাবমান ঘোড়ার খুরধ্বনী জাগিয়ে তোলে ঘুমন্ত অপহরণকারীদের। ফাতেমাকে ঘোড়া হাঁকিয়ে টিলার দিকে যেতে দেখে ফেলেছে তারা। দু'জন চড়ে বসে দু'টি ঘোড়ায়। ঘোড়া হাঁকায়।

পর্বতঘেরা বন্দীদশা থেকে কিভাবে বের হতে হয় ফাতেমার তা জানা নেই। যে পথে সে এগিয়ে চলে, সে পথে বের হওয়ার সুযোগ নেই। মাথায় পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে একটি টিলা। টিলা পর্যন্ত পৌঁছে যায় ফাতেমা। পিছনে ফিরে দেখে ধাওয়াকারীরা দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে তার দিকে। ফাতেমা টিলার উপর উঠিয়ে দেয় ঘোড়াটি। শক্ত-সামর্থ ঘোড়া টিলা অতিক্রম করে নেমে যায় অপরদিকে। একদিকে মোড় ঘুরিয়েই পথ পেয়ে যায় ফাতেমা। ধাওয়াকারীরাও পৌঁছে যায় তার অতি নিকটে। ব্যবধান কমে আসছে ধীরে ধীরে। সম্মুখে সমুদ্রের ন্যায় বিশাল-বিস্তীর্ণ মরুভূমি চোখে পড়ে ফাতেমার। সেই মরুপথ অতিক্রম করে তারই দিকে এগিয়ে আসছে চারটি উষ্ট্রারোহী। ফাতেমা সর্বশক্তি দিয়ে চীৎকার করতে শুরু করে- 'বাঁচাও! ডাকাতের হাত থেকে আমাকে বাঁচাও।' ফাতেমার নিকটে চলে আসে চার উষ্ট্রারোহী।

উষ্ট্রারোহীদের দেখে পেছন থেকে ঘোড়ার গতি হ্রাস করে ধাওয়াকারী অশ্বারোহীরা। ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে পালাতে উদ্যত হয় তারা। উষ্ট্রারোহীরা ধাওয়া করতে শুরু করে তাদের। তীর ছুঁড়ে একজন। একটি ঘোড়ার ঘাড়ে গিয়ে বিদ্ধ হয় তীর। ব্যাথায় কুঁকিয়ে উঠে ঘোড়া। ছুটাছুটি করতে থাকে এলোপাতাড়ি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে আরোহী। লাফিয়ে পড়ে যায় মাটিতে। পালাবার চেষ্টা করে অপরজন। থামতে নির্দেশ দেয় উষ্ট্রারোহীরা। ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়িয়ে যায় অশ্বারোহী। দু'জনকে ধরে ফেলে উষ্ট্রারোহীরা। ফাতেমার দেয়া তথ্য অনুযায়ী ধরে আনা হয় তৃতীয়জনকেও।

এরা চারজন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর টহল বাহিনীর সৈনিক। শত্রুরা যাতে হঠাৎ করে আক্রমণ করতে না পারে এবং খৃস্টান সন্ত্রাসীরা যাতে মিসরে ঢুকতে না পারে, তার জন্য সমগ্র মরু এলাকায় টহলের ব্যবস্থা করে রেখেছেন আইউবী। সম্প্রতি তাদের হাতে ধরাও পড়েছে বেশ ক'জন সন্দেহভাজন। এবার তাদের ফাঁদে আটকা পড়ে তিন মুখোশধারী অপহরণকারী।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সৈন্যদের কাছে বৃত্তান্ত শোনায় ফাতেমা। আরো জানায়, মিসরের রাজকোষের পরিচালক, সুলতানের একান্ত আস্থাভাজন খিজরুল হায়াত আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন। নগর প্রশাসক মোসলেহুদ্দীন সে হত্যার নেপথ্য নায়ক। আমি তার স্ত্রী ফাতেমা। এ তিনজনের একজন তার ঘাতক।

ধৃতদের থেকে খঞ্জর নিয়ে নেয়া হয়। পিঠমোড়া করে বাঁধা হয় তাদের। তাদের তিন ঘোড়ার একটি পালিয়ে যায় তীরের আঘাত খেয়ে। তাই এবার দু'টির একটিতে দু'জন, অপরটিতে একজনকে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় কমান্ডারের নিকট। চার মাইল পথ অতিক্রম করে সূর্যাস্তের আগে আগে তারা পৌঁছে যায় ক্যাম্পে। খর্জুর-বীথিবেষ্টিত এ এলাকায় টহল বাহিনীর হেডকোয়ার্টার। কমান্ডারের সামনে নিয়ে যাওয়া হয় ফাতেমাকে। সেনা প্রহরায় বসিয়ে রাখা হয় মুখোশধারী আসামীদের। আগামী দিন কায়রো পাঠিয়ে দেয়া হবে তাদের।

❁ ❁ ❁

কার্কে বসে বসে সালাহুদ্দীন আইউবীর অপেক্ষা করবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে খৃস্টানরা। নবউদ্যমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে তাদের সেনাবাহিনী। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সৈন্যদের পথেই প্রতিরোধ করার প্রস্তুতি গ্রহণের দায়িত্ব পড়েছে ফ্রান্সের সৈন্যদের উপর। মুসলিম বাহিনীর উপর পেছন দিক থেকে আক্রমণ করার দায়িত্ব ন্যাস্ত হয় রেমন্ডের বাহিনীর উপর। কার্ক দুর্গ প্রতিরক্ষার দায়িত্ব জার্মানীর সেনাদের। এখন নতুন করে তাদের সঙ্গে যুক্ত করা হল ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের কিছু সৈন্যকে। গোয়েন্দা বিভাগ তাদের জানিয়ে দিয়েছে যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী নতুন বাহিনী প্রস্তুত করছেন। খৃস্টান শাসকমণ্ডলী চেয়েছিল, তাদের সৈন্যরা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের উপর আক্রমণ চালিয়ে পেছনে সরে আসবে। কিন্তু তাতে দ্বিমত পোষণ করে তাদের গোয়েন্দা বিভাগ। গোয়েন্দা বিভাগের যুক্তি হল, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তার প্রতিরক্ষাকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করে রেখেছেন। তার একটি হল টহল বাহিনী। তাছাড়া তার নিজের নিরাপত্তা রক্ষীদের একটি দল দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়। মরুভূমিতে কিছু একটা নড়াচড়া করতে দেখলেও নিকটে গিয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর এসব শক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেখে সুলতানের ক্যাম্পে আক্রমণের পরিকল্পনা থেকে সরে আসে খৃস্টানরা।

এক আমেরিকান লেখক এন্টেনী ওয়েস্ট বিভিন্ন ঐতিহাসিকের উদ্বৃতি উল্লেখ করে লিখেছেন, খৃস্টানদের কাছে সৈন্য ছিল সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সৈন্য অপেক্ষা চারগুণ বেশী। তন্মধ্যে বর্মধারী পদাতিক এবং অশ্বারোহী-উষ্ট্রারোহী সৈন্য ছিল বিপুল। এতগুলো সৈন্য সরাসরি আক্রমণ করলেও মুসলমানদের বেশী সময় টিকে থাকতে পারার কথা ছিল না। কিন্তু শোবকের শোচনীয় পরাজয় ও ক্ষয়ক্ষতিতে তারা ছিল ভীত-সন্ত্রস্ত। এন্টনী ওয়েস্ট আরো লিখেছেন যে, খৃস্টান বাহিনীটি ছিল বিভিন্ন রাজ্যের সম্মিলিত বাহিনী, যারা বাহ্যত ছিল ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু মুসলমানদের নির্মূল করার ইস্যুতে তারা একমত হলেও কমান্ডার- অধিনায়কগণের মূল লক্ষ্য ছিল ক্ষমতা

দখল ও নিজ নিজ রাজ্যের সম্প্রসারণ। ফলে কার্যত তাদের শক্তি ছিল বহুধা বিভক্ত।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, খৃস্টানরা ছিল ষড়যন্ত্র আর নাশকতার ওস্তাদ। মুসলমানদের কোন ভূখণ্ড দখল করে নিলে সেখানে তারা গণহত্যা আর নারীর সম্ভ্রমহানীর মহড়া শুরু করে দিত। পক্ষান্তরে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী প্রেম-ভালোবাসা ও চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা শত্রুর মন জয় করে নিতেন। তাছাড়া নিজের সৈনিকদের তিনি এমনভাবে গঠন করে নিয়েছিলেন যে, মাত্র দশজন সৈনিকের একটি গেরিলা দল খৃস্টানদের এক হাজার সৈনিকের ক্যাম্পে আক্রমণ চালিয়ে সব তছনছ করে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে যেত। নিজের জীবন বিসর্জন দেয়াকে তারা সামান্য কুরবানী মনে করত। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যুদ্ধের ময়দানে তার স্বল্পসংখ্যক সৈন্যকে এমনভাবে পরিচালনা করতেন যে, প্রতিপক্ষের বিশাল বাহিনী তাদের কাছে অসহায় হয়ে পড়ত। শোবক জয়ের লড়াইয়েও তিনি তার সেই বিচক্ষণতার প্রদর্শন করেছিলেন। এসব বিবেচনা করেই খৃস্টানরা সরাসরি আক্রমণের পরিকল্পনা ত্যাগ করে এবং বিকল্প কৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু সেই কৌশলও কতটুকু সুফল বয়ে আনবে, তাতেও তারা ছিল সন্দিহান। তাই নিরুপায় হয়ে তারা মিসরে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত করার এবং মিসর আক্রমণ করার জন্য সুদানীদের উস্কানি দেয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করে।

মিসরের নগর প্রশাসক মোসলেহুদ্দীনের পক্ষ থেকে একের পর এক আশাব্যঞ্জক রিপোর্ট পাচ্ছিল কার্কের খৃস্টানরা। এখনও তারা এই সংবাদ পায়নি যে, মিসরের রাজকোষের পরিচালক খিজরুল হায়াত নিহত হয়েছেন এবং এ হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য নায়ক অভিযোগে মোসলেহুদ্দীনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কার্ক পর্যন্ত এ সংবাদ পৌঁছতে সময়ের প্রয়োজন অন্তত পনের দিন। কারণ, মিসর-কার্ক যাতায়াতের সোজা পথ এখন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর দখলে। মিসর থেকে কার্ক যেতে বহুদূর পথ ঘুরে যেতে হবে দূতের। যে রাতে মোসলেহুদ্দীনের স্ত্রী ফাতেমা অপহৃত হয়েছিল, বহু সময় ব্যয়ে এক দূত সে রাতে সংবাদ নিয়ে কার্ক পৌঁছে। দূত রিপোর্ট দেয় যে, মিসরে বিদ্রোহ করার পরিবেশ এখন অনুকূল, কিন্তু সুদানীরা এখনও হামলা করার জন্য প্রস্তুত নয়। তাদের ঘোড়ার অভাব। উট আছে অনেক। আরো অন্তত পাঁচশ' উন্নত ঘোড়া না হলে তারা সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। জিনও প্রয়োজন সমানসংখ্যক।

তিন-চার দিনের মধ্যে পাঁচশ' জিন ও ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দেয় খৃস্টানরা। এগুলোকে এমন পথে রওনা করান হয়, যে পথ সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, এ পথে গেলে ধরা পড়ার কোন আশংকা নেই। মিসর থেকে আগত দূতই পথ দেখিয়ে

নিয়ে যাচ্ছে ঘোড়াগুলো। লোকটি সুদানী। গুপ্তচরবৃত্তি করছে তিন বছর ধরে। ঘোড়ার সাথে আছে আটজন খৃস্টান সেনা অফিসার। সুদানী হামলার নেতৃত্ব দেয়ার জন্য যাচ্ছে তারা। তাদের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে যে, সালাহুদ্দীন আইউবীর সৈন্যদের এখান থেকে বের হতে দেয়া হবে না।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী শুধু এতটুকু জানতেন যে, মিসরের পরিস্থিতি ভালো নয়। অবস্থা যে এত নাজুক ও বিস্ফোরনুখ, তা তিনি জানতেন না। আলী বিন সুফিয়ান তাকে আশ্বস্ত করে রেখেছিলেন যে. গুপ্তচরবৃত্তির এমন জাল তিনি বিছিয়ে রেখেছেন, অঘটন ঘটার আগেই তিনি সব খবর পেয়ে যাবেন। খিজরুল হায়াতের হত্যাকাণ্ড ও মোসলেহুদ্দীনের সংবাদ তিনি জানতেন না। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে সংবাদ দেয়ার জন্য গিয়াস বিলবিসকে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি বললেন, আগে তদন্ত সম্পন্ন করে নেই; সুলতানকে সংবাদ দেব পরে।

✿ ✿ ✿

টহল বাহিনীর কমান্ডার ফাতেমাকে রাতে আলাদা এক তাঁবুতে থাকতে দেয়। রাতের শেষ প্রহরে তাকে ও তিন অপহরণকারীকে আটজন রক্ষীর সাথে রওনা করা হয় কায়রো। সূর্যাস্তের পর এ কাফেলা কায়রো গিয়ে পৌঁছে এবং চলে যায় সোজা গিয়াস বিলবিসের দপ্তরে।

গিয়াস বিলবিস খিজরুল হায়াত ও ফাতেমার অপহরণ ঘটনার তদন্তে ব্যস্ত। তিনি মোসলেহুদ্দীনের ঘরে তল্লাশী চালান এবং তার রক্ষীতাকে তুলে নিয়ে আসেন। রক্ষীতা নিজেকে উজবেক মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। বিলবিসের চোখে ধুলো দেয়ার চেষ্টা করে মেয়েটি। বিলবিস মেয়েটিকে সেই কক্ষটির খানিক ঝলক প্রদর্শন করেন, যেখানে বড় বড় পাষাণহৃদয় পুরুষও মনের সব ভেদ উদগীরণ করে দেয়। ফলে নিজের আসল পরিচয় ফাঁস করে দেয় মেয়েটি। স্বীকার করে, আমি খৃস্টান, এসেছি জেরুজালেম থেকে। পাশাপাশি মেয়েটি গিয়াস বিলবিসকে নিজের দেহ ও সম্পদের লোভ দেখাতে শুরু করে।

তল্লাশী চালিয়ে মোসলেহুদ্দীনের ঘরে যেসব সম্পদ পাওয়া গেল, তা রীতিমত ভাবিয়ে তুলল গিয়াস বিলবিসকে। মোসলেহুদ্দীন কেন খৃস্টানদের ফাঁদে আটকে গেল বুঝে ফেললেন তিনি। স্বয়ং তার রক্ষীতা মেয়েটি এতই চিত্তাকর্ষক ও বাকপটু যে, তাকে উপেক্ষা করতে হলে প্রয়োজন সুকঠিন ও নিষ্কম্প ঈমান।

বিলবিস উপলব্ধি করলেন, এ সুদূরপ্রসারী এক ষড়যন্ত্র, যা নিয়ন্ত্রিত হয় জেরুজালেম থেকে। তিনি মেয়েটিকে বললেন, মনের সব কথা বলে দাও; কিছুই গোপন রাখার চেষ্টা কর না। জবাবে মেয়েটি বলল, 'যা বলা সম্ভব ছিল, বলেছি; আর সম্ভব নয়। আমি ক্রুশের সাথে প্রতারণা করতে পারি না। ক্রুশে হাত রেখে আমি শপথ

নিয়েছি, দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনে জীবন দিয়ে দেব, তবুও নিজের জাতি ও ধর্মের সাথে বেঈমানী করব না। আমার বলা এ পর্যন্তই শেষ। এবার আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। মুক্তি দিয়ে যদি আমাকে জেরুজালেম কিংবা কার্ক পৌঁছিয়ে দেন, তবে আপনি যা চাইবেন, আমি তা-ই প্রদান করব। মোসলেহুদ্দীন আপনার হাতে বন্দী আছে। তাকে জিজ্ঞেস করে সব জেনে নিতে পারেন। তিনি আপনাদেরই ভাই। হয়তো তিনি সব বলে দেবেন।'

বিলবিস মেয়েটিকে আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। চলে যান মোসলেহুদ্দীনের নিকট। বড় শোচনীয় অবস্থায় আছে মোসলেহুদ্দীন। দু'বাহুতে রশি বেঁধে ছাদের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে তাকে। গিয়াস বিলবিস গিয়েই বললেন, 'দোস্ত মোসলেহ! যা জিজ্ঞেস করি, সত্য সত্য বলে দাও। বল, তোমার স্ত্রী কোথায়? তাকে কাকে দিয়ে অপহরণ করিয়েছ? তোমায় আরো অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। তোমার রক্ষিতা তার মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছে।'

'আমার বাঁধন খুলে দে নরাধম! আমীরে মেসের আসুন, আমি তোরও একই পরিণতি ঘটাব বলে রাখছি।' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে দাঁত কড়মড় করে বলল মোসলেহুদ্দীন।

ঠিক এমন সময় বিলবিসের এক আমলা তার কানে কানে কি যেন বলল। চমকে উঠেন বিলবিস। তৎক্ষণাৎ তিনি প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করে দৌড়ে উপরে চলে যান। কক্ষে বসা আছে হত্যার অভিযোগে ধৃত মোসলেহুদ্দীনের স্ত্রী ফাতেমা এবং তাকে অপহরণকারী তিন ব্যক্তি। নিজে কিভাবে অপহৃত হল এবং কিভাবে অপহরণকারীরা ধরা পড়ল, ফাতেমা তার বিবরণ দেয় গিয়াস বিলবিসের নিকট।

বিলবিস ফাতেমা ও তিন আসামীকে পাতাল কক্ষে নিয়ে মোসলেহুদ্দীনের সম্মুখে উপস্থিত করান। তাদের দেখে চোখ বন্ধ করে ফেলে মোসলেহুদ্দীন। বিলবিস জিজ্ঞেস করেন, 'বল, এদের মধ্যে খিজরুল হায়াতের ঘাতক কে?' কথা বলে না মোসলেহুদ্দীন। কথাটি তিনবার জিজ্ঞেস করেন বিলবিস। মোসলেহুদ্দীন তারপরও নীরব। পাতাল কক্ষের এক ব্যক্তিকে ইশারা দেন বিলবিস। এগিয়ে এসে ঝুলন্ত মোসলেহুদ্দীনের কোমর জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ে লোকটি। সুঠাম-সুদেহী লোকটির দেহের সম্পূর্ণ ওজন চাপ ফেলে মোসলেহুদ্দীনের দু'বাহুতে। রশিবাঁধা বাহু দু'টো ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হয় মোসলেহুদ্দীনের। প্রচণ্ড ব্যথায় কুঁকিয়ে চীৎকার করে উঠে মোসলেহুদ্দীন বলল, 'মাঝের জন'। তিনজনকে মোসলেহুদ্দীনের নিকট থেকে সরিয়ে নিয়ে যান বিলবিস। বলেন, এবার সব ঘটনা খুলে বল্, অন্যথায় এখান থেকে কেউ জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পারবি না।

আপোসে পরামর্শ করে তারা সব বলে দেবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। বিলবিস আলাদা আলাদা কক্ষে পাঠিয়ে দেন তাদের। ফাতেমাকে নিয়ে যান উপরে। ফাতেমা জানায়,

তার মা সুদানী, পিতা মিসরী। তিন বছর আগে সে পিতার সাথে মিসর এসেছিল। নজরে পড়ে মোসলেহুদ্দীনের। তিনি পিতার নিকট লোক পাঠান। মূল্য কত নির্ধারণ হয়েছিল তা জানে না ফাতেমা। মোসলেহুদ্দীনের ঘরে মেয়েকে রেখে যায় পিতা, হাতে করে নিয়ে যান একটি থলে। একজন মৌলভী ও কয়েকজন লোক ডেকে বিয়ে পড়িয়ে নেন মোসলেহুদ্দীন। মোসলেহুদ্দীনকে প্রাণভরে ভালোবাসত ফাতেমা। এই তিন বছরের দাম্পত্য জীবনে কখনো স্বামীর প্রতি ফতেমার সন্দেহ হয়নি যে, লোকটি এত বাজে। মোসলেহুদ্দীন মদ্যপান করত না। তার ঘরের বাইরের তৎপরতা সম্পর্কে কিছুই জানত না ফাতেমা।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর শোবক চলে যাওয়ার পরপর পাল্টে যায় মোসলেহুদ্দীন। গভীর রাত পর্যন্ত বাইরে কাটাতে শুরু করে। এক রাতে ফাতেমা দেখতে পায় যে, স্বামী তার আজ মদ খেয়ে এসেছে। ফাতেমার পিতাও ছিল মদ্যপ। মদের ঘ্রাণ আর মদ্যপ চিনে সে ভালোভাবে। কিন্তু ভালোবাসার খাতিরে স্বামীর এই অপরাধটুকু সে ক্ষমার চোখে দেখে। তারপর ধীরে ধীরে ঘরে অচেনা লোকদের আনাগোনা শুরু হয়। এক রাতে মোসলেহুদ্দীন আশরাফীভর্তি দু'টি থলে ও কয়েক টুকরা সোনা ফাতেমাকে দেখিয়ে ঘরে রেখে দেয়। আরেক রাতে মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় ঘরে এসে ফাতেমাকে বলল, 'যদি মিসরের উত্তরাঞ্চল– যা রোম উপসাগরের তীরের সাথে সংযুক্ত– আমার হাতে এসে যায়, তা তোমার নিকট কেমন লাগবে? নাকি সুদানের সীমান্তবর্তী এলাকাটা নেব? তোমার যেটা পছন্দ হবে, আমি হব তার রাজা আর তুমি হবে রাণী।' ফাতেমা অত বিচক্ষণ নয় যে, এর রহস্য বুঝতে পারে। সে এতটুকুই বুঝে, স্বামীধন তার মদ খেয়ে মাতাল হয়ে এসেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় তো আর এসব কথা তিনি বলেন না।

তারপর একদিন ঘরে নিয়ে আসে অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ে। সাথে দু'জন পুরুষ। তখন থেকেই ঘরে থেকে যায় মেয়েটি। বিয়ে-শাদী হয়নি। ফাতেমাকে ঘনিষ্ঠ বানাবার অনেক চেষ্টা করে মেয়েটি। কিন্তু দিন দিন তার প্রতি ঘৃণাই বাড়তে থাকে ফাতেমার। বুক থেকে স্বামীকে ছিনিয়ে নিল যে মেয়ে, তার সঙ্গে খাতির কিসের! তারপর সংঘটিত হল খিজরুল হায়াতের হত্যার ঘটনা।

✿ ✿ ✿

প্রথম দিকে বিলবিসকে ভুল বোঝাবার চেষ্টা করে অপহরণকারীরা। কিন্তু তাদের সোজা পথে নিয়ে আসেন বিলবিস। তিনজন পৃথক পৃথক যে জবানবন্দী পেশ করে, তাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হল যে, এরা হাশীশী দলের সদস্য। খৃস্টানদের হয়ে মোসলেহুদ্দীনকে হাত করেছে এরাই। বিপুল অর্থ সম্পদ আর একটি সুন্দরী মেয়ে দেয়া হয় মোসলেহুদ্দীনকে। সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সফল হতে

পারলে মিসরের সীমান্ত এলাকায় একটা প্রদেশ গঠন করে দেয়া হবে বলেও তাকে ওয়াদা দেয়া হয়ে। যার শাসন ক্ষমতা থাকবে তার ও এই খৃস্টান মেয়েটির হাতে।

মোসলেহুদ্দীন ধীরে ধীরে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের হাত করতে শুরু করে। কিন্তু অনেকের ব্যাপারে সফল হলেও খিজরুল হায়াতকে বাগে আনতে সক্ষম হল না। অথচ মিশন বাস্তবায়নে রাজকোষের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা ছিল অপরিহার্য। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর একান্ত অনুগত আপোসহীন খিজরুল হায়াতের বর্তমানে যা তার পক্ষে অসম্ভব। রাজকোষের রক্ষীবাহিনীর সকলেই নির্বাচিত জানবাজ সৈনিক। এদের সরিয়ে অনুগত লোকদের নিয়োগ দিতে হবে মোসলেহুদ্দীনের। তার আগে দুনিয়া থেকে সরানো প্রয়োজন খিজরুল হায়াতকে। দু'জন হাশীশী ও বিদ্রোহীদের দ্বারা গঠন করতে হবে এ বাহিনী।

মোসলেহুদ্দীনের তালিকা অনুযায়ী বেশ ক'জন কর্মকর্তাকে হত্যা করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় ধৃত এই তিন অপহরণকারীর উপর। তারা খৃস্টানদের পক্ষ থেকে এ কাজের পারিশ্রমিক যথারীতি পেয়ে আসছিল। এভাবে ভাড়ায় মানুষ খুন করা ছিল তাদের পেশা। তাই উপরি লাভের জন্যও তারা চেষ্টা করত। এ সূত্রেই অতিরিক্ত পঞ্চাশ আশরাফী ও দু'টুকরা সোনার চুক্তি হয় তাদের মোসলেহুদ্দীনের সাথে। খিজরুল হায়াতের হত্যার পর এ বখশিশ পরিশোধ করার কথা। কিন্তু মোসলেহুদ্দীন তা আদায় করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলল, পূর্ণ পারিশ্রমিক তো তোমরা পেয়েই আসছ। এর জন্য এত পীড়াপীড়ি করছ কেন? জবাবে মোসলেহুদ্দীনকে হুমকি দেয় ঘাতক দল। মোসলেহুদ্দীন তার স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়ে বলে, নিয়ে যাও, তোমরা একে উপযুক্ত দামে বিক্রি করতে পারবে।

এখনো ছাদের সাথে ঝুলে আছে মোসলেহুদ্দীন। বাঁধন খুলে যখন তাকে নামানো হল, তখন সে অচেতন। তার রক্ষিতা মেয়েটির কক্ষে গিয়ে দেখা গেল, সে পড়ে আছে মৃত। তার মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছিল। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিলেন, মেয়েটি বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। ছোট্ট একখণ্ড কাপড় পড়ে আছে তার পার্শ্বে। স্পষ্ট বুঝা গেল, এতে কি বাঁধা ছিল, যা লুকানো ছিল তার পোশাকের ভেতর।

দীর্ঘক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে আসে মোসলেহুদ্দীনের। এখনো স্পষ্ট কথা সরছে না তার মুখ দিয়ে। ছানাবড়া চোখে তাকায় সকলের প্রতি। তারপর বিড় বিড় করে আবোল-তাবোল বলে কি যেন। মুখে ঔষধ দেন ডাক্তার। তবু সুস্থ হচ্ছে না মোসলেহুদ্দীন।

সে রাতেই সর্বজন শ্রদ্ধেয় এক ব্যক্তির আগমন ঘটে গিয়াস বিলবিসের নিকট। নাম তার যায়নুদ্দীন আলী ইবনে নাজা আল-ওয়ায়েজ। তিনি বিলবিসকে বললেন, শুনতে পেলাম, কয়েকজন গুপ্তচর ও সন্ত্রাসী নাকি ধরা পড়েছে! তাদের নিকট থেকে

তোমরা অনেক তথ্য জানতে পারবে। তবে আমিও তোমাদের কিছু তথ্য দিতে চাই।

পীর-মুরশিদ না হলেও যায়নুদ্দীন ধর্ম, রাজনীতি ও সামাজিক জগতের এক মহান ব্যক্তিত্ব। বড় বড় বহু আমলা-কর্মকর্তা তার শিষ্য। সর্বস্তরের মানুষ তাঁকে পীরের মত মান্য করে। তিনি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছেন যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ও তাঁর সেনাবাহিনীর অনুপস্থিতির সুযোগে দুশমন ফায়দা হাসিল করছে এবং এত সূক্ষ্মভাবে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের বিষ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে যে, কাউকে ধরা সহজ নয়। প্রাথমিক রিপোর্টের পর যায়নুদ্দীন কাউকে কিছু না জানিয়ে নিজেই গুপ্তচরবৃত্তি শুরু করেছেন। সেনাবাহিনীর ছোট-বড় অনেক অফিসার তার মাহফিলে যাওয়া-আসা করত। তাদের থেকেই তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন এবং বেশকিছু কর্মকর্তার নাম-ধাম ও তাদের তৎপরতার খবর সংগ্রহ করেন। যায়নুদ্দীন ব্যক্তিগত উদ্যোগে নাশকতাকারীদের বিরুদ্ধে এমন একটি দল গঠন করে নিয়েছিলেন, যারা অনেক সূক্ষ্ম তথ্যও সংগ্রহ করে ফেলে।

এক মিসরী ঐতিহাসিক মোহাম্মদ ফরিদ আবু জাদীদ তার 'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী' পুস্তকে মিসরের ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের মুখোশ উন্মোচনের নায়ক হিসেবে যায়নুদ্দীন আলীর নাম উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তিন-চারজন ইতিহাসবেত্তার সূত্রও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সে যুগের যেসব রচনা এখনো সংরক্ষিত আছে, তাতে প্রমাণিত হয় যে, রাজকোষ পরিচালকের হত্যাকাণ্ডেই খৃস্টানদের এসব ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়। যার ক্রীড়নক ছিল এমন কতিপয় মুসলমান, যারা ছিল সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর একান্ত বিশ্বস্ত।

যা হোক যায়নুদ্দীন আলী বললেন, আমি আরো কয়েকটা দিন আমার গুপ্তচরবৃত্তি চালু রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেই সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের সংবাদ শহরে এমনভাবে ছড়িয় পড়েছে যে, এখন তাদের সাথীরা গা-ঢাকা দিয়ে ফেলবে। তিনি গিয়াস বিলবিসকে ষড়যন্ত্রকারীদের নাম-ঠিকানা অবহিত করেন এবং হাসান বিন আবদুল্লাহ সহ তার গ্রুপটিকে গিয়াস বিলবিসের হাতে তুলে দেন।

গিয়াস বিলবিস ও হাসান পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেন যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরিস্থিতি সম্পর্কে এখনই সংবাদ দেয়া প্রয়োজন। তার জন্য যায়নুদ্দীন আলীকেই নির্বাচন করা হল এবং বারজন অশ্বারোহীর মোহাফেজ বাহিনীর সাথে সেদিনই তাকে শোবকের উদ্দেশ্যে রওনা করা হল।

❁ ❁ ❁

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় শোবক পৌঁছে যায় কাফেলা। যায়নুদ্দীনকে দেখে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যেমন বিস্মিত হন, তেমনি হন আনন্দিত। এই ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পূর্ব থেকেই তিনি অবহিত ছিলেন। বুকে জড়িয়ে ধরেন একজন অপরজনকে।

যায়নুদ্দীন বললেন, 'আমি ভালো সংবাদ নিয়ে আসিনি। রাজকোষ পরিচালক খিজরুল হায়াত খুন হয়েছেন। নগর প্রশাসক মোসলেহুদ্দীন তার ঘাতক। গিয়াস বিলবিস তাকে গ্রেফতার করে কোতোয়ালীতে আটকে রেখেছেন।'

সংবাদ শুনে বিবর্ণ হয়ে যান সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী । যায়নুদ্দীন সুলতানকে সান্ত্বনা দেন এবং মিসরের বর্তমান পরিস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন। মিসরে অবস্থানরত সৈন্যদের সম্পর্কে তিনি বললেন, তাদের মধ্যে অস্থিরতা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। গুজব রটানো হয়েছে যে, সুলতান শোবক-বিজয়ী সৈন্যদের বিপুল সোনা-রূপা দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন এবং তাদের মাঝে খৃস্টান মেয়েদেরকে ভাগ-বাটোয়ারা করে দেয়া হয়েছে। মিসরের সৈন্যদের মনে এই ভীতি সৃষ্টি করা হয়েছে যে, বিশাল এক সুদানী বাহিনী মিশর আক্রমণ করতে যাচ্ছে, যার মোকাবেলা করা স্বল্পসংখ্যক মিসরী সৈন্যদের পক্ষে সম্ভব হবে না। সুদানীরা মিসরী বাহিনীর সব সৈন্যকে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়ে আসছে এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীও এমনটিই কামনা করছেন। তাছাড়া এই গুজবও ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী রণাঙ্গনে গুরুতর আহত হয়েছেন এবং তাঁর অবস্থা আশংকাজনক। কমান্ডার তার মন মত কাজ করছে। যায়নুদ্দীন জানান, আপনার আহত হওয়ার সংবাদ এমনভাবে ছড়ানো হয়েছে যে, এ ব্যাপারে মিসরীদের মনে কোন সংশয় নেই। ফলে মোসলেহুদ্দীনের ন্যায় একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি খৃস্টানদের মদদে মিসরকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করার এবং নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে।

কালবিলম্ব না করে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী অতি বিচক্ষণ একজন দূতকে ডেকে পাঠান এবং সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গীর নামে একটি পয়গাম লিখে তাতে মিসরের সঠিক পরিস্থিতির বিবরণ তুলে ধরেন ও সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেন। পত্রে সুলতান লিখেছেন–

'আমি যদি এখানেই থেকে যাই, তাহলে মিসর হাতছাড়া হয়ে যাবে। আর যদি মিসর চলে যাই, তাহলে শোবকের বিজয় পরাজয়ে পরিণত হবে। উদ্ধারকৃত অঞ্চল কোনক্রমেই হাতছাড়া করা যাবে না। আমি এখানেই থাকব, নাকি মিসর চলে যাব, তা এখনো স্থির করতে পারিনি... ।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী দূতকে বলে দেন যে, তুমি দিন-রাত ঘোড়া হাঁকাতে থাকবে। ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে গেলে সামনে যাকেই পাবে, তার থেকে ঘোড়া বদল করে নেবে। দিতে না চাইলে তাকে হত্যা করে নিয়ে যাবে। সুলতান তাকে এই নির্দেশনাও প্রদান করেন যে, পথে দুশমনের কবলে পড়ে গেলে বেরিয়ে যাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করবে। ধরা পড়ে গেলে পত্রখানা মুখে দিয়ে গিলে ফেলবে। পত্রটি কোনক্রমেই যেন দুশমনের হাতে না যায়।

দূত রওনা হয়ে যায়।

সুলতান অনুরূপ আরো একজন দূতকে ডেকে আনলেন। আপন ভাই তকিদ্দীনের নামে একখানা পত্র লিখে অনুরূপ নির্দেশনা দিয়ে তাকে প্রেরণ করেন। এই পত্রে তিনি ভাই তকিউদ্দীনকে লিখলেন–

'তোমার নিকট যা কিছু সম্পদ আছে, যত সৈন্য সংগ্রহ করতে পার, নিয়ে এই মুহূর্তে ঘোড়ায় চড় এবং কায়রো পৌঁছে যাও। পথে অযথা সময় নষ্ট কর না। তোমার সাথে আমার সাক্ষাৎ কোথায় হবে এ মুহূর্তে আমি বলতে পারছি না। আদৌ হবে কিনা তাও জানিনা। যদি কায়রোতে আমার সাক্ষাৎ না পাও কিংবা যদি আমার মৃত্যু সংবাদ পাও, তাহলে মিসরের শাসন-ক্ষমতা হাতে তুলে নিও। মিসর বাগদাদের খেলাফতের একটি সাম্রাজ্য। আর মহান আল্লাহ এ সাম্রাজ্যের শাসনভার ন্যাস্ত করেছেন আইউবী বংশের উপর। রওনা হওয়ার পূর্বে আব্বাজানের সঙ্গে দেখা করবে এবং অবনত মস্তকে আবেদন জানাবে, তিনি যেন তোমার পিঠে হাত বুলিয়ে দেন। আম্মাজানের কবরে ফাতেহা পাঠ করে তার আত্মা থেকে দোয়া নিয়ে আসবে। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। আমি যেখানেই থাকি ইসলামের ঝান্ডা অবনমিত হতে দেব না। তুমি মিসরে ইসলামের ঝান্ডাকে বুলন্দ রাখ।

এই দূতও রওনা হয়ে যায়।

প্রথম দূত যখন নূরুদ্দীন জঙ্গীর নিকট গিয়ে পৌঁছে, তখন তার বাম বাহু তরবারীর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত এবং পিঠ তীরবিদ্ধ। লোকটি সুলতান জঙ্গীর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে। জঙ্গীর হাতে পত্রখানা তুলে দিয়ে সে শুধু এতটুকু বলতে সক্ষম হয় যে, 'পথে শত্রুর কবলে পড়ে গিয়েছিলাম। আল্লাহর রহমতে পত্রখানা নিয়ে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি।' বলেই দূত শহীদ হয়ে যায়।

নূরুদ্দীন জঙ্গীর বাহিনী যখন শোবকের নিকটে পৌঁছে, তখন দুর্গ ও শহরময় সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, খৃস্টানদের বিশাল এক বাহিনী আক্রমণে ধেয়ে আসছে। মুহূর্তের মধ্যে মুসলিম বাহিনী মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু কাফেলা আরো নিকটে এলে দেখা গেল এ জঙ্গীর বাহিনী। গগনবিদারী তাকবীর ধ্বনি ভেসে এলো কানে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নায়েবগণ সংবর্ধনা দেয়ার জন্য দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসেন।

✿ ✿ ✿

তিন অথবা চার দিন পর।

ভোরের আলো এখনো পুরোপরি ফুটে উঠেনি। কায়রো অবস্থানরত সৈন্যরা ময়দানে সমবেত হওয়ার আদেশ পায়। সৈন্যদের মধ্যে কানাগুষা শুরু হয় যে, ব্যাপার কি? কেউ বলল, বিদ্রোহ হবে। কারো ধারণা, সুদানীদের হামলা আসছে।

তাদের কমান্ডার পর্যন্ত জানে না এই সমাবেশের হেতু কি? নির্দেশটি জারী হয়েছে সেনাবাহিনীর কেন্দ্র থেকে।

সুবিন্যস্তভাবে সৈন্যরা ময়দানে এসে সমবেত হয়। সঙ্গে সঙ্গে একদিক থেকে ছুটে আসে সাতটি ঘোড়া। দেখে সকলে বিস্ময়ে হতবাক! কারণ, সামনের জন স্বয়ং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। অথচ, তারা জানে, সুলতান শোবকে।

অদ্ভুত এক ভঙ্গিমা দেখালেন সুলতান। পরনের পাজামাটা ছাড়া সব খুলে ছুড়ে ফেলে দিলেন। খুলে ফেলে দিলেন মাথার শিরস্ত্রাণও। সৈন্যদের সারির সম্মুখ দিয়ে হেলে-দুলে এগিয়ে গেল ঘোড়া। তারপর মোড় ঘুরিয়ে আবার সকলের সম্মুখে এসে উচ্চস্বরে সুলতান আইউবী বললেন, 'আমার শরীরে তোমরা কেউ কোন জখম দেখতে পাচ্ছ? আমি মরে গেছি না জীবিত আছি?'

'আমীরে মেসেরের হায়াত দীর্ঘ হোক। আমরা শুনতে পেয়েছিলাম যে, আপনি আহত হয়েছেন এবং আপনার অবস্থা আশংকাজনক।' বলল এক উষ্ট্রারোহী।

'এ সংবাদটা যখন মিথ্যা প্রমাণিত হল, তখন বাকী সেইসব গুজবও সত্য নয়, যা তোমাদের কানে দেয়া হয়েছে।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। কথাটা তিনি এত উচ্চস্বরে বললেন যে, এর আওয়াজ শেষ সারি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তিনি বললেন, 'যেসব মুজাহিদের ব্যাপারে তোমাদের বলা হয়েছিল যে, তারা শোবকে সোনা-রূপা আর খৃস্টান ললনাদের নিয়ে আয়েশ করছে, তারা মূলত বালুকাময় মরুপ্রান্তরে পরবর্তী দুর্গ, তার পরের দুর্গ এবং তারও পরের দুর্গ জয় করার প্রস্তুতি নেয়ার কাজে পাগলের মত হয়ে আছে। তাদের রীতিমত খাবার পানিও জুটছে না। কেন? তার কারণ, খৃস্টান হায়েনাদের হাত থেকে তারা তোমাদের মা-বোন-কন্যাদের ইজ্জত রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শোবকে আমরা মুসলমান কন্যা ও তাদের মা-বাবাদের অবস্থা যা দেখেছি, তাহল, কন্যাদের রাত কাটছে খৃস্টানদের শয্যায় আর তাদের মা-বাবারা ধুঁকে ধুঁকে মরছে খৃস্টানদের বেগার খেটে। কার্ক, জেরুজালেম ও ফিলিস্তীনের খৃস্টান নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে বর্তমানে মুসলমানদের এই একই করুণ অবস্থা বিরাজ করছে। সেখানকার মসজিদগুলো এখন আস্তাবল। কুরআনের পবিত্র পাতা অলিতে-গলিতে পিস্ট হচ্ছে খৃস্টানদের পায়ের তলায়।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর এই তেজস্বী ও স্পর্শকাতর বক্তৃতা শুনে কমান্ডার চিৎকার করে উঠল, 'তারপরও আমরা এখানে বসে থাকি কেন? আমাদেরও কেন ময়দানে পাঠানো হচ্ছে না?'

'তোমাদেরকে এখানে এ জন্যে বসিয়ে রাখা হয়েছে যে, তোমরা দুশমনের প্রোপাগান্ডা শুনে শুনে কান ভারি করবে এবং নির্দ্বিধায় তা বিশ্বাস করবে। এখানে বসে বসে তোমরা নিজেদের পতাকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, যাতে সুদানীদের

সহযোগিতায় খৃস্টানরা এই ভূখণ্ডে দখল প্রতিষ্ঠা করতে এবং তোমাদের বোন-কন্যাদের সম্ভ্রম বিনষ্ট করতে পারে। পবিত্র কুরআনকে তোমরা নিজের হাতে ধরে কেন বাইরে নিক্ষেপ করছ না? কেন তোমরা পবিত্র কুরআনের অবমাননা খৃস্টানদের হাতে করাতে চাচ্ছ? তোমরা যারা নিজেদের ঈমানের হেফাজত করতে পার না, তারা জাতির ইজ্জতের হেফাজত কিভাবে করবে?' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

সুলতানের এই জবাবে সমগ্র বাহিনীতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে যায়। অবশেষে সুলতান বললেন, 'এখানে তোমরা কয়েকজন কমান্ডারকে দেখতে পাচ্ছ না। আমি তাদেরকে তোমাদের দেখাচ্ছি।' সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী একদিকে ইশারা করলেন। গলায় রশি লাগানো দু'হাত পিঠমোড়া করে বাঁধা দশ-এগার ব্যক্তিকে সেদিক থেকে নিয়ে আসা হল। সৈন্যদের সারির সম্মুখ দিয়ে তাদের নিয়ে যাওয়া হল। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ঘোষণা করলেন, 'এরা তোমাদের কমান্ডার ছিল। কিন্তু এরা সেই জাতির বন্ধু, যারা তোমাদের রাসূল ও তোমাদের কুরআনের দুশমন। এরা এখন বন্দী।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী খিজরুল হায়াতের হত্যাকাণ্ড এবং মোসলেহুদ্দীনের গ্রেফতারির বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন। মোসলেহুদ্দীনকে সকলের সামনে নিয়ে আসা হল। লোকটি এখনও পাগলপ্রায়। গত রাতে কোতোয়ালীর পাতাল কক্ষে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী লোকটাকে দেখে এসেছেন। সুলতানকে চিনেনি মোসলেহুদ্দীন। স্বপ্নের সাম্রাজ্য আর নিজের ক্ষমতার কথা উল্লেখ করে করে স্বগতোক্তি করছিল সে। এবার ঘোড়ায় বসিয়ে তাকে সেনাবাহিনীর সম্মুখে উপস্থিত করেন সুলতান। সৈন্যদের প্রতি চোখ বুলিয়ে সে বলে উঠে, 'তোমরা আমার ফৌজ। তোমরা মিসরের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ফেল। আমি তোমাদের সম্রাট। সালাহুদ্দীন আইউবী মিসরের দুশমন। তোমরা তাকে হত্যা করে ফেল...।'

এক নাগাড়ে বলেই যাচ্ছে মোসলেহুদ্দীন। পাগলের মুখ থেকে যেভাবে ফেনা বের হয়, তেমনি তার মুখে থেকেও ফেনা বেরুচ্ছে। হঠাৎ একটি 'শা' শব্দ ভেসে এল ফৌজের মধ্য থেকে। একটি তীর এসে বিদ্ধ হয় মোসলেহুদ্দীনের ধমনীতে। লুটিয়ে পড়ার উপক্রম হয় তার রক্তাক্ত দেহ। ছুটে আসে আরো কয়েকটি তীর। বিদ্ধ হয় তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে। চীৎকার করে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী নিবৃত্ত করেন তীরান্দাজদের। তীরান্দাজদের সামনে বেরিয়ে আসতে আদেশ করেন কমান্ডারগণ। তারা বলে, 'আমরা একজন গাদ্দারকে হত্যা করেছি। এ হত্যা যদি অন্যায় হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের গর্দানগুলো উপস্থিত।' সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তাদের ক্ষমা করে দেন। সুলতানের পরনে এখনো শুধু পাজামা, বাকী শরীর উন্মুক্ত। তিনি জল্লাদকে কাছে ডাকেন। অবশিষ্ট গাদ্দারদের তার হাতে তুলে দিয়ে তাদের

মস্তকগুলো দেহ থেকে ছিন্ন করিয়ে দেন।

আরো একটি হুকুম জারি করে সবাইকে স্তম্ভিত করে দেন সুলতান। তিনি আদেশ করেন, এ ফৌজ এখান থেকে সরাসরি ময়দানে রওনা করবে। তোমাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, সরঞ্জামাদি ও রসদপাতি পরে আসবে। এর অর্থ মিসরে কোন সৈন্য থাকছে না।

বাহিনী রওনা হয়ে যায়।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী গাদ্দারদের কর্তিত মস্তকগুলো খুটিয়ে খুটিয়ে দেখেন। একজনের সাথে কথা বলতে গিয়ে ফুঁপিয়ে উঠেন তিনি। বেদনার অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে আসে তাঁর নয়নযুগল। তিনি পোশাক পরিধান করেন এবং একদিকে হাঁটা দেন। হাঁটতে হাঁটতে সাথের কর্মকর্তাদের বললেন, 'আমার আশংকা হচ্ছে এই যে, দুশমনরা মিল্লাতে ইসলামিয়ায় এমনিভাবে গাদ্দার সৃষ্টি করতেই থাকবে এবং এমন দিন এসে যাবে, তখন যারা গাদ্দারদের শিরচ্ছেদ করবে, তারাও দুশমনকে বন্ধু ভাবতে শুরু করবে। আমার বন্ধুগণ! তোমরা যদি ইসলামকে সমুন্নত দেখতে চাও, তাহলে বন্ধু-শত্রুকে চিনতে শেখ।'

মিসর খালি রেখে সেনা বাহিনীকে রণাঙ্গনে প্রেরণ করার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী-

'এ বাহিনীটি এখানে অবসর বসে ছিল। তাদেরকে কাজে ব্যস্ত রাখার উদ্দেশ্যে আমি এ আদেশ জারি করলাম। আমি আদেশ দিয়ে গিয়েছিলাম যে, সৈন্যদের যেন অবসর রাখা না হয়, সামরিক মহড়া চালু রাখা হয়। সৈন্যদের শহর থেকে দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে মাঝে-মধ্যে যুদ্ধাবস্থায় রাখা হয় এবং মানসিক প্রশিক্ষণও অব্যাহত রাখা হয়। কিন্তু আমার এ আদেশ পালন করা হয়নি। দায়িত্বশীল দু'জন কর্মকর্তাকে আমি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি। তারা চক্রান্ত করে সৈন্যদের নিস্ক্রিয় রেখেছিল। অবসর পেয়ে সৈন্যরা মদ-জুয়ায় মন ভুলাতে এবং শত্রুর প্রোপাগান্ডায় কান দিতে শুরু করেছিল। আর তোমরা সম্ভবত ভাবছ যে, মিসরে এখন সৈন্য নেই। না, ভাবনার কিছু নেই। সৈন্য আসছে। আমার যে বাহিনী শোবক জয় করেছিল, তারা কায়রো ঢুকে গেছে। আমার পেছনে পেছনেই তাদের রওনা করানো হয়েছিল। তারা দুশমনকে এবং দুশমনের পাপাচারকে খুব কাছে থেকে দেখে এসেছে। তাদের হৃদয়কে কেউ বিদ্রোহী বানাতে পারবে না। শহীদের রক্তের সাথে তারা বেঈমানী করবে না। আর এখান থেকে যাদের প্রেরণ করা হল, তারা হয়ত কার্কের উপর হামলা চালাবে অথবা দুশমন তাদের উপর হামলা করবে। এ প্রক্রিয়ায় তারাও দুশমন চিনে ফেলবে। তোমরা মনে রেখ, যে সিপাহী দুশমনের চোখে চোখ রেখে একবার লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, কোন লালসা তাকে গাদ্দার বানাতে পারে না।'

নুরুদ্দীন জঙ্গী ও নিজ ভাই তকিউদ্দীনের কাছে দূত প্রেরণ করে সুলতান

সালাহুদ্দীন আইউবী গোপনে কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। নায়েবদের সাবধান করে দিয়ে যান যে, তার অনুপস্থিতির খবর যেন কেউ জানতে না পারে। রওনার সময় বলে যান, সুলতান জঙ্গী অবশ্যই সাহায্য পাঠাবেন। তিনি যে পরিমাণ সৈন্য পাঠাবেন, আমাদের ঠিক সে পরিমাণ সৈন্য এখান থেকে কায়রো পাঠিয়ে দেবে। বলে দেবে যেন পথে বেশি বিরতি না দেয়। তাতে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর উদ্দেশ্য ছিল দু'টি। প্রথমতঃ মিসরের সৈন্যরা সত্যই যদি বিদ্রোহী হয়ে থাকে, তাহলে এরা সেই বিদ্রোহ দমন করবে। দ্বিতীয়তঃ মিসরের পরিস্থিতি যদি অনুকূল থাকে, তাহলে মিসরের ফৌজ ময়দানে চলে আসবে আর ময়দানের ফৌজ মিসর ফিরে যাবে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর কায়রো উপস্থিতির সংবাদও গোপন রাখা হয়। রাতারাতি তিনি যায়নুদ্দীনের চিহ্নিত গাদ্দারদের ঘুমন্ত অবস্থায়ই গ্রেফতার করান এবং আরো কয়েকটি স্থানে তল্লাশি চালান। ফাতেমার অপহরণকারী হাশীশী তিনজন কয়েকজন নাগরিকের নাম বলেছিল। গ্রেফতার করা হয় তাদেরও। পদমর্যাদার তোয়াক্কা করা হয়নি কারো।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নির্দেশ মোতাবেক ফাতেমাকে যায়নুদ্দীনের হাতে তুলে দেয়া হয় এবং উপযুক্ত পাত্র দেখে মেয়েটিকে বিবাহ দিয়ে দিতে বলা হয়। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর এবার তকিউদ্দীনের অপেক্ষা করার পালা।

তিনদিন পর দু'শ' আরোহীসহ এসে উপস্থিত হন তকিউদ্দীন। মিসরের সার্বিক পরিস্থিতি, ঘটনা প্রবাহ এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কে অবহিত করে তাকে মিসরের ভারপ্রাপ্ত গবর্নর নিযুক্ত করেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। বলে দেন সুদানীদের প্রতি কড়া নজর রাখতে। প্রয়োজনে আক্রমণ করার অনুমতিও প্রদান করেন।

এবার শোবক অভিমুখে রওনা হতে উদ্যত হন সুলতান। ঠিক এমন সময়ে আলী বিন সুফিয়ান বলে উঠলেন, 'কার্কের খৃস্টানরা আপনার জন্য কিছু হাদিয়া প্রেরণ করেছে। অনুরোধ করছি, একটু অপেক্ষা করুন, মহামূল্যবান হাদিয়াগুলো এক নজর দেখে যান।' বলেই সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে বিস্ময়ের মধ্যে ফেলে রেখে আলী বিন সুফিয়ান বাইরে বেরিয়ে যান। 'আমার সাথে আসুন' বলে সুলতানকেও বেরিয়ে আসতে ইশারা দেন।

ঘোড়ায় চড়ে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী আলী বিন সুফিয়ানের সাথে এগিয়ে চলেন। সামান্য অগ্রসর হয়েই সুলতান দূর ময়দানে কতগুলো ঘোড়া দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। জিন বাঁধা প্রতিটি ঘোড়ার পিঠে। পাঁচশ' ঘোড়া। পার্শ্বেই দণ্ডায়মান রশিবাঁধা আটজন খৃস্টান। প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি সীমান্তরক্ষী বাহিনী। বিস্মিত কণ্ঠে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী জিজ্ঞেস করলেন, 'এসব ঘোড়া কোথা থেকে আসল?'

আলী বিন সুফিয়ান এক ব্যক্তিকে ডেকে এনে সুলতানের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এ আমার গুপ্তচর। তিন বছর পর্যন্ত লোকটি প্রকাশ্যে খৃস্টানদের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করে আসছে। এর দায়িত্ব ছিল খৃস্টান ও সুদানীদের মাঝে সংবাদ আদান-প্রদান করা। তারা একে তাদেরই গুপ্তচর বলে জানে। সম্প্রতি কার্ক গিয়ে খৃস্টান সম্রাটদের নিকট সুদানীদের পয়গাম পৌঁছায় যে, তাদের পাঁচশ' ঘোড়া ও পাঁচশ' জিনের প্রয়োজন। খৃস্টানরা চাহিদা অনুযায়ী ঘোড়া ও জিন এই আটজন সেনা অফিসারসহ প্রেরণ করে। এরা সেই সুদানী বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছিল, যাদের মিসর আক্রমণে প্রস্তুত করা হচ্ছে। আমার সিংহ এদের উত্তর দিক থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এক ফাঁদে এনে আটকে ফেলে এবং আমাদের এই সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে সংবাদ পাঠায়। তারা এলে লোকটি নিজের পরিচয় প্রদান করে এবং তাদের সহযোগিতায় ঘোড়াগুলো ও খৃস্টান সেনা অফিসারদের হাঁকিয়ে কায়রো নিয়ে আসে।'

তথ্য সংগ্রহের জন্য আলী বিন সুফিয়ান খৃস্টান অফিসারদের হাসান ইবনে আবদুল্লাহর হাতে সোপর্দ করেন এবং নিজে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সাথে শোবক রওনা হয়ে যান।

ভয়ংকর ষড়যন্ত্র

বেঈমান-গাদ্দারের অপবিত্র খুন কায়রোর বালুকাময় জমিন চুষে নেয়নি এখনো। তার আগেই দু'শ' অশ্বারোহী নিয়ে কায়রো এসে পৌঁছেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ভাই তকিউদ্দীন। সুলতান আইউবী শিরচ্ছেদ করেছেন ষড়যন্ত্রকারী আমলাদের। মনে হচ্ছিল, কায়রোর মাটি এই মৃত মুসলমানদের খুন চুষে নিয়ে নিজের বুকে স্থান দিতে বিব্রতবোধ করছে, যারা খৃস্টানদের সাথে যোগ দিয়ে সালতানাতে ইসলামিয়ার পতাকাকে ভূলুণ্ঠিত করার ষড়যন্ত্র করছিল।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী লাশগুলো দেখলেন। কর্তিত মস্তকগুলোকে রেখে দেয়া হয়েছে নিস্প্রাণ দেহগুলোর বুকের উপর। অবিচ্ছিন্ন রয়েছে মাত্র একটি মস্তক। এটিই সবচে' বড় গাদ্দারের লাশ, যার উপর পরিপূর্ণ ও অখণ্ড আস্থা ছিল সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর। একটি তীর লোকটির ধমনীতে ঢুকে গিয়ে অপরদিক দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিল। এটিই কায়রোর নগর প্রশাসক মোসলেহুদ্দীনের লাশ। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যখন তাকে হাজির করে সেনাবাহিনীকে তার অপরাধের বিবরণ দিচ্ছিলেন, তখন ইসলাম-প্রেমী উত্তেজিত এক সৈনিক একটি তীর ছুঁড়ে তার ধমনী এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছিল। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সৈনিকের এই বেআইনী আচরণ–যা ছিল সামরিক আইনের পরিপন্থী- এ জন্য ক্ষমার চোখে দেখলেন যে, কোন ঈমানদারই ইসলামের বিরুদ্ধে গাদ্দারী বরদাশত করতে পারে না। সৈনিকদের মধ্যে এই ঈমানী জযবা সুলতান আইউবী নিজেই সৃষ্টি করেছেন।

লাশগুলো দেখে সুলতান আইউবীর চেহারায় এতটুকু খুশীর ঝলকও পরিলক্ষিত হল না যে, প্রশাসনের এতগুলো গাদ্দার কুচক্রী ধরা পড়ল এবং তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হল। উল্টো তাকে বিমর্ষ মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, যেন তার কান্না পাচ্ছে। উদগত অশ্রু ঠেকাবার চেষ্টা করছেন তিনি। মনে তার প্রচণ্ড ক্ষোভ , যার প্রকাশ তিনি করেছিলেন এভাবে-

'এদের কারো জানাযা পড়া হবে না। লাশগুলো তাদের আত্মীয়-স্বজনের হাতে দেয়া যাবে না। লাশগুলো রাতের আঁধারে কোন এক গভীর গর্তে নিয়ে ফেলে মাটিচাপা দিয়ে সমান করে রেখে আস। পৃথিবীতে এদের নাম-চিহ্নও যেন অবশিষ্ট না থাকে।'

'আমীরে মোহতারাম! কোতোয়াল এবং সাক্ষীদের জবানবন্দী ও বিচারকের রায় লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা দরকার, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এ অভিযোগ উত্থাপন করতে না পারে যে, এটি একক কারো রায় ছিল। স্বীকার করি, আপনার ফয়সালা যথার্থ। আপনি অতি ন্যায়সঙ্গত বিচার করেছেন। কিন্তু আইনের দাবী অন্যকিছু।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সুহৃদ ও একান্ত বিশ্বস্ত কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ।

'যারা কাফিরদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে আল্লাহর দ্বীনের মূলোৎপাটনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, আল্লাহর বিধান তাদেরকে এই সুযোগ প্রদান করার অনুমতি দেয় কি যে, তারা আইনের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সাঃ) ও ঈমানদারদের ইজ্জতের অতন্দ্র প্রহরীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক? আমি যদি অবিচার করে থাকি, তাহলে এতগুলো মানুষ হত্যার দায়ে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দাও এবং আমার মৃতদেহটা জনবসতি থেকে বহুদূরে কোন এক মরু প্রান্তরে নিয়ে ফেলে আস। শৃগাল-শকুনরা আমার লাশটা খেয়ে আমাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলুক। কিন্তু আমার বন্ধুগণ! আমাকে শাস্তি দেয়ার আগে তোমরা পবিত্র কুরআনটা আলিফ-লাম-মীম থেকে ওয়ান্নাস পর্যন্ত পড়ে নিও। আর শাস্তি যদি দিতেই হয়, তাহলে আমার গর্দান উপস্থিত।' আবেগাপ্লুত অথচ অতীব গুরুগম্ভীর কণ্ঠে উপস্থিত কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

'আপনি অবিচার করেননি মহান সেনাপতি! কাজী শাদ্দাদ আসলে বলতে চেয়েছিল, পাছে আইনের অবমাননা হয়ে না যায় যেন।' বলল একজন।

'আমি বুঝতে পেরেছি। উদ্দেশ্য তার আয়নার মত পরিষ্কার। আমি আপনাদের শুধু এ কথাটাই বলতে চাই যে, গবর্নর যদি ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চিত জানেন যে, অভিযুক্ত সত্যিই গাদ্দারীর অপরাধে অপরাধী, তাহলে তার কর্তব্য সাক্ষ্য-প্রমাণ ও অন্যান্য আইনী ঝামেলায় না জড়িয়ে আসামীকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা। অন্যথায় বুঝতে হবে,গবর্নর নিজেও গাদ্দার। অন্তত অযোগ্য এবং বেঈমান তো অবশ্যই। আমি আশংকা করছি, যদি এদের বিচারকের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতাম, তাহলে এরা উল্টো আমাকেই অপরাধী সাব্যস্ত করে বসত। আমার বক্তব্য স্পষ্ট। তোমরা আমাকে গাদ্দারদের সারিতে দাঁড় করিয়ে দাও। দেখবে, আল্লাহর কুদরতী হাত আমাকে তাদের থেকে আলগা করে ফেলবে। তোমাদের হৃদয় যদি কাবার প্রভূর আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে, তাহলে পাপিষ্ঠদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে ভয় কর না। তথাপি বন্ধু বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ যে পরামর্শ দিয়েছেন, তোমরা তা বাস্তবায়ন করে ফেল। কাগজপত্র প্রস্তুত করে মাননীয় বিচারপতির স্বাক্ষর নিয়ে রাখ। লিখবে, 'আমীরে মেসের- যিনি মিসর সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতিও বটে- নিজের বিশেষ

ক্ষমতাবলে এই অপরাধীদের যে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছে, এদের অপরাধ সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত।'

আপন ভাই তকিউদ্দীনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন সুলতান। দীর্ঘ সফরে তিনি ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। সুলতান তাকে বললেন, 'আমি তোমার চেহারায় চিন্তা ও ক্লান্তি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তুমি মুহূর্তের জন্যও আরাম করতে পারবে না। তোমার সফর শেষ হয়নি- শুরু হল মাত্র। আমাকে শিগগিরই শোবক পৌছুতে হবে। তোমাকে জরুরী কিছু কথা বলেই রওনা হব।'

'যাওয়ার আগে আরো একটি সিদ্ধান্ত দিয়ে যাবেন আমীরে মোহতারাম! যাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হল, তাদের বিধবা ও সন্তানের কি হবে?' বলল নতুন নগর প্রশাসক।

এদের ব্যাপারেও সেই একই সিদ্ধান্ত, যা পূর্বেকার গাদ্দারদের পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে দেয়া হয়েছিল। বিধবাদের ব্যাপারে তদন্ত কর, স্বামীদের ন্যায় তাদেরও কারুর দুশমনের সাথে যোগসাজস আছে কিনা দেখ। স্ত্রী-পূজাও আমাদের মধ্যে অনেক গাদ্দার জন্ম দিয়েছে। দেখনি, সুন্দরী নারী দিয়ে খৃষ্টানরা কিভাবে আমাদের ভাইদের ঈমান ক্রয় করে নিয়েছে! এই বিধবাদের মধ্যে যারা সতী-সাধ্বী ও পাক্কা ঈমানদার বলে প্রমাণিত হবে, তাদেরকে তাদের মর্জি-মাফিক বিয়ে দিয়ে দাও। খবরদার! কারো উপর নিজেদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিও না। সাবধান! কোন নারী যেন অসহায় হয়ে না পড়ে এবং সম্মানজক ডাল-রুটি থেকে বঞ্চিত না থাকে। তাদের যেন অসহায়ত্ব বোধ করতে না হয়। খেয়াল রাখবে, কোন কুচক্রী মহল যেন একথা তাদের কানে দিতে না পারে যে, তোমাদের স্বামীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। বরং তাদের বুঝাবার চেষ্টা কর, তোমাদের সৌভাগ্য যে তোমরা এরূপ স্বামীদের থেকে মুক্তি পেয়েছ। বিশেষ ব্যবস্থাপনায় তাদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ করে দাও। যাবতীয় ব্যয় বহন করবে বাইতুলমাল থেকে। মনে রেখো, গাদ্দারের সন্তান গাদ্দারই হবে এমন কোন কথা নেই। শর্ত হল, তাদের সঠিক শিক্ষা দিয়ে ঈমানদাররূপে গড়ে তুলতে হবে। তোমরা ভুলে যেও না যে, এরা মুসলমানের সন্তান। এদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যেন এদের মনে কোন প্রকার অসহায়বোধ জাগতে না পারে। খবরদার! পিতার পাপের কাফফারা যেন সন্তানদের আদায় করতে না হয়।' জবাব দেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

❁ ❁ ❁

শোবক রওনা হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তিনি ভাবছেন, পাছে তার অনুপস্থিতিতে খৃস্টানরা হামলা করে বসে কিনা। নূরুদ্দীন জঙ্গীর প্রেরিত বাহিনী ময়দানে পৌঁছে গেছে। কায়রোর বাহিনীও এগিয়ে যাচ্ছে সেদিকে। উভয় বাহিনীকে এলাকা ও পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে পরিচিত করে তুলতে

হবে। নিজ দফতরে গিয়ে বসেন সুলতান। ডেকে পাঠান ভাই তকিউদ্দিন, আলী বিন সুফিয়ান, আলীর নায়েব হাসান ইবনে আবদুল্লাহ, কোতোয়াল গিয়াস বিলবিস এবং আরো কয়েকজন নায়েব-কর্মকর্তাকে। বেশিরভাগ উপদেশ প্রদান করেন ভাই তকিউদ্দীনকে। প্রথমে বৈঠকে তিনি ঘোষণা দেন, 'আমার অনুপস্থিতিতে আমার ভাই তকিউদ্দিন আমার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং মিসরে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবে। তার ঠিক ততটুকু ক্ষমতা থাকবে, যতটুকু ছিল সালাহুদ্দীন আইউবীর।

'তকিউদ্দীন! আজ থেকে মন থেকে ঝেড়ে ফেল যে, তুমি সালাহুদ্দীন আইউবীর ভাই। অযোগ্যতা, অসততা, অবহেলা, গাদ্দারী, ষড়যন্ত্র কিংবা কোন অন্যায়-অবিচারে যদি লিপ্ত হও, তাহলে তোমাকেও সেই শাস্তিই ভোগ করতে হবে, যা শরীয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছে।' তকিউদ্দীনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

'আমি আমার কর্তব্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ সচেতন আছি মোহতারাম আমীরে মেসের! মিসরের বিরাজমান সমস্যা সম্পর্কে আমি পূর্ণ ওয়াকিফহাল।' অবনত মস্তকে বললেন তকিউদ্দীন।

'শুধু মিসরই নয়, সমগ্র সালতানাতে ইসলামিয়া এই হুমকির সম্মুখীন। ইসলামের প্রসার ও ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তারে এসব সমস্যা বিরাট এক প্রতিবন্ধক। তোমাকে স্মরণ রাখতে হবে, সালতানাতে ইসলামিয়ার কোন একটি ভূখণ্ড কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের জমিদারী নয়। এর মালিক আল্লাহ। তোমরা এর পাহারাদার মাত্র। এর প্রতিটি অণু-পরমাণু তোমাদের হাতে আমানত। এর এক মুষ্ঠি মাটিও যদি তোমাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে হয়, তাহলে আগে ভেবে দেখ, তুমি অন্যের হক নষ্ট করছ কিনা, আল্লাহর আমানতের খেয়ানত হচ্ছে কিনা। আমার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শোন তকিউদ্দীন! ইসলামের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য এই যে, তার অনুসারীদের মধ্যে গাদ্দার ও কুচক্রী মানুষের সংখ্যা অনেক। মুসলমান যত গাদ্দার জন্ম দিয়েছে, এত আর কোন জাতি দেয়নি। আমাদের আল্লাহর পথে জিহাদের গৌরবময় ইতিহাস গাদ্দারীর ইতিহাসে পরিণত হতে চলেছে। স্বজাতি ও স্বধর্মের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বেড়ানো যেন আমাদের ঐতিহ্যের রূপ ধারণ করেছে। আলী বিন সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস কর তকি! আমাদের যেসব গুপ্তচর খৃস্টানদের এলাকায় দায়িত্ব পালন করছে, তাদের রিপোর্ট হল, 'খৃস্টান সম্রাটগণ, ধর্মীয় নেতৃবর্গ ও সচেতনমহল ইসলামের এই দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত যে, মুসলমান নারী আর ক্ষমতার লোভে নিজ ধর্ম, দেশ ও জাতির সিংহাসন উল্টিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না।'

সভাসদ সকলের প্রতি একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন সুলতান। বললেন, আমাদের

গোয়েন্দারা জানিয়েছে যে, খৃস্টানরা তাদের গুপ্তচরদের ধারণা দিয়েছে, মুসলমানদের ইতিহাস যতটা বিজয়ের, ততটা গাদ্দারীরও বটে। তারা যে পরিমাণ গাদ্দার জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে, সে পরিমাণ বিজয় তারা অর্জন করতে পারেনি। তাদের রাসূলের ওফাতের পরপরই খেলাফতের দখলদারিত্ব নিয়ে মুসলমানরা পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয়। ক্ষমতার স্বার্থে তারা একে অপরকে হত্যা করে। কেউ খলীফা বা আমীর নিযুক্ত হলে নিজের মসনদের জন্য হুমকি হতে পারে এমন লোকদের অবলীলায় হত্যা করে। এমনকি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য তারা শত্রুদের নিকট থেকে পর্যন্ত সহযোগিতা গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি। পারস্পরিক সংঘাতে তাদের জাতীয় ঐতিহ্য বিনষ্ট হয়েছে। রয়ে গেছে শুধু ব্যক্তিগত ক্ষমতার দাপট। থেমে গেছে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ধারা।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বললেন, 'খৃস্টানরা আমাদের এই ঐতিহাসিক দুর্বলতা সম্পর্কে সম্যক অবগত যে, আমরা ব্যক্তি ক্ষমতার সংরক্ষণ ও নিশ্চিতকরণের স্বার্থে সালতানাতের বিশাল অংশও বিসর্জন দিতে পারি। এটাই আমাদের ইতিহাসে পরিণত হতে যাচ্ছে।'

'তকিউদ্দীন ও আমার বন্ধুগণ! আমি যখন অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করি এবং যখন বর্তমান যুগের গাদ্দারদের বিশ্বাসঘাতকতা ও চক্রান্তের জাল দেখতে পাই, তখন আমি এই আশংকাবোধ করি যে, একটি সময় আসবে, যখন মুসলমান তাদের ইতিহাসের সাথেও গাদ্দারী করবে। জাতির চোখে ধুলো ছিটিয়ে তারা লিখবে যে, তারাই বীর এবং তারাই দুশমনের নাকে রশি বেঁধে রেখেছে। অথচ তারা হবে দুশমনের তাবেদার। দুশমন হবে তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। নিজেদের ব্যর্থতা ও পরাজয়ের উপর পর্দা ঝুলিয়ে রাখবে। ইসলামী সম্রাজ্য ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকবে এবং আমাদের স্বঘোষিত খলীফা তার দায়দায়িত্ব অন্যের উপর চাপাতে চেষ্টা করবে। মুসলমানদের একটি বংশধর এমন আসবে, যারা 'ইসলাম জিন্দাবাদ' শ্লোগান দিয়ে ঈমানী কর্তব্য শেষ করবে। নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে কিছুই তাদের জানা থাকবে না। তাদেরকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার মতও কেউ থাকবে না যে, একদল মানুষ আপন বাড়ীঘর, স্ত্রী-স্বজন ত্যাগ করে দূরে মরু-প্রান্তরে পাহাড়ে-উপত্যকায়, বিদেশ-বিভূঁইয়ে গিয়ে লড়াই করে ইসলামের অস্তিত্ব ও পতাকা রক্ষা করেছে। তারা বিশাল বিশাল নদী-সমুদ্রে সাঁতার কেটেছিল। আকাশের বিদ্যুৎ-বজ্র, আঁধার-ঝড় কিছুই তাদের গতিরোধ করতে পারেনি। এমন এমন দেশে গিয়ে জীবন বাজি রেখে তারা লড়াই করেছে, যেখানকার পাথর খণ্ডও ছিল তাদের দুশমন। লড়াই করেছে তারা ক্ষুৎ-পিপাসায় বিনা অস্ত্রে বিনা বাহনে। তারা আহত হয়েছে। কেউ তাদের জখমে পট্টি বাঁধেনি। শহীদ হয়েছে। সঙ্গীরা তাদের জন্য কবর খনন করার সুযোগ

পায়নি। তারা রক্ত ঝরিয়েছে নিজেদের। রক্ত ঝরিয়েছে শত্রুদের। আর ঠিক সেই সময়ে কসরে খেলাফতে আসর বসেছিল মদের। নেচে গেয়ে উলঙ্গ সুন্দরী মেয়েরা আনন্দ দিচ্ছিল খলীফা ও তার সাঙ্গদের। ইহুদী ও খৃস্টানরা সোনা আর নারীর রূপ দিয়ে অন্ধ করে দিয়েছিল আমাদের খলীফা ও আমীরদের। খলীফারা যখন দেখলেন যে, দেশের মানুষ সেই অস্ত্রধারী মুজাহিদদের ভক্ত-অনুরক্ত হয়ে যাচ্ছে, যারা ইউরোপ ও ভারত উপমহাদেশে ইসলামের ঝান্ডা উড্ডীন করেছেন, তখন তারা খলীফাদের টার্গেটে পরিণত হন। ব্যভিচারের ন্যায় অপবাদ আরোপ শুরু হয় তাদের উপর। বন্ধ করে দেয় সৈন্য ও রসদ সরবরাহ।

এই মুহূর্তে আমার কাসেমের সেই অপরিণত বয়সী ছেলেটির কথা মনে পড়ছে, যে কারো কোন সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া হিন্দুস্তানের শক্তিধর এক শাসককে পরাজিত করেছিল এবং হিন্দুস্তানের বিশাল এক ভূখণ্ড কব্জা করে নিয়েছিল। ছেলেটি বিজিত এলাকায় এমন সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল যে, হিন্দুরা তার গোলামে পরিণত হয়ে যায় এবং তার স্নেহপূর্ণ সুশাসনে প্রভাবিত হয়ে মুসলমান হয়ে যায়। আমার যখন এই ছেলেটির কথা মনে পড়ে, তখন মনটা আমার ব্যথায় কুঁকিয়ে উঠে। কিন্তু তৎকালীন খলীফা তার সাথে কিরূপ আচরণ করলেন? তার উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করলেন এবং অপরাধীর ন্যায় প্রত্যাহার করে নিলেন।' বলতে বলতে হিঁচকি উঠে যায় সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর। বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠে তার দু'নয়ন। থেমে যান তিনি।

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তার রোজনামচায় লিখেছেন-

'আমার বন্ধু সালাহুদ্দীন আইউবী তার ফৌজের হাজারো শহীদের লাশ দেখলেও বিচলিত হতেন না; বরং তার চোখ-মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত। কিন্তু একজন গাদ্দারকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে যখন তার লাশে চোখ ফেলতেন, তখন তার মুখমণ্ডল বিমর্ষ হয়ে উঠত এবং দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াতে শুরু করত। তেমনি মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের কথা বলতে বলতেও তার হিঁচকি এসে যায়– তিনি বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়েন। তখন আমি নিজ চোখে দেখেছি যে, তিনি অশ্রু রোধ করার চেষ্টা করছিলেন।'

তারপর তিনি বলতে লাগলেন- 'দুশমন তার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। তাকে শহীদ করল তার আপন লোকেরা। দুমশন তাকে বিজেতারূপে বরণ করে নিল আর আপনরা তাকে আখ্যা দিল ব্যভিচারী।'

'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যিয়াদের পুত্র তারেকের কথাও উল্লেখ করলেন। সেদিন তিনি এতই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন যে, জবান তার থামছিল না যেন। অথচ স্বভাবগতভাবেই তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী। ছিলেন বাস্তববাদী। আমরা সকলে নীরব বসে রইলাম। অদ্ভুত এক প্রতিক্রিয়া অনুভব হচ্ছিল আমাদের। সালাহুদ্দীন আইউবী একজন মহান নেতা ছিলেন নিশ্চিত। অতীতকে তিনি কখনো ভুলতেন না।

সমকালীন সমস্যা ও সময়ের দাবীর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। দৃষ্টি তার নিবদ্ধ হয়ে থাকত অনাগত সুদূর ভবিষ্যতের প্রতি।'

খৃস্টানদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমাদের ভবিষ্যতের উপর নিবদ্ধ। খৃস্টান সম্রাট ও শাসকবর্গ বলছে যে, তারা ইসলামকে চিরতরে খতম করে দেবে। তারা আমাদের সাম্রাজ্য দখল করতে চায় না। আমাদের হৃদয়গুলো তারা চিন্তার তরবারী দিয়ে কেটে ক্ষত-বিক্ষত করতে চায়। আমার গোয়েন্দারা আমাকে বলেছে যে, খৃস্টাদের সবচেয়ে কট্টর ইসলাম-দুশমন সম্রাট ফিলিপ অগাস্টাসের বক্তব্য হল, তারা তাদের জাতিকে একটি লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছে এবং একটি ধারার প্রবর্তন করে দিয়েছে। এখন তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পর্যায়ক্রমে সে লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যাবে। তারা তরবারীর জোরে লক্ষ্য হাসিল করা প্রয়োজন মনে করে না। তরবারী ছাড়া অন্য অস্ত্রও আছে তাদের কাছে ...। তকিউদ্দীন! তাদের দৃষ্টি যেমন ভবিষ্যতের প্রতি, তেমনি আমাদেরও ভবিষ্যতের উপর নজর রাখা দরকার। তারা যেভাবে আমাদের মধ্যে গাদ্দার সৃষ্টি করার ধারা চালু করে দিয়েছে, তেমনি আমাদেরও এমন সব উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, যাতে গাদ্দারীর জীবাণু চিরতরে শেষ হয়ে যায়। গাদ্দারদের হত্যা করতে থাকা কোন প্রতিকার নয়। গাদ্দারীর প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। ক্ষমতার মোহ দূর করে আমাদের রাসূল-প্রেম সৃষ্টি করতে হবে। আর তার জন্য জাতির মনে দুমশনের অস্তিত্বের অনুভূতি থাকতে হবে। মুসলমানদের জানতে হবে যে, খৃস্টানদের সভ্যতায় এমন অশ্লীলতা বিরাজমান, যা চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণীয়। বিভিন্ন জাতি আপন ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে তাদের সভ্যতায়। তাদের ধর্মে মদপান করা বৈধ। মেয়েদের পরপুরুষের সামনে বিবস্ত্র নাচ-গান ও নির্জনে সময় কাটানো সবই সিদ্ধ। আমাদের ও তাদের মধ্যে বড় পার্থক্য এটাই যে, আমরা নারীর ইজ্জতের পাহারাদার আর তারা নারীর ইজ্জতের বেপারী। এই ব্যবধানটাই আজ আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা মুছে ফেলতে চায়। তকিউদ্দীন! তোমার যুদ্ধক্ষেত্র দু'টি। একটি মাটির উপরে, অপরটি মাটির নীচে। একটি হল দুমশনের বিরুদ্ধে আর অপরটি আপনদের বিরুদ্ধে। আমাদের নিজেদের মধ্যে যদি গাদ্দার না থাকত, তাহলে এ মুহূর্তে আমরা এখানে নয়, বৈঠক করতাম ইউরোপের হৃদপিন্ডে আর খৃস্টানরা আমাদের বিরুদ্ধে সুন্দরী মেয়ের পরিবর্তে ভালো কোন অস্ত্র ব্যবহার করত। আমাদের ঈমানের উত্তাপ যদি তীব্র হত, তাহলে এতদিনে খৃস্টানরা সে উত্তাপে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যেত।'

'আপনার সমস্যাগুলো আমি এখানে এসে বুঝতে পারলাম। মোহতারাম নূরুদ্দীন জঙ্গীও পুরোপুরি অবহিত নন যে, আপনি মিসরে একটি গাদ্দার বাহিনীর বেষ্টনীতে পড়ে গেছেন। এ ব্যাপারে তো আপনি তার সাহায্য নিতে পারতেন।' বললেন তকিউদ্দীন।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী জবাব দিলেন-

'ভাই তকি! সাহায্য শুধু আল্লাহরই নিকট প্রার্থনা করা উচিত। সাহায্য প্রার্থনা আপনদের নিকট করা হোক বা দুশমনের নিকট, তা ঈমানকে দুর্বল করে দেয়। খৃষ্টানদের বাহিনী বর্মপরিহিত। আমার সৈন্যরা আবৃত থাকে সাধারণ পোশাকে। তারপরও তারা খৃষ্টানদের পরাজিত করেছে বারবার। ঈমান যদি লোহার মত শক্ত হয়, তাহলে লৌহবর্মের প্রয়োজন হয় না। বর্ম ও খন্দক নিরাপত্তার অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং সৈন্যদের নির্ধারিত সীমানার মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে। যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি সব সময় পরিখার বাইরে থাকবে। ঘুরে-ফিরে লড়াই করবে। দুশমনের পিছনে যাবে না কখনো, বরং দুশমনকেই পিছনে রেখে লড়াই চালিয়ে যাবে। কেন্দ্র ঠিক রাখবে। পার্শ্ব বাহিনীকে ছড়িয়ে দেবে। দুশমনকে বেকায়দায় ফেলে হত্যা করবে। গেরিলা বাহিনী ব্যতীত কখনো যুদ্ধে যাবে না। গেরিলাদের দ্বারা দুশমনের রসদ ধ্বংস করাবে। পেছন থেকে যে রসদ আসবে, তাও ধ্বংস করবে এবং যা তাদের সাথে আছে, তাও ধ্বংস করবে। গেরিলাদেরকে দুশমনের পশুদের হত্যা কিংবা অস্থির করে তোলার কাজে ব্যবহার করবে। কখনো মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত হবে না। যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করবে। দুশমনকে পেরেশান করে রাখবে। যে বাহিনীটি আমি রেখে যাচ্ছি, সেটি ময়দান থেকে এসেছে। তারা শোবক দুর্গ জয় করে এসেছে। এসেছে দুশমনের চোখে চোখ রেখে। এসেছে নিজের বহু সৈন্য শহীদ করিয়ে। জানবাজ গেরিলা বাহিনীও আছে এর মধ্যে। তাদের শুধু ইশারার প্রয়োজন। এই বাহিনীর মধ্যে আমি ঈমানের উত্তাপ সৃষ্টি করে রেখেছি। পাছে এমন যেন না হয় যে, তুমি নিজেকে সম্রাট ভেবে বস আর বাহিনীটির ঈমান ধ্বংস করে ফেল। আমাদের উপর যেসব হামলা হচ্ছে, তা আসছে আমাদের ঈমানের উপর। মনে রেখো, খৃষ্ট সভ্যতা মিসরে ঢুকে পড়ছে বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তার ভাই তকিউদ্দীনকে বিস্তারিত বুঝিয়ে দেন যে, সুদানে মিসর আক্রমণের প্রস্তুতি চলছে। সুদানীদের অধিকাংশ হল ওখানকার হাবশী উপজাতি, যারা না মুসলমান, না খৃস্টান। তাদের মধ্যে এমন কিছু মুসলমানও আছে, যারা মিসরের এই বাহিনীর পলাতক সৈনিক। বিদ্রোহের অভিযোগে তাদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছিল। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বললেন-

'কিন্তু তুমি ঘরে বসে দুমশনের অপেক্ষা করবে না। গোয়েন্দারা তোমাকে রিপোর্ট জানাতে থাকবে। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তোমার সাথে থাকবে। যখনই টের পাবে যে, দুশমনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে এবং তারা আক্রমণ করার জন্য সমবেত হচ্ছে, সময় নষ্ট না করে সাথে সাথে তুমি হামলা করে ফেলবে এবং প্রস্তুত অবস্থাতেই দুশমনদের খতম করে দেবে। পেছনের ব্যবস্থাপনা শক্ত রাখবে। দেশবাসীকে যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করতে থাকবে। আল্লাহ না করুন যদি তুমি পরাজিত হও,

তাহলে নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়ে জাতিকে পরাজয়ের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে অবহিত করবে। যুদ্ধে লড়া হয় জনগণের রক্ত ও অর্থে। যুদ্ধে দেশবাসীর সন্তানরাই শহীদ হয়, পঙ্গু হয়। তাই জনগণের সমর্থন নিয়েই কাজ করতে হবে। যুদ্ধকে রাজা-বাদশাদের খেলতামাশা মনে করবে না। এটি একটি জাতীয় বিষয়। এতে জাতিকে সাথে রাখতে হবে।

আমি যে ফাতেমী খেলাফতকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলাম, তার সমর্থকরা এখনো আমাদের বিরুদ্ধে তৎপর। আমি জানতে পেরেছি যে, তারা নাকি একজনকে তাদের খলীফা নির্ধারণ করে রেখেছে। তাদের খলীফা আল আজেদ মৃত্যুবরণ করেছে ঠিক; কিন্তু এ আশায় তারা এই খেলাফতকে জীবিত রেখেছে যে, সুদানীরা মিসরে আক্রমণ করবে, আমাদের সৈন্যরা বিদ্রোহ করবে এবং এই সুযোগে খৃস্টানরা গোপনে ভেতরে ঢুকে ফাতেমী খেলাফত পুনর্বহাল করে দেবে। ফাতেমীরা হাসান ইবনে সাব্বাহর ঘাতক দলের সহযোগিতা পাচ্ছে। আমি আলী বিন সুফিয়ানকে সাথে করে নিয়ে যাচ্ছি। তার নায়েব হাসান ইবনে আবদুল্লাহ ও কোতোয়াল গিয়াস বিলবিসকে তোমার সাথে রেখে যাচ্ছি। এরা গুপ্ত বাহিনীর প্রতি নজর রাখবে। তুমি সেনাভর্তি বাড়িয়ে দাও এবং সামরিক মহড়া চালিয়ে যাও।'

'ইদানীং আমাদের নিকট সংবাদ আসছে যে, মিসরের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকা থেকে ফৌজে লোক পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা এ সংবাদও পেয়েছি যে, সেখানকার জনগণ সেনাবাহিনীর বিপক্ষে চলে গেছে।' বলল হাসান ইবনে আবদুল্লাহ।

'তার কারণ জানা গেছে কি?' জিজ্ঞেস করেন আলী বিন সুফিয়ান।

'আমার দু'জন গুপ্তচর সে এলাকায় খুন হয়েছে। সেখান থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথাপি আমি নতুন লোক পাঠিয়েছি।' জবাব দেন হাসান।

'আমার সন্দেহ, সেখানকার মানুষ নতুন কোন প্রোপাগান্ডার শিকার হয়ে পড়েছে। এলাকাটা বড় দুর্গম। মানুষগুলো বড় পাষাণ, বিশ্বাসে নড়বড়ে এবং সন্দেহপ্রবণ।' বলল গিয়াস বিলবিস।

'সংশয়প্রবণতা বড় এক অভিশাপ। যা হোক, তোমরা এলাকাটার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখ এবং সেখানকার মানুষগুলোকে সংশয় থেকে রক্ষা করার পদক্ষেপ নাও।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

তিন-চার দিন পর।

কার্ক দুর্গে মিটিং বসেছে খৃস্টানদের। খৃস্টান সম্রাট ও সেনা অধিনায়কগণ বৈঠকে উপস্থিত। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর অগ্রযাত্রায় তারা শংকিত। তিনি শোবক নিয়ে গেছেন; যে কোন মুহূর্তে কার্কও আক্রান্ত হতে পারে বলে তারা বেজায় চিন্তিত।

মুসলমানরা যদি শোবকের ন্যায় কার্কও জয় করে নিয়ে যায়, তাহলে জেরুজালেম রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে ভেবে তারা বিচলিত। তারা টের পেয়েছে যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সাবধানতার সাথে অগ্রসর হচ্ছেন। তিনি একটি এলাকা দখল করছেন আর নতুন ভর্তি দিয়ে সৈন্যের অভাব পূরণ করছেন। নতুন সৈন্যদেরকে পুরাতন সৈন্যদের সাথে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন এবং যখন নিশ্চিত হচ্ছেন যে, এবার এরা শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার যোগ্য হয়েছে, তখন সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছেন। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর এই কর্মধারাকে সামনে রেখেই খৃস্টানরা কার্কের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্ত করেছে, বাইরে এসে লড়াই করারও পরিকল্পনা প্রস্তুত। কিন্তু এ বৈঠকে তারা সেই পরিকল্পনায় পরিবর্তন সাধন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তার বাহিনী ও মিসরের সাম্প্রতিক বিপ্লব সংক্রান্ত গোয়েন্দা প্রধান হরমুনের রিপোর্টই তাদের নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর যে বাহিনীটি শোবক দুর্গ জয় করেছিল, তিনি তাদেরকে কায়রো নিয়ে গেছেন। কায়রোর বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়েছেন। নূরুদ্দীন জঙ্গীর সামরিক সাহায্য ময়দানে পৌঁছে গেছে। সুলতান আইউবী কায়রো গিয়েছেন এবং কুচক্রী গাদ্দারদের শাস্তি দিয়ে আবার রণাঙ্গনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে গুপ্তচর মারফত সে সংবাদ কার্ক পৌঁছে গিয়েছিল। কায়রোর উপ-রাষ্ট্রপ্রধান মোসলহুদ্দীনের গ্রেফতারি ও মৃত্যুদণ্ডের সংবাদ ছিল খৃস্টানদের জন্য অনভিপ্রেত। মোসলেহুদ্দীন ছিল খৃস্টানদের একজন সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ট। বৈঠকে এসব ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ দিচ্ছিলেন গোয়েন্দা প্রধান হরমুন।

তিনি বললেন, মোসলেহুদ্দীনের মৃত্যুতে আমাদের বিরাট ক্ষতি হয়েছে ঠিক; কিন্তু তকিউদ্দীনের নিয়োগ আমাদের জন্য আশাব্যঞ্জক। তকিউদ্দীন সালাহুদ্দীন আইউবীর ভাই বটে, তবে আমাদের গুপ্তবাহিনী তাকে বাগে আনতে সক্ষম হবে। আরো আশার কথা হল, সালাহুদ্দীন এবং আলী বিন সুফিয়ান দু'জনই কায়রোতে অনুপস্থিত।

'আমি বুঝতে পারছি না যে, তোমার হাশীশীরা কি করছে! অভাগারা এখনো সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করতে পারল না! টাকা তো এ পর্যন্ত প্রচুর নষ্ট করলাম।' বললেন সম্রাট রেমান্ড।

'অর্থ যা ব্যয় করছি, নষ্ট হচ্ছে না। আমি আশা করছি, সালাহুদ্দীন আইউবী রণাঙ্গন পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবেন না। তার সাথে যে চব্বিশজন দেহরক্ষী কায়রো গিয়েছিল, তাদের চারজন আমাদের হাশীশী সদস্য। মওকা তাদের হাতে এসে গেছে। সব আয়োজন আমি সম্পন্ন করে দিয়েছি। সালাহুদ্দীন আইউবীকে তারা পথেই হত্যা করে ফেলবে। সংবাদটা এই এসে পড়ল বলে।' বললেন হরমুন।

'আমাদের এত আত্মবিশ্বাস না থাকা উচিত। ধরে রাখ, সালাহুদ্দীন আইউবী নিহত হয়নি এবং জীবিত ও অক্ষত রণাঙ্গনে অবস্থান করছে। তার কাছে আছে এখন তাজাদম বাহিনী। নতুন ভর্তির পর এখন তার সৈন্য সংখ্যা অনেক। নূরুদ্দীন জঙ্গীর সাহায্যও পেয়ে গেছে। শোবকের ন্যায় দুর্ভেদ্য দুর্গ এখন তার দখলে। তার রসদ এখন কায়রো থেকে আসবে না। শোবকে তিনি বিপুল খাদ্য-সম্ভার জোগাড় করে রেখেছেন। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কি, সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। আমি এই সুযোগ দিতে চাই না যে, আইউবী কার্ক অবরোধ করে ফেলবেন আর আমরা তার অবরোধে লড়াই করব।' বললেন ফিলিপ অগাস্টাস।

'আইউবীকে আমরা দুর্গ অবরোধ করার সুযোগ দেব না। আমরা দুর্গের বাইরে গিয়ে লড়াই করব এবং এমন ধারায় লড়ব যে, ধীরে ধীরে আমরাই বরং শোবক অবরোধ করে ফেলব।' বললেন অপর এক খৃস্টান সম্রাট।

'সালাহুদ্দীন মরু-শিয়াল। মরু এলাকায় তাকে পরাস্ত করা সহজ নয়। আমাদেরকে তিনি শোবক অবরোধ করার সুযোগ হয়তো দেবেন, কিন্তু বিনিময়ে স্বয়ং আমাদেরকেই তিনি অবরুদ্ধ করে ফেলবেন। আমি তার চাল বুঝে ফেলেছি। তোমরা যদি মুখোমুখি এনে তাকে লড়াই করাতে বাধ্য করতে পার, তাহলে আমি তোমাদেকে বিজয়ের গ্যারান্টি দিতে পারি। তবে একথা সত্য যে, তোমরা তাকে মুখোমুখি আনতে পারবে না।' বললেন ফিলিপ অগাস্টাস।

দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত হল, অর্ধেক সৈন্য দুর্গের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হবে। তারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনীর সন্নিকটে ছাউনী ফেলে অবস্থান নেবে এবং মুসলিম বাহিনীর গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখবে।

এ পরিকল্পনায় যারা দুর্গের বাইরে গিয়ে লড়াই করবে, তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, সংখ্যায় তারা হবে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনীর তিনগুণ। দ্বিগুণ তো অবশ্যই। পেছন দিক থেকে আক্রমণ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে স্বতন্ত্র বাহিনী। পরিকল্পনায় স্থির করা হয়েছে, যেহেতু মুসলিম বাহিনীর রসদ ও অন্যান্য সাহায্য আসবে শোবক থেকে, তাই শোবক আর মুসলমানদের মধ্যকার ফাঁকা স্থানকে রাখতে হবে কমান্ডো বাহিনীর দখলে। সম্মুখ থেকে এত জোরালো আক্রমণ চালাতে হবে, যাতে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী একস্থানে স্থির হয়ে মুখোমুখি লড়াই করতে বাধ্য হন।

খৃস্টানদের ভরসা মূলত বর্মাচ্ছাদিত বাহিনীর উপর। তাদের অধিকাংশ সৈন্য বর্মপরিহিত। সকলের মাথায় শিরস্ত্রাণ। উট-ঘোড়াগুলো পর্যন্ত বর্মাচ্ছাদিত। তাদের ইউরোপিয়ান ঘোড়াগুলো মরুভূমিতে অল্পসময়ে ক্লান্ত ও বেহাল হয়ে যায় বলে তারা আরব থেকে ঘোড়া ক্রয় করে এনেছে। কিন্তু সংখ্যায় তেমন বেশী নয়। তাই তারা

মুসলমানদের কাফেলা থেকে ঘোড়া ছিনতাই করতে শুরু করেছিল। চুরি করেও এনেছে কিছু। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ঘোড় উন্নতজাতের। তার আরবী জাতের ঘোড়াগুলো অসীম সহনশীল। পিপাসায় অকাতর মাইলের পর মাইল ছুটতে পারে এগুলো।

এতো হলো খৃস্টানদের সামরিক প্রস্তুতি। এর বাইরে তারা আরেকটি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ঘোষণা করে রেখেছিল। সে ব্যাপারে গোয়েন্দা প্রধান হরমুনের রিপোর্ট হল, সালাহুদ্দীন আইউবী মিসরের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা থেকে নতুন ভর্তি পাবেন না। অত্র অঞ্চলের কেউ তার বাহিনীতে ভর্তি হবে না। এই সেই এলাকা, যার ব্যাপারে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর উপ-গোয়েন্দা প্রধান হাসান ইবনে আবদুল্লাহ রিপোর্ট করেছিলেন যে, অমুক এলাকার মানুষ এখন সেনাবাহিনীতে ভর্তি হচ্ছে না এবং অনেক লোক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধাচারণ করছে।

এটি একটি অবাধ্য ও দাঙ্গাবাজ গোত্রের অঞ্চল। এক সময় এরা সুলতান আইউবীকে বেশ ভাল ভাল সৈন্য দিয়েছিল। কিন্তু এখন হরমুনের রিপোর্ট প্রমাণ করছে, খৃস্টানদের সন্ত্রাসী বাহিনী সে এলাকায় পৌছে গেছে। তাদের অপতৎপরতায় এখন সেখানকার পরিস্থিতি এত নাজুক হয়ে গেছে যে,হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ সংবাদ নেয়ার জন্য দু'জন গোয়েন্দা প্রেরণ করেছিলেন ;দু'জনই খুন হয়েছে। তাদের লাশ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। শুধু রহস্যময় ধরনের একটি সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল যে, তাদেরকে চিরদিনের জন্য গুম করে ফেলা হয়েছে। বিশাল-বিস্তৃত সেই লোকালয়টি এখন দুর্ভেদ্য দুর্গ। সেখান থেকে কোন তথ্য সংগ্রহ করে আনা এখন মুসলমানদের পক্ষে অসম্ভব। শুধু এতটুকু তথ্য জোগাড় করা সম্ভব হয়েছে যে, সেখানকার জনসাধারণ মুসলমান বটে, তবে তারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটি সম্প্রদায়।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে হরমুন জানান যে, তার পরিকল্পনা সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলছে। এখন তিনি মিসরের সবক'টি সীমান্ত এলাকায় এ পন্থা প্রয়োগ করবেন। তারপর ধীরে ধীরে এর প্রভাব মিসরের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করবেন। হরমুন আশা প্রকাশ করেন যে, গোটা মিসরকেই তিনি তার প্রভাব-বলয়ে নিয়ে আসবেন। তিনি বললেন, আমি মুসলমানদের এমন একটি দুর্বলতাকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছি, যাকে তারা নিজেদের গুণ মনে করে। মুসলমান দরবেশ-ফকির, পীর-মুরীদ, মাওলানা-মৌলভী এবং মসজিদের কোণে বসে আল্লাহ আল্লাহ জিকিরকারী সকলেই বুজুর্গ ধরনের এমন একদল লোককে নির্বিচারে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে থাকে, যারা ইসলামী ফৌজের সেই সব সালারদের শত্রু মনে করে, যারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে খ্যাতি অর্জন করেছে। এই পীর-মাশায়েখগণ তাদের আপন আপন ভক্ত-মুরিদদের

বলে থাকেন যে, আল্লাহ তাদের হাতে আছেন। তারা আল্লাহর খাস বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। তদের চিন্তা, কিভাবে তারা জনমনে সুখ্যাতি অর্জন করবেন। যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার হিম্মত তাদের নেই। তাই ফৌজের সালারগণ ময়দানে জীবনবাজি লড়াই করে যে খ্যাতি অর্জন করেছে, তারা ঘরে বসেই তা লাভ করতে চায়। প্রকৃত বিচারে মুসলমানদের এই সেনাপতিগণই– সালাহুদ্দীন আইউবী ও নুরুদ্দীন জঙ্গী যাদের অন্যতম– খাঁটি মানুষ, আসল মুসলমান। দেশের মানুষ যদি ইবাদত-বন্দেগীতে তাদের নামও উল্লেখ করে, আমি বলব, তারা এর হকদার। কিন্তু তাদের খলীফারা ইবাদতের মধ্যে নিজেদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করে ফেলেছেন। পাশাপাশি নামধারী আলেম ও ইমামদের একটি দলের আবির্ভাব ঘটেছে, যারা কাজ করতে ভয় পান। খলীফাদের ছত্রছায়ায় তারা জিহাদের বিকৃত ব্যাখ্যা দিচ্ছে, যাতে মানুষ জিহাদবিমুখ হয়ে তাদের নিকট গিয়ে ভীড় জমায় এবং তাদেরকে পীর-বুজুর্গ,আল্লাওয়ালা জেনে শ্রদ্ধা করে। তারা এমন যাদুময় ভাষায় কথা বলে যে, সাধারণ মানুষ ভাবতে শুরু করে, তাদের হৃদয়ে এমন এমন ভেদ লুকায়িত আছে, যা আল্লাহ যাকে তাকে দান করেন না। ফলে সরল-সহজ মানুষ তাদের পাতা ফাঁদে আটকা পড়ে যাচ্ছে। আমি সেই আলেম ও দরবেশদের কাজে লাগাচ্ছি। মুসলমানদের এই দুর্বলতা আমাদের অনেক ফায়দা দিচ্ছে। আমি মুসলমানদেরকে ইসলামেরই কথা শুনিয়ে শুনিয়ে ইসলামের মৌল চেতনা থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছি। ইতিহাস সাক্ষী আছে যে, ইহুদীরা তথ্যসন্ত্রাস দিয়েই ইসলামকে বেশ দুর্বল করে দিয়েছিল। আমি তাদেরই নীতিমালা অনুসারে কাজ করে যাচ্ছি।

এটিই সেই যুদ্ধক্ষেত্র, যার ব্যাপারে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। তার এত দুশ্চিন্তার মূল কারণ, এই যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরই জাতির লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করছে এবং সে যুদ্ধক্ষেত্র তাঁর দৃষ্টির আড়ালে।

✿ ✿ ✿

তকিউদ্দীন ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দিয়ে সালাহুদ্দীন আইউবী রণাঙ্গনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। সাথে চব্বিশজন ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর একটি বাহিনী। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর দেহরক্ষীদের এই সংখ্যা জানা ছিল খৃস্টানদের। তারা এও জানত যে, এই বাহিনীর চারজন হাশীশী, যারা নিজেদের যোগ্যতা ও বীরত্বের প্রমাণ দিয়ে সুলতানের দেহরক্ষী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল। কিন্তু তারা সুযোগ পাচ্ছে না। কারণ, দেহরক্ষীদের সংখ্যা সব সময় চব্বিশ অপেক্ষা বেশী থাকে এবং তাদের ডিউটি পরিবর্তন হতে থাকে। এই চারজনের ডিউটি একত্রে পড়েনি কখনো। রক্ষীবাহিনীর কমান্ডার যতটুকু সম্ভব সাবধান থাকেন সব সময়। রক্ষীদের মধ্যে ঘাতক আছে, কমান্ডার তা জানতেন না বটে, কিন্তু তিনি সর্বদা সজাগ থাকতেন, পাছে কেউ

দায়িত্বে অবহেলা না করে। এই সফরে সুলতান আইউবী নিজেই বললেন, রক্ষীদের পুরো বাহিনীকে তিনি সাথে রাখবেন না। চব্বিশজনই যথেষ্ট। অথচ, পথে খৃস্টান কমান্ডোদের আক্রমণের আশংকা আছে প্রবল।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী কায়রো থেকে দ্বি-প্রহরের পর রওনা হন। রাতের অর্ধেকটা কাটে সফরে আর বাকিটা বিশ্রামে। শেষ রাতে আবার সফর শুরু করেন। সূর্য উদয় হয়। রোদের তাপ প্রখর থেকে প্রখরতর হতে থাকে। চলতে থাকে কাফেলা। দ্বি-প্রহরের প্রচন্ড সূর্যতাপ ঘোড়াগুলোকে অস্থির করে তুলতে শুরু করে। কাফেলা থেমে যায়। অবস্থান গ্রহণ করে এমন একস্থানে, যেখানে পানি আছে, গাছ আছে, আছে টিলার ছায়াও। অল্প সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায় সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর তাঁবু। সুলতানের চারপাই ও চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয় তাঁবুতে।

পানাহার শেষে শুয়ে পড়েন সুলতান। তাঁবুর সামনে–পিছনে দাঁড়িয়ে যায় দু'রক্ষী। নিকটেই গাছের ছায়ায় বসে পড়ে অন্যান্য রক্ষীরা। ঘোড়াগুলোকে পানি পান করানোর জন্য নিয়ে যায় কয়েকজন। আলী বিন সুফিয়ান ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ একটি গাছের নীচে গিয়ে শুয়ে পড়েন। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর তাঁবু এখান থেকে দেখা যায় না। মরুভূমির সূর্য জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে আসমান-জমিন। যে যেখানে ছায়া পেল বসে-শুয়ে পড়ল সকলে।

যে দু'রক্ষীর উপর সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর তাঁবু পাহারার দায়িত্ব চাপে, তারা দু'জন হাশীশী। এমন ঘটনা এই প্রথম। দীর্ঘদিন ধরে এমনি একটি সুযোগেরই সন্ধানে ছিল তারা। মিশন বাস্তবায়নে তাদের এখনই সুবর্ণ সুযোগ। রক্ষী বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য চলে গেছে ঘোড়াগুলোকে পানি পান করাতে। পানির কূপের অবস্থান একটি টিলার অপর প্রান্তে। কাফেলার মাল বহনকারী উটের চালকরাও উটগুলোকে পানি পান করানোর জন্য নিয়ে গেছে কূপে। তাদের মধ্যেও দু'জন হাশীশী। চোখের ইশারায় ডিউটিরত হাশীশী রক্ষীদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে যায় তারা।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর তাঁবুর সম্মুখে দন্ডায়মান রক্ষী তাঁবুর পর্দাটা ঈষৎ ফাঁক করে ভিতরে তাকায়। ঈশারা করে বাইরের জনকে। গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। পিঠটা তাঁর তাঁবুর দরজার দিকে ফেরানো। পা টিপে টিপে ভিতরে ঢুকে পড়ে রক্ষী। খঞ্জর-তরবারী কিছুই বের করেনি সে। হাতের রশিটাও রেখে এসেছে তাঁবুর বাইরে। সুঠাম, সুদেহী বলবান এক যুবক। শক্তিতে সুলতান আইউবীর দিগুণ না হলেও দেড়গুণ তো অবশ্যই।

রক্ষী সতর্ক পায়ে পৌঁছে যায় সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট। বিদ্যুদ্বেগে দু'হাতে ঝাপটে ধরে সুলতানের ঘাড়। ঘুম ভেঙ্গে যায় সুলতানের। পার্শ্ব পরিবর্তন করলেন সুলতান। কিন্তু রক্ষীর পাঞ্জা থেকে নিজেকে ছাড়াতে পারলেন না তিনি।

আক্রমণকারী সান্ত্রী সুলতানের পিঠে কনুইচাপা দিয়ে এক হাত সরিয়ে নেয় ঘাড় থেকে। অপর হাতে চেপে ধরে রাখে সুলতানের ধমনী। কটিবন্ধ থেকে পুরিয়ার মত কি যেন একটা বের করে সে। পুরিয়াটা এক হাতেই খুলে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর মুখে ঢুকিয়ে দিতে যায়। সুলতানকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে চাইছে রক্ষী।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী অসহায়। পিঠে তাঁর শক্তিশালী একটি দানবের চাপা দেয়া কনুই। ধমনীটা চেপে ধরে আছে সে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আছে সুলতানের। মুখটা ছিল খোলা। পুরিয়া দেখে মুখটা এখন বন্ধ করে ফেলেছেন তিনি। মৃত্যু তাঁর এসে গেছে মাথার উপর। তবু বুদ্ধি হারাননি সুলতান।

তরবারী-সদৃশ একটি খঞ্জর সর্বদা সঙ্গে থাকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর। এটি তাঁর অলংকার। বাঁধা থাকে কোমরে। সেটি বের করে হাতে নেন তিনি। আক্রমণকারী সুলতানের মুখে বিষ দেয়ার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। তার পাজরে খঞ্জরটি সেঁধিয়ে দেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। এক টানে বের করে আনেন। আঘাত হানেন পুনর্বার। পাজরে বিদ্ধ হয় আবারো। আক্রমণকারী রক্ষী গন্ডারের ন্যায় মোটা চামড়ার মানুষ। এত অল্প সময়ে সরবার নয় সে । সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী একজন সৈনিক। খঞ্জরের আঘাত ও কার্যকারিতা জানা আছে তাঁর। দ্বিতীয় আক্রমণের পর রক্ষীর পাজর থেকে খঞ্জরটি বের করে নেন তিনি। কয়েকটা মোচড় দিয়ে আরো ভিতরে সেঁধিয়ে ঝটকা এক টান দেন নীচের দিকে। আক্রমণকারীর নাড়িভুঁড়ি ও পেটের ভেতরটা বেরিয়ে আসে বাইরে।

শিথিল হয়ে আসে আক্রমণকারীর হাত দু'টো। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ঘাড় ছুটে যায় তার হাত থেকে। অপর হাত থেকে ছুটে পড়ে যায় পুরিয়াটা। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। ধাক্কা দেন আক্রমণকারীকে। চারপাই থেকে নীচে গিয়ে পড়ে লোকটি। উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই তার।

মাত্র আধা মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যায় এ যুদ্ধ। তাঁবুর বাইরে দণ্ডায়মান ছিল অপর রক্ষী। কিছু একটা পতনের শব্দ শুনতে পায় সে। পর্দা তুলে উঁকি দেয় তাঁবুর ভেতর। দৃশ্য দেখে চমকে উঠে। তরবারী উঁচু করেই ভেতরে প্রবেশ করে রক্ষী। আঘাত হানে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর। ঝট করে তাঁবুর মধ্যবর্তী খুঁটির আড়ালে চলে যান তিনি। আঘাতটা পড়ে গিয়ে বাঁশের খুঁটির উপর। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যেমন জন্মগত অসিচালক, তেমনি সুদক্ষ যোদ্ধাও। সাথে সাথে পাল্টা খঞ্জরের আঘাত হানেন আক্রমণকারীর উপর। আক্রমণকারীও সৈনিক। সুলতানের আঘাত প্রতিহত করে সে। সাথে সাথে রক্ষীবাহিনীর কমান্ডারকে আওয়াজ দেন সুলতান। পুনরায় আঘাত হানে আক্রমণকারী। সম্মুখ থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। চলে যান আক্রমণকারীর এক পার্শ্বে। পাল্টা আঘাত করেন সুলতান। সুলতানের এই খঞ্জরাঘাত ঠেকাতে ব্যর্থ হয় রক্ষী।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ডাকে তাঁবুতে প্রবেশ করে দু'রক্ষী। কিন্তু তারাও হামলা করে সুলতানের উপর। এতক্ষণে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী আহত করে ফেলেন দ্বিতীয় রক্ষীকে। তবুও লড়ে যাচ্ছে সে। এখন সাথে এসে যোগ দেয় তার অপর দু'সঙ্গী। হুঁশ-জ্ঞান-সাহস ঠিক রেখে মোকাবেলা করে যান সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। আল্লাহর রহমত, এমনি সময়ে বাহিনীর কমান্ডার এসে প্রবেশ করেন তাঁবুর ভেতর। অন্যান্য রক্ষীদেরও ডাক দেন তিনি। সুলতান আইউবীর নির্দেশে নিজে ঝাঁপিয়ে পড়েন আক্রমণকারীদের উপর। ছুটে আসে চার-পাঁচজন রক্ষী। চেঁচামেচি শুনে দৌড়ে আসেন আলী বিন সুফিয়ান ও তাঁর সঙ্গীরা। ঘটনা দেখে থ খেয়ে যান তারা। রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে আছে চারজন রক্ষী। মরে গেছে দু'জন। একজনের মরি মরি অবস্থা, হুঁশ নেই তার। পেটটা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ফাঁড়া। বুকে গভীর দু'টি জখম। চতুর্থজনের পেটে একটি জখম, অপর জখমটি উরুতে। মাটিতে বসে হাতজোড় করে চীৎকার করছে সে– 'আমাকে বাঁচতে দাও, বোনটির জন্য আমাকে বাঁচাও!'

নিজ রক্ষীদের নিরস্ত্র করেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। অবস্থা দেখে তারা এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল যে, তৃতীয় লোকটিকে অচেতন অবস্থায় নিঃশ্বাস ফেলতে দেখেই ধমনী কেটে দেয় তার। চতুর্থজনকে তাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখেন সুলতান। এটি একদিকে যেমন তাঁর মমতার বহিঃপ্রকাশ, অপরদিকে ষড়যন্ত্রের মূল সূত্র উদঘাটনের জন্য একজনের বেঁচে থাকা আবশ্যকও বটে।

কাফেলার সাথেই ছিল সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ডাক্তার। সুলতান যেখানে যান, এই ডাক্তার সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকেন। সুলতান তাকে বললেন, 'যে কোন মূল্যে এ লোকটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।' সুলতানের গায়ে এতটুকু আঁচড়ও লাগেনি। তিনি হাঁপাচ্ছেন। তবে মানসিক দিক থেকে তিনি সম্পূর্ণ শান্ত। আবেগ-উৎকণ্ঠা, রাগ-ক্ষোভ কিছুই নেই তার মনে। মুখে মুচকি হাসি টেনে তিনি বললেন, 'আমি বিস্মিত নই। এমনটি হওয়ারই কথা।'

তবে আলী বিন সুফিয়ানের মনে বেশ অস্থিরতা পরিলক্ষিত হল। তাঁর দায়িত্ব ছিল, সুলতানের দেহরক্ষী হিসেবে যাকে নির্বাচন করবেন, যাচাই-বাছাই করে দেখবেন লোকটা নির্ভরযোগ্য কিনা। এখন তাকে দেখতে হবে বাহিনীর অবশিষ্ট সিপাহীদের মধ্যে এদের কোন সদস্য রয়ে গেছে কিনা।

প্রথম আক্রমণকারী রক্ষী যে পুরিয়াটা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর মুখে দিতে চেয়েছিল, সেটা পড়ে আছে সুলতানের বিছানায়। এক প্রকার পাউডার। রং সাদা। তার খানিকটা ছিটিয়ে পড়েছে বিছানায়। ডাক্তার পাউডারগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন। বললেন, 'এগুলো বিষ- এমন বিষ যে, এর তিল পরিমাণও যদি কারো

কণ্ঠনালী অতিক্রম করে, তাহলে অল্প সময়ের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটে।' এগুলো সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল শুনে তিনি আঁতকে উঠেন। ডাক্তারের নির্দেশে বিছানাটি উঠিয়ে বাইরে নিয়ে পরিস্কার করে আনা হয়।

জখমীকে তুলে নিজের বিছানায় শুইয়ে দেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তরবারীর একটি আঘাত লেগেছে তার পেটে। অপরটি উরুতে। পেটের আঘাত আশংকাজনক নয়। তেরছা করে কাটা। উরুর জখম লম্বা ও গভীর। হাতজোড় করে সুলতানের নিকট জীবন ভিক্ষা চাইছে সে। সুলতানের বিরুদ্ধে তার ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। দৃষ্টিভঙ্গির কোন বিরোধও নয়। সে ভাড়াটিয়া ঘাতক। ধরা পড়ার পর এখন নিজের অবিবাহিতা বোনটির জন্যই তার যত অস্থিরতা। বারবার নিজেন নাম উচ্চারণ করে মিনতির সুরে বলছে– আমি মুসলমান। আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন মহামান্য সুলতান! আমার নিরপরাধ বোনের খাতিরে আমায় মাফ করে দিন।

'মানুষের জীবন-মৃত্যু দুই-ই আল্লাহর হাতে।' শান্ত সমাহিত অথচ ভাব-গম্ভীর কণ্ঠে বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। সুলতান বললেন, 'নিজ চোখেই তো দেখলে, কে মারেন আর কে জীবিত রাখেন। তবে দোস্ত! এ মুহূর্তে তোমার জীবনটা যার হাতে, তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ। নিজের অপরাধের প্রতি দৃষ্টি দাও। নিজের অসহায়ত্বের কথা একটু ভাব। আমি তোমাকে তোমার সতীর্থদের মরদেহের সাথে জীবন্ত মরুভূমিতে ফেলে আসব। মরুর শিয়াল আর নেকড়েরা তোমাকে জীবন্ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভক্ষণ করবে। তোমার হুঁশ-জ্ঞান ঠিকই থাকবে, তুমি সব টের পাবে। কিন্তু পালাতে পারবে না। তুমি ধুঁকে ধুঁকে জীবন বিসর্জন দেবে আর নিজের পাপের শাস্তি ভোগ করবে।'

অকস্মাৎ শিউরে উঠে জখমী। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর দু'হাত ঝাপটে ধরে। উপুড় হয়ে পড়ে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ? আমার সঙ্গে তোমার শত্রুতা কিসের?'

'আমি হাশীশীদের লোক। আমরা চারজন হাশীশী ছিলাম। কেউ দু'বছর, কেউ তিন বছর আগে আপনার ফৌজে ভর্তি হয়েছি। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমাদেরকে আপনার দেহরক্ষী ডিভিশনে ঢোকানো হয়েছে।' জবাব দেয় জখমী। অকপটে সব তথ্য ফাঁস করে দিতে শুরু করে সে। বলে– 'আপনার রক্ষী বাহিনীতে আমরা এই চারজন ছিলাম ঘাতক।' বক্তব্যের ফাঁকে সুলতান ডাক্তারকে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ডাক্তার তাকে ঔষধ খাইয়ে দেন। রক্তক্ষরণ বন্ধ করার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। জখমীকে তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন– ভয় নেই, ঠিক হয়ে যাবে।

জখমী তার মনের সব গোপন কথা বলে যায় অনর্গল। ক্ষমতাচ্যুত ফাতেমী খেলাফত এবং হাশীশীদের মুখোশ উন্মোচন করে দেয় সে। ফাতেমীরা খৃষ্টানদের

থেকে কি কি সাহায্য গ্রহণ করেছে এবং করে যাচ্ছে, তার বিবরণ প্রদান করে।

দীর্ঘ সময় ব্যয় করে ডাক্তার তার জখমে পট্টি বাঁধার কাজ সম্পন্ন করেন। তবে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর মমতা-ই হল অসহায় জখমীর আসল চিকিৎসা।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী লাশগুলো বাইরে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেন। আলী বিন সুফিয়ান জখমী সম্পর্কে বলেন, 'একে নিয়ে তুমি কায়রো চলে যাও এবং এর স্বীকারোক্তি মোতাবেক অভিযান চালাও।'

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছিল জখমী। তন্মধ্যে কিছু ছিল এতই ভয়ংকর যে, সেগুলোর অনুসন্ধান কেবল আলী বিন সুফিয়ানের পক্ষেই সম্ভব। জখমীকে উটের পিঠে শুইয়ে নিয়ে কায়রো অভিমুখে রওনা হন আলী বিন সুফিয়ান।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল বেশ ক'বার। তার সব ক'টি ঘটনার উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। মাত্র দু'টি হামলার উল্লেখ পাওয়া যায়। যার একটি হল এই। অপরটির বিবরণ নিম্নরূপ–

একবার এক ফেদায়ী ঘাতক সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর এমনিভাবে শায়িত অবস্থায় খঞ্জর দ্বারা আক্রমণ করেছিল। খঞ্জর তাঁর শিরস্ত্রাণে আঘাত হানে এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সজাগ হয়ে যান। এই ঘাতক সুলতানের হাতেই মারা যায় এবং সুলতানের দেহরক্ষীদের মধ্যে তার বাহিনীর এমন ক'জন সদস্য ধরা পড়ে, যারা ছিল ফেদায়ীদের ভাড়া করা ঘাতক।

❁ ❁ ❁

মিসরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে–যা সুদানের সীমান্তের সাথে সংযুক্ত–শত শত বছরের পুরনো কিছু প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। তৎকালে মিসরের সীমান্ত ছিল ভিন্ন রকম। সুলতান সালাহুদ্দীন বলতেন যে, মিসরের কোন সীমান্ত নেই। সুদানীরা একটি কাল্পনিক সীমান্ত স্থির করে রেখেছিল মাত্র।

প্রাসাদগুলোর আশপাশের এলাকা অতি দুর্গম। মনে হচ্ছে ফেরাউনদের যুগে এসব এলাকা ছিল সবুজ-শ্যামল। ছিল পানির ঝরণা, ঝিল, সুগভীর দু'টি নদী, বালুকারময় মরুপ্রান্তর ও বালিমাটির টিলা। কোন টিলা সুবিশাল প্রাসাদের স্তম্ভের ন্যায় চলে গেছে উপরে–অনেক দূরে। কোনটি দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালের ন্যায়। যেখানেই সমতল ভূমি, সেখানেই বালি। লক্ষণে মনে হয়, এলাকার স্থানে স্থানে পানি ছিল। ছিল গাছপালা-তরুলতা। অধিবাসীরা চাষাবাদ করত, ফসল উৎপাদন করত। অন্তত চল্লিশ মাইল দীর্ঘ এবং দশ-বারো মাইল প্রস্থের এই অঞ্চলে এক সময় মানুষের বসবাস ছিল। অধিবাসীরা অধিকাংশই ছিল মুসলমান। তবে অদ্ভুত ধরনের বিশ্বাস লালন করত তারা।

ফেরআউনী আমলের এই প্রাসাদ-ধ্বংসাবশেষগুলোকে মানুষ প্রচণ্ড ভয় করে। আশপাশের এলাকাগুলোও এমন যে, দেখামাত্র মানুষের গা শিউরে উঠে। ভুলেও এখানে পা রাখে না কেউ। মানুষের বিশ্বাস, এ অঞ্চলে ফেরাউনদের বদরূহগুলো বসবাস করে। দিনের বেলা এরা পশুর রূপ ধারণ করে ঘোরাফেরা করে। কখনো এদেরকে উটের উপর সওয়ার সিপাহীর বেশে দেখা যায়। আবার কখনো রূপসী নারীর আকৃতিতে দৃষ্টিগোচর হয়। রাতের বেলা সেখান থেকে ভয়ংকর ধরনের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

বছর কয়েক হল, এ ধ্বংসাবশেষগুলো মানুষের কৌতূহলের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। তার আগে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যখন অত্র অঞ্চলে নতুন সেনাভর্তির অভিযান শুরু করেছিলেন, তখন থেকে তাঁর সৈন্যরা এ এলাকার আশপাশ দিয়ে ঘোরাফেরা করতে শুরু করে। এলাকার অধিবাসীরা তাদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল, যেন তারা টিলার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে। স্থানীয় লোকেরা তাদেরকে রহস্যময় শব্দ, ভয়ংকর বস্তু ও বদরূহদের নানা কাহিনী শোনায়।

এ এলাকা থেকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী অনেক নতুন সৈন্য পেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের চিন্তা-চেতনা পাল্টে যায়। সীমান্ত প্রহরীরা রিপোর্ট দিয়েছিল যে, তাদের টহলদার সান্ত্রীরা পর্যন্ত কখনো অত্র এলাকায় প্রবেশ করত না এবং কখনো কাউকে সেদিকে যেতে দেখেনি। কিন্তু এখন অনেকেই ভেতরে যাওয়া- আসা করছে এবং যারা যাচ্ছে, ফিরে আসার পর তাদের চেহারায় কোন ভীতির ছাপ পরিলক্ষিত হয় না। এখন শোনা যাচ্ছে, প্রতি বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত ধ্বংসাবশেষের অভ্যন্তরে মেলা বসে। তারপর একটি ঘটনা এই ঘটে যে, সীমান্তরক্ষীদের চার-পাঁচজন সিপাহী হঠাৎ একদিন লাপাত্তা হয়ে যায়। তাদের ব্যাপারে রিপোর্ট দেয়া হল যে, তারা পালিয়ে গেছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী একদিকে যেমন শত্রুর দেশে নিজের গুপ্তচর ঢুকিয়ে রেখেছিলেন, তেমনি নিজের দেশেও গুপ্তচরদের জাল বিছিয়ে রেখেছিলেন। অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ বিশেষভাবে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রশংসা করেছেন যে, তিনি গুপ্তচরবৃত্তি ও কমান্ডো স্টাইলের যুদ্ধকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রশিক্ষণের নতুন পন্থা উদ্ভাবন করেছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন যে, মাত্র দশজন সৈন্য দ্বারা এক হাজার সৈন্যের কাজ করা সম্ভব। তবে এটা সত্য কথা যে, মুসলমান হওয়ার কারণে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর এই বিদ্যাকে ইতিহাসের পাতায় যতটুকু স্থান দেয়া উচিত ছিল, ততটুকু দেয়নি। অবশ্য তৎকালের ঐতিহাসিকগণের রচনা থেকে জানা যায় যে, ইসলামের এই মহান প্রহরী ইন্টেলিজেন্স

এবং গেরিলা ও কমান্ডো অপারেশনে কী পরিমাণ অভিজ্ঞ ছিলেন। দেশের অভ্যন্তরে তার গোয়েন্দা বাহিনী পরতে পরতে দৃষ্টি রাখত এবং সেনা হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট সরবরাহ করত। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল, মিসরের দূর-দূরান্তের এমন সব এলাকার তৎপরতার সংবাদও কেন্দ্রে পৌঁছে যেত, যেসব এলাকা সম্পর্কে বলা হতো যে, স্বয়ং খোদাও এ এলাকার কথা ভুলে গেছেন। অবশ্য সংবাদদাতারা সেসব এলাকার জনসাধারণের শুধু বাহ্যিক পরিবর্তনই প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়েছে এবং তার রিপোর্ট কেন্দ্রে পৌঁছিয়েছে। অভ্যন্তরে কী সব ঘটনা ঘটেছিল, তার সন্ধান তারা লাভ করতে সক্ষম হয়নি। এতটুকু তথ্য লাভ করার পর এক পর্যায়ে নিহত কিংবা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল দু'জন গুপ্তচর।

এবার সেখানকার জনসাধারণ শুধু টিলার ভয়ংকর এলাকার ভেতরে প্রবেশ করাই শুরু করেনি বরং ফেরাউনদের পুরোনো এমন সব প্রাসাদের অভ্যন্তরেও ঢুকতে আরম্ভ করে দিয়েছে, এক সময়ে যেখানে যাওয়ার কথা কল্পনা করলেও তাদের গা শিউরে উঠত।

সম্প্রতি এই গমনাগমনের ধারা এভাবে শুরু হয় যে, এক গ্রামে একজন উষ্ট্রারোহীর আগমন ঘটে। নবাগত সেই লোকটি মিসরীয় মুসলমান। উটটি তার উন্নত জাতের এবং সুস্থ-সবল। এলাকাবাসীদের সমবেত করে লোকটি একটি কাহিনী শোনায়—

আমি একজন গরীব মানুষ। দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে কোন উপায় না দেখে এক পর্যায়ে ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি। আমার কোন বাহন ছিল না। লাগাতার কয়েকদিন পায়ে হেঁটে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে-ফিরেও ডাকাতি করার জন্য কোন শিকার পাইনি। অবশেষে ঐ পার্বত্য এলাকায়—যেখানে কেউ যাওয়া-আসা করে না—প্রবেশ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ি। কয়েকদিন পর্যন্ত পেটে খাবার পড়েনি। আমি শক্তিহীন হয়ে পড়ি। উপায়ন্তর না দেখে আমি আকাশ পানে হাত তুলে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করি। তৎক্ষণাৎ আমি গুঞ্জনের ন্যায় একটি শব্দ শুনতে পাই। কে যেন বলছে, 'তোমার ভাগ্য ভালো যে তুমি এখনো পাপ করনি; পাপের সংকল্প করেছ মাত্র। তুমি যদি কাউকে লুট করে এখানে আসতে, তাহলে এতক্ষণে তোমার গায়ের গোশতগুলো খসে পড়ত এবং তোমার দেহটা কংকালে পরিণত হয়ে যেত। শয়তানের লেলিয়ে দেয়া হিংস্র প্রাণীরা তোমার খসে পড়া গোশত ভক্ষণ করত।'

আওয়াজ শুনে আমি চৈতন্য হারিয়ে ফেলি। অনুভব করলাম, কে যেন আমাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। চোখ খুলে দেখলাম, আমি এক স্থানে বসে আছি। আমার সম্মুখে শুভ্র শশ্রুমন্ডিত এক বুজুর্গ। দুধের মত সাদা তার গায়ের রং। নুরানী চেহারা। আমি বুঝে ফেললাম, ঐ যে আওয়াজ শুনলাম, তা এই বুজুর্গেরই কণ্ঠস্বর। আমার বাকশক্তি

হারিয়ে যায়। আমি কাঁপতে শুরু করি। বুজুর্গ লোকটি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ভয় পেও না। ঐ যে মানুষগুলো– যারা এখানে আসতে ভয় করে–ওরা কপালপোড়া। শয়তানই ওদেরকে এখানে আসতে দেয় না। তুমি যাও, ওদেরকে বল, এখন আর এখানে ফেরাউনদের প্রভূত্ব চলে না। এটি হযরত মূসা (আঃ) এর সাম্রাজ্য। শেষ জমানায় হযরত ঈসাও (আঃ) আকাশ থেকে এখানে অবতরণ করবেন। তখন ইসলামের আলোতে এসব অনাবাদী এলাকা আলোকিত হবে, যে আলোতে উদ্ভাসিত হবে সমগ্র পৃথিবী। তুমি যাও, লোকদেরকে আমার পয়গাম শুনিয়ে দাও, তাদেরকে এখানে নিয়ে আস।

আগন্তুক বলল, আমি উঠে দাঁড়াতে পারছিলাম না। অনাহারে শরীর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। বুজুর্গ বললেন, 'তুমি উঠে দাঁড়াও। পঞ্চাশ কদম উত্তর দিকে যাও। খবরদার পিছনে ফিরে তাকাবে না। ভয় পাবে না। মানুষের কাছে আমার পয়গাম অবশ্যই পৌঁছিয়ে দিবে। অন্যথায় তোমার বিরাট ক্ষতি হবে বলে দিচ্ছি। পঞ্চাশ কদম অতিক্রম করার পর একটি উট বসে আছে দেখবে। তার সঙ্গে খাবার আছে, পানি আছে। সঙ্গে তার যা কিছু পাবে, সবই তোমার।'

আগন্তুক গ্রামবাসীদের জানায়-

এবার আমি উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হই। দেহে শক্তি ফিরে আসে। আমি ভয় পাচ্ছিলাম, এটি কোন ফেরাউনের বদরূহ কিনা। আমি পেছনের দিকে তাকালাম না। ঠিক পঞ্চাশ কদম সম্মুখে আসার পর একটি উট দেখতে পেলাম। সঙ্গে তার খাদ্য-পানীয় বাঁধা। আমি সেই খাবারগুলো খেলাম ও পানি পান করলাম। এবার আমার শরীরের এত শক্তি জাগে যে, এর আগে কখনো আমি এমন শক্তি পাইনি।

আগন্তুক জনসাধারণকে একটি থলে খুলে দেখায়, যাতে কতগুলো সোনার আশরাফী। এ থলেটি উটের সঙ্গে বাঁধা ছিল। লোকটি সেই উটের পিঠে চড়ে গ্রামে এসে উপস্থিত হয়।

আগন্তুক গ্রামবাসীদের শুভ্র শশ্রুমন্ডিত বুজুর্গের পয়গাম শুনিয়ে উট হাঁকিয়ে ফিরে যায়।

আগন্তুকের কাহিনী শুনে গ্রামবাসীদের মনে ভয়ংকর সেই পার্বত্য এলাকায় প্রবেশ করার তীব্র আকাংখা জাগ্রত হয়। কিন্তু এলাকার প্রবীণ লোকেরা বলে যে, এই অপরিচিত আগন্তুক মানুষ নয় বরং এ প্রেত-পুরীরই ভয়ানক কোন বাসিন্দা।

মানবস্বভাবের একটি দুর্বলতা এই যে, মানুষ গুপ্ত বিষয়কে জানার এবং গোপন রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করে, তাতে যত নিষেধাজ্ঞাই থাকুক না কেন। যেসব দেহে যৌবনের খুন প্রবাহমান, তারা বড় বড় ঝুঁকিও বরণ করে নিতে কুণ্ঠিত হয় না। গ্রামের

যুবকরা সংকল্পবদ্ধ হয় যে, তারা ওখানে যাবেই। স্বর্ণমুদ্রার আকর্ষণ বড় কঠিন, যা থেকে মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারে না।

চল্লিশ মাইল দীর্ঘ দশ মাইল প্রস্থ এই ভূখণ্ডে যতগুলো গ্রাম আছে, সব ক'টি গ্রামের অধিবাসীরা শুনতে পেয়েছে, অজ্ঞাত পরিচয় এক আগন্তুক এমন এমন কাহিনী শুনিয়ে গেছে। শুনে কেউ বিশ্বাস করল, কেউ করল না। আবার কেউ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝে দোল খেতে লাগল। কিন্তু সেদিকে যেতে ভয় পাচ্ছে সবাই। সাহস করে যারা গেল, তারাও রহস্যময় সেই পার্বত্য অঞ্চলকে দূরে থেকে দেখেই ফিরে এল। কিছুদিন পর আরো দু'জন উষ্ট্রারোহী যুবক এসে সমগ্র এলাকা ঘুরে যায়। তারাও এলাকবাসীকে একই রকম কাহিনী শুনিয়ে যায়। এক বুজুর্গ ব্যক্তি তাদেরও বলে দেন যে, তোমরা পাড়ায় গিয়ে সবাইকে আমার পয়গাম পৌঁছিয়ে দাও, যেন তারা ফেরাউনী আমলের ধ্বংসাবশেষগুলোকে ভয় না করে।

তারপর এলাকাবাসীদের মধ্যে এ জাতীয় কাহিনী একের পর এক ছড়াতে থাকে। ধীরে ধীরে মানুষের মন থেকে ভীতি ও শংকা কেটে যেতে শুরু করে। এক পর্যায়ে এলাকাবাসী কৌতূহলী হয়ে উঠে এবং পর্বতসমূহের আশপাশে ঘোরাফেরা করতে আরম্ভ করে দেয়। অনেককে তারা ভেতরে যাওয়া-আসা করতে দেখতে পায়। তারা জানায় যে, ভেতরে একজন বুজুর্গ লোক আছেন, তিনি গায়েবের অবস্থা ও আকাশের খবর বলে দিতে পারেন। এমনও বলাবলি শুরু হয় যে, তিনিই ইমাম মাহদী। কেউ বলে, তিনি হযরত মূসা (আঃ)। আবার কারো মতে ঈসা (আঃ)। তবে সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, লোকটি আল্লাহ-প্রেরিত একজন মহামানব অবশ্যই। তিনি পাপিষ্ঠদের সাক্ষাৎ দেন না। তার নিকট যেতে হলে নিয়ত পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়। এমনও বলা হচ্ছে যে, তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারেন।

এসব তেলেসমাতি ও রহস্যময় কাহিনী শোনার পর এবার মানুষ ভেতরে যাওয়া-আসা শুরু করে। প্রথমবারের মত তারা নিকট থেকে ফেরাউনী প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করে, যেগুলোকে এতদিন তারা ভয় করত। তারা প্রাসাদের ভেতরে প্রবেশ করে। অসংখ্য কক্ষ, আঁকাবাঁকা সরু পথ। একটি কক্ষ বিশাল-বিস্তৃত। ছাদটা অনেক উঁচু। আশপাশের পরিবেশ ভয়ানক। কিন্তু খোশবুতে মৌ মৌ করছে এলাকাটা। কক্ষের ভেতর থেকে কয়েকটি সিঁড়ি চলে গেছে নীচের দিকে।

এ প্রাসাদ সেই ফেরাউনদের, যারা নিজেদেরকে খোদা বলে দাবী করত। ঘনিষ্ঠজন ব্যতীত তাদেরকে কেউ চোখে দেখত না। তারা জনসধারণকে এই প্রাসাদে সমবেত করত এবং নিজেদের শুধু কণ্ঠস্বর শোনাত– দেখা দিত না কখনো। তাদের কণ্ঠস্বর কতগুলো সুরঙ্গ পথে ভেসে এসে এই প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে ছড়িয়ে পড়ত। বক্তা অবস্থান করত সুরঙ্গের অপর প্রান্তে, যা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারতো না। এই

অদৃশ্য কণ্ঠস্বরকে তারা খোদার আওয়াজ মনে করত। প্রাসাদের বড় বড় কক্ষগুলোতে আলোর জন্য এমন ব্যবস্থা থাকত যে, দীপ-বাতি দেখা যেত না, কিন্তু কক্ষগুলো থাকত আলোকোজ্জ্বল। স্বচ্ছ কাচের মত চকমকে এক প্রকার ধাতুর তৈরী চাঁদর ব্যবহার করা হত। তার ভেতরে লুকায়িত থাকত ছোট ছোট বাতি। সেই বাতির আলো প্রতিবিম্বিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ত কক্ষময়; কিন্তু সাধারণ মানুষ বিষয়টি বুঝত না।

এসব তো হল শত শত বছর আগের কথা। এখন সালাহুদ্দীন আইউবীর আমলেও এই প্রাসাদে পুনরায় সেই আওয়াজ গুঞ্জরিত হতে শুরু করে, যাকে এককালে মানুষ খোদার কণ্ঠস্বর বলে বিশ্বাস করত। স্বল্প সময়ের মধ্যে মানুষের হৃদয় থেকে এই পরিত্যক্ত প্রাসাদের ভয়-ভীতি দূরীভূত হয়ে যায়। প্রশস্ত অন্ধকার সুরঙ্গ পথ অতিক্রম করে তারা প্রাসাদের বড় কক্ষে পৌঁছে যায়। আলোয় ঝলমল করছে গোটা কক্ষ। কিন্তু কোন বাতি নেই। একটি কণ্ঠস্বর ভেসে বেড়াচ্ছে কক্ষময়। কে যেন বলছে–

'আমি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে আলোর পথে এনেছি। এটি তূর পাহাড়ের আলো। এই আলোকে তোমরা হৃদয়ে স্থান করে দাও। ফেরাউনের প্রেতাত্মারা মরে গেছে। এখন এখানে বিরাজ করছে মূসার নূর। ঈসা এসে এ নূরকে আরো আলোকময় করবেন। তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর, কালেমা পাঠ কর।'

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে জনতা। বিস্ফারিত নয়নে একজন তাকায় অপরজনের দিকে। ইল্লাল্লাহর জিকিরে মুখরিত করে তোলে গোটা কক্ষ।

এই বক্তব্যে যদি নবী হযরত মূসা, হযরত ঈসা (আঃ) ও কালেমা তায়্যেবার উল্লেখ না থাকত, তাহলে সাধারণ মানুষ এতে প্রভাবিত হত না। তারা ছিল মুসলমান। ইসলামের নাম ব্যবহার করার কারণেই এই অদৃশ্য বাণী তাদের হৃদয়ে রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছিল। পরক্ষণে পুনরায় শব্দ ভেসে আসল-

'আল্লাহ তার রাসূলকে রেসালাত দান করেছিলেন হেরা গুহার অন্ধকারে, তোমরা এই গুহার অন্ধকারে আল্লাহর নূর দেখতে পাবে।'

জনতার মস্তক অবনমিত হয়ে আসে এবং এই বাণীও তাদের হৃদয়ে গেঁথে যায়। কিন্তু যে মহান সত্তার কণ্ঠস্বর, যিনি অসহায় পথিকদের উট-ঘোড়া, খাবার-পানি ও স্বর্ণমুদ্রা দান করেন, মৃতকে জীবন দান করেন, তাকে এক নজর দেখার জন্য মানুষ উদগ্রীব হয়ে উঠে। তাদের উৎকণ্ঠা দিন দিন বাড়তেই থাকে। যখনই তারা ঘরে ফিরত, তাদের স্ত্রীরা জানাত আজ অপরিচিত একজন লোক এসেছিল। লোকটা প্রাসাদের দরবেশের কারামত শুনিয়ে গেল এবং বলল, সে নাকি দরবেশের সাথে সাক্ষৎ করে এসেছে।

একদিন জনসাধারণ এলাকার সবচেয়ে বড় গ্রামটির মসজিদের ইমামের নিকট এসব ঘটনার তাৎপর্য জানতে চায় যে, হুজুর! বিষয়টা আসলে কী? জবাবে ইমাম

বললেন, 'তিনি একজন মহান ব্যক্তি। নেক লোকদের ছাড়া কাউকে সাক্ষাৎ দেন না, কারো নিকট ধরা দেন না। আর নেক মানুষ তারা, যারা খুন-খারাবী করে না। আপোস ও শান্তির জীবনযাপন করে। কাউকে মারেও না, নিজেও মরতে যায় না। তোমরা যে দরবেশের কথা জানতে চাইছ, তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-এর পয়গাম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। তার পয়গামে যুদ্ধ নেই, আছে প্রেম আর ভালোবাসা। তার আনীত পয়গামের একটি উপদেশ হল, কাউকে জখমী কর না বরং জখমীর ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে দাও। তোমরা যদি তার নীতির অনুসরণ করে চল, তাহলে তিনি তোমাদের অবস্থার পরিবর্তন করে দেবেন। তোমরা সুখময় জীবন লাভ করবে।'

একজন সম্মানিত ইমাম যখন দরবেশ ও তার বক্তব্য সঠিক বলে রায় দিলেন, তখন আর জনমনে সন্দেহের অবকাশ রইল না। এবার তারা ঠাটপাট প্রাসাদে যাওয়া-আসা করতে শুরু করল।

কিছুদিন পর ঘোষণা হল, প্রতি বৃহস্পতিবার সারাদিন প্রাসাদের দ্বার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং সন্ধ্যায় মেলা বসবে। সেইদিন থেকে প্রাসাদের যাওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার দিনটি নির্ধারিত হয়ে গেল এবং সেই সাথে মহিলারা যাওয়ার অনুমতি পেয়ে গেল। এখন নিজের ইচ্ছায় আর কেউ প্রাসাদে যেতে পারছে না। বৃহস্পতিবার এলেই এলাকা সরগরম হয়ে উঠে। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ উট, ঘোড়া ও খচ্চরে চড়ে এবং পায়ে হেঁটে প্রাসাদ অভিমুখে ছুটতে শুরু করে। ভেতরের স্পর্শকাতর জগতে বিপ্লব এসে যায়। তথায় মানুষের দৃষ্টিতে এখন পাপ-পুণ্য ও আলো-আঁধারের ধারণা এমনভাবে উপস্থাপিত হতে শুরু করে যে, মানুষের কাছে তাকে একটি শরীরী বস্তু হিসেবে দেখতে পাচ্ছে এবং বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ছে। কারো মনে উল্টো-সিধে কোন প্রশ্ন নেই, নেই কোন সংশয়-সন্দেহ।

পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যাওয়া মাত্র সেই অন্ধকার সুরঙ্গপথের মুখ খুলে যায়। সুরঙ্গের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকে কয়েকজন লোক। তাদের পার্শ্বে থাকে স্তূপিকৃত খেজুরছড়া। এগুলো জনসাধারণের দেয়া নজরানা। খেজুরের স্তূপের পার্শ্বেই থাকে মশকভর্তি পানি আর গ্লাস। সন্ধ্যায় যখন দর্শনার্থীরা ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি লাভ করে, তখন আগে তাদের প্রত্যেককে তিনটি করে খেজুর আর এক গ্লাস পানি খাইয়ে দেয়া হয়। তারপর তারা একজন একজন করে ভেতরে প্রবেশ করতে শুরু করে। আঁকাবাঁকা অন্ধকার সুরঙ্গপথ অতিক্রম করে আলো-ঝলমল বিশাল হলরুমে প্রবেশ করেই তারা শুনতে পায় একটি বাণী—

'তোমরা কালেমা তায়্যেবা পাঠ কর। আল্লাহকে স্মরণ কর। হযরত মূসা (আঃ) আগমন করেছেন। ঈসাও (আঃ) এসে পড়বেন। অন্তর থেকে পাপ-প্রবণতা ও শত্রুতা

ঝেড়ে ফেল। লড়াই-ঝগড়া ত্যাগ কর। আর জান্নাতের প্রলোভন দেখিয়ে যাদেরকে যুদ্ধে নামান হয়েছিল, তাদের পরিণতি দেখ।'

এ ঘোষণা শেষ হওয়া মাত্র উপস্থিত লোকদের চোখে অতি প্রখর একটি আলো এসে পতিত হয়। তাদের সকলকে একদিকে মুখ করিয়ে দাঁড় করানো হয়। ধীরে ধীরে চোখের আলো তাদের ক্ষীণ হয়ে আসে। তারপর আলো কখনো প্রখর কখনো ক্ষীণ হতে থাকে এবং লোকদের সম্মুখের দেয়ালে তারকার চমক পরিলক্ষিত হতে শুরু করে। তারকাগুলো কাঁপতে থাকে এবং অতি ভয়ংকর আকৃতির কিছু মানুষের গমনাগমন চোখে পড়তে আরম্ভ করে। আবার ভেসে আসে একটি কণ্ঠস্বর–

'এরা তোমাদেরই ন্যায় যুবক ও সুশ্রী ছিল। কিন্তু এরা খোদার পয়গাম মান্য করেনি। এরা কোমরে তরবারী ঝুলিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে এদেরই ন্যায় সুদর্শন যুবকদের হত্যা করেছিল। এদের বলা হয়েছিল, তোমরা লড়াই কর। যুদ্ধ করতে করতে যদি মারা যাও, তাহলে শহীদ হবে এবং জান্নাতে চলে যাবে। এখন তোমরা এদের পরিণতি দেখ। খোদা এদের আকৃতিকে শয়তানের আকৃতিতে রূপান্তরিত করে পথে ছেড়ে দিয়েছেন।'

এই কণ্ঠস্বরের সাথে শোনা যেত মেঘের গর্জন আর দেখা যেত বিজলির চমক। এমন কিছু আওয়াজও ভেসে আসত, যা হিংস্র কোন প্রাণীর শব্দ বলে মনে হতো। আলো এত প্রখর হয়ে উঠত যে, মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে যেত। তারপর লম্বা লম্বা দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র প্রাণীরা ডানে-বাঁয়ে ছুটাছুটি শুরু করে দিত। এরাও মূলত মানুষ। কিন্তু এদের আকৃতি ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয়ংকর। তারা বাহুর উপর দু'টি করে উলঙ্গ মেয়ে তুলে রেখেছে। মেয়েগুলো অত্যন্ত সুন্দরী ও যুবতী। ছটফট করছে তারা। মেঘের গর্জন ধীরে ধীরে আরো প্রচণ্ড হয়ে উঠে। আবার ভেসে আসে কণ্ঠস্বর- 'নিজের রূপ-লাবণ্যে এদের বড় গৌরব ছিল। কিন্তু খোদার রূপকে এরা কলংকিত করেছিল।'

তারপর জনতার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে কিছু সুদর্শন পুরুষ ও নারী। হাসিমুখে উৎফুল্লচিত্তে তারা অতিক্রম করে। ঘোষণা হয়- 'এরা নেক ও পবিত্র মানুষ। এরা কখনো যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। যুদ্ধ-বিগ্রহকে কখনো সমর্থনও করেনি। এরা আপাদমস্তক প্রেম ও শান্তির প্রতিমূর্তি।'

তারপর দর্শনার্থীদের নিয়ে যাওয়া হতো একটি পাতাল কক্ষে। সেখানে একদিকে পড়ে আছে অসংখ্য মানব কংকাল, অপরদিকে হেসে-খেলে ফূর্তি করে ছুটাছুটি করছে বেশকিছু রূপসী তরুণী। খানিক পরপর ভেসে আসছে একটি কণ্ঠস্বর– 'হযরত ঈসা (আঃ) এর আবির্ভাবের সময় ঘনিয়ে এসেছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও খুন-খারাবী মন থেকে ঝেড়ে ফেল। অন্যথায় তোমাদের পরিণতি হবে ভয়াবহ।'

পাতাল কক্ষের একটি দরজা দিয়ে লোকদের বাইরে বের করে দেয়া হয়। বের

হওয়ার পর তাদের কাছে মনে হয় যেন তারা ঘুমিয়ে ছিল। ঘুমের মধ্যে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে। যেমন ভয়ংকর তেমন প্রীতিকর স্বপ্ন। তারা পুনরায় ভেতরে প্রবেশ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে। কিন্তু আপাতত আর তাদের প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। তারা ঘরে ফিরে যেতে চায় না। প্রাসাদের আশপাশে বসে বসেই রাত কাটিয়ে দেয়। ওখানকার লোকেরা তাদের ভেতরের রহস্যের বিবরণ দেয়। একটি রহস্য হল, প্রাসাদের ভেতরে যার কণ্ঠ শোনা যায়, তিনি খোদার পক্ষ থেকে বার্তা নিয়ে এসেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে আগমন করছেন এবং খলীফা আল-আজেদও দুনিয়াতে ফিরে এসেছেন।

আল-আজেদ ফাতেমী খেলাফতের খলীফা ছিলেন। তার সিংহাসন ছিল মিসরে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে মিসরকে বাগদাদের খেলাফতে আব্বাসীয়ার অধীন করে দেন। তার অল্প ক'দিন পরেই আল-আজেদ মৃত্যুবরণ করেন। এটি দু'আড়াই বছর আগের ঘটনা। ফাতেমীরা খৃস্টান ও হাশীশীদের সাথে যোগসাজশ করে একটি ষড়যন্ত্র আঁটে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং মিসরে ফাতেমী খেলাফতের পুনর্বহাল ছিল সেই ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই ষড়যন্ত্রকে সফল করার লক্ষ্যে মিসর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল সুদানীদের।

প্রাসাদের অদৃশ্য দরবেশের মুরীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে দিন দিন। এলাকাবাসী অতিদ্রুত ভক্তে পরিণত হচ্ছে তার। দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার মানুষদের মধ্যে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হতে শুরু করেছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) খলীফা আল-আজেদকে ফেরত পাঠিয়েছেন এবং তিনি নিজেও আসছেন। তারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার সংকল্প থেকে তওবা করে ফেলে। এখন তাদের বিশ্বাস, যুদ্ধ-বিগ্রহ পাপের কাজ। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী একজন পাপিষ্ঠ মানুষ। নিজের রাজত্বের বিস্তৃতির জন্য তিনি ধোঁকা দিয়ে লোকদের ফৌজে ভর্তি করান যে, তোমরা যুদ্ধে মারা গেলে শহীদ হবে এবং সোজা জান্নাতে চলে যাবে।

প্রাসাদের ভেতরের জগত্ এখন মানুষের উপাসনালয়। আশপাশের পার্বত্য এলাকায় এখন তাঁবু ফেলে বাসবাস করছে তারা। প্রাসাদের পুণ্যাত্মা দরবেশের সাক্ষাত লাভের জন্য তারা ব্যাকুল-বেকারার। একটি নতুন ফেরকার উদ্ভব হল মিসরের এ অঞ্চলটিতে।

যে জখমী হাশীশী সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর সংহারী হামলা করেছিল, আলী বিন সুফিয়ান তাকে কায়রো নিয়ে যান। আলাদা একটি ঘরে থাকতে দেয়া হয়

তাকে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নির্দেশ মোতাবেক সর্বক্ষণের জন্য একজন ডাক্তার নিযুক্ত করে দেয়া হয় তার জন্য। তার ঘরের দরজায় একজন সান্ত্রী দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। কিন্তু এখনো পালাবার শক্তি ফিরে আসেনি তার।

সীমান্ত এলাকার ফেরাউনী প্রাসাদ সম্পর্কে তথ্য দিয়েছে জখমী। এখান থেকে পরিচালিত হয় খৃস্টানদের ইসলাম ও আইউবী বিরোধী ষড়যন্ত্র। জখমী সুস্থ হলে তার সহযোগিতায় গোয়েন্দা পাঠিয়ে প্রাসাদের ভেতরের খবরাখবর নেন আলী বিন সুফিয়ান। হতে পারে জখমী মিথ্যা তথ্য প্রদান করেছে। কায়রো ফিরে এসেই আলী বিন সুফিয়ান তার নায়েব হাসান ইবনে আবদুল্লাহ ও গিয়াস বিলবিসকে বলে দিয়েছিলেন যে, যে অঞ্চলের মানুষ আমাদের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে চলে গেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে, সেখানে আপাতত কোন সংবাদদাতা বা গুপ্তচর যেন না পাঠায়। বড় ধরনের রহস্য উদঘাটনের আশা করছেন আলী বিন সুফিয়ান।

জখমীর মনে কেন যেন সন্দেহ জন্মে গেছে যে, সে বাঁচতে পারবে না। অনর্গল সে কাঁদছে আর নিজের গ্রামের নাম উল্লেখ করে করে বলছে, অমুক জায়গা থেকে আমার বোনটাকে এনে দিন, মৃত্যুর আগে আমি ওকে একটু দেখে যাই। বোনের প্রতি অস্বাভাবিক আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে লোকটি। এ মুহূর্তে বোন ছাড়া আর কোন ভাবনাই নেই যেন তার হৃদয়ে। দু'জন দূতকে আলী বিন সুফিয়ান জখমীর গ্রামের ঠিকানা বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, যাও এর বোনকে সাথে করে নিয়ে আস। এলাকাটি মিসরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। সাথে সাথে রওনা হয়ে যায় দূত।

শোবক পৌঁছে গেছেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। প্রাণ-সংহারী হামলার কোন প্রতিক্রিয়া নেই তার চেহারায়। যেন পথে কিছুই ঘটেনি। তার দেহরক্ষী বাহিনী কমান্ডার ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ যেমন পেরেশান তেমনি লজ্জিত। তাদের আশংকা, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যে কোন মুহূর্তে আমাদেরকে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করবেন। কিন্তু না, এ সম্পর্কে তার কোন কথা নেই। ইঙ্গিতে-আভাসেও কিছু বলছেন না তিনি। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় কমান্ডের সামরিক কর্মকর্তাদের বললেন, 'আপনারা নিজ চোখেই তো দেখলেন যে, আমার জীবনের কোন ভরসা নেই। আপনারা আমার সমরকৌশল রপ্ত করার চেষ্টা করুন। গভীর মনোযোগ সহকারে দেখুন, আমি কিভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করছি। আমার অবর্তমানে আপনাদের সামনে অগ্রসর হতে হবে। দুশমন আমাদের বিরুদ্ধে অপর যে গোপন যুদ্ধটি চালু করে ফেলেছে, সেদিকে গভীর নজর রাখুন। নাশকতাকারীদের ধরুন আর শিরচ্ছেদ করতে থাকুন। যারা নিজ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও দ্বীন-ধর্মের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী নিজের দেহরক্ষী বাহিনীটির ব্যাপারে একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। শোবক দুর্গে পৌঁছে প্রথম কথাটি বললেন, 'কোন গুপ্তচর ফিরে এসেছে কি?' তাকে বলা হল, দু'জন গুপ্তচর বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে এসেছে। সুলতান আইউবী দু'জনকে ডেকে পাঠান এবং খৃস্টানদের পরিকল্পনার বিস্তারিত রিপোর্ট গ্রহণ করেন। গুপ্তচরদের নিকট থেকে তিনি খৃস্টানদের পরিকল্পনা সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি লাভ করেন। তিনি সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গীর প্রেরিত বাহিনীর সালার, মিসর থেকে আগত সেনা অধিনায়ক এবং দু'জনের দু'নায়েবকে ডেকে পাঠিয়ে গভীর ভাবনায় হারিয়ে যান।

চারদিন পর জখমী হাশীশীর বোন এসে পৌঁছে। সাথে তার চারজন পুরুষ। এরা জখমীর চাচাতো ভাই বলে পরিচয় দেয়া হল। মেয়েটি তরুণী, অতিশয় রূপসী। ভাইয়ের জন্য বোনও ছিল উৎকণ্ঠিত। জখমী হাশীশী তার একমাত্র ভাই। বাবা বেঁচে নেই। মা মারা গেছেন।

তারা জখমীর সাথে সাক্ষাৎ করবে। কিন্তু এর জন্য আলী বিন সুফিয়ানের অনুমতির প্রয়োজন। আলী বিন সুফিয়ান শুধু বোনকে অনুমতি দিলেন। অনুনয়-বিনয় করে পুরুষ চারজন। বলে, আমরা অনেক দূর থেকে বহু কষ্ট করে এসেছি। জখমী ভাইটিকে শুধু এক নজর দেখে যেতে দিন। তার সাথে আমরা কোন কথা বলব না।

আলী বিন সুফিয়ান এই মর্মে তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন যে, তিনি নিজে তাদের সাথে থাকবেন এবং জখমীকে এক নজর দেখার সুযোগ দিয়ে সাথে সাথে বের করে দেবেন।

তখনই তিনি তাদেরকে জখমীর কক্ষে নিয়ে গেলেন। ভাইকে দেখেই বোন তার গায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে এবং হাউমাউ করে কেঁদে উঠে। অন্যদের সম্পর্কে আলী বিন সুফিয়ান জখমীকে বললেন, এদের সাথে হাত মিলাও, এরা এক্ষুণি চলে যাবে। জখমী এক এক করে চারজনের সাথে হাত মিলায়। আলী বিন সুফিয়ান তাদের বের হয়ে যেতে আদেশ করলেন এবং বলে দিলেন, এরপর আর কখনো তোমরা এর সাথে দেখা করার চেষ্টা কর না।

তারা চলে যায়। বোন আলী বিন সুফিয়ানের পা জড়িয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে আবেদন জানায়, ভাইয়ের সেবার জন্য আপনি আমাকে এখানে থাকার অনুমতি দিন। আলী বিন সুফিয়ান একটি নারীর এরূপ করুণ আর্তি প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। দেহ তল্লাশি নিয়ে তিনি মেয়েটিকে জখমীর নিকট থাকার অনুমতি দিয়ে বেরিয়ে যান।

কক্ষে এখন শুধু ভাই আর বোন। বোন জানতে চায়, তুমি কী করেছিলে? ভাই ঘটনার বিবরণ দেয়। বোন জিজ্ঞেস করে, তা এখন তোমার পরিণতি কী হবে? ভাই

জবাব দেয়, 'আমি আমীরে মেসেরের উপর প্রাণ-সংহারী হামলা করেছি। এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। সুলতান যদি করুণা করেন, তবে বড়জোর মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পেতে পারি। কিন্তু আজীবন তাদের বন্দীশালার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ধুঁকে ধুঁকে জীবন কাটাতে হবে অবশ্যই।'

'তার অর্থ কি এই যে, আমি জীবনে আর কখনো তোমায় দেখতে পাব না?' জিজ্ঞেস করে বোন।

'না শারজা! তুমি জীবনে আর কখনো আমায় দেখতে পাবে না। আর আমিও না পারব মরতে, না পারব বেঁচে থাকতে। তারা আমাকে যেখানে বন্দী করে রাখবে, তা বড়ই ভয়ংকর জায়গা।' বলল জখমী।

শিশুর ন্যায় হাউমাউ করে কেঁধে উঠে বোন। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে– 'আমি তখনও তোমায় বারণ করেছিলাম যে, ওদের চক্করে পড় না। তুমি বলেছিলে, সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করা বৈধ। তুমি লোভে পড়ে গিয়েছিলে। আমার ভবিষ্যত কি হবে, তুমি তারও চিন্তা করলে না। তুমি না থাকলে আমার উপায় কি হত বল তো।'

এলোমেলো হয়ে গেছে জখমী ভাইয়ের মস্তিষ্ক। কখনো সে অনুতপ্ত হয়ে বলছে, 'হায়! কেন আমি ওদের খপ্পরে পড়লাম।' কখনো বলছে, 'সালাহুদ্দীন আইউবী মানুষ নন, আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতা। আমরা চারটি তাগড়া যুবক মিলেও তার দেহে খঞ্জরের একটি আচড়ও বসাতে পারলাম না। একতিল বিষ তার মুখে পুরতে পারলাম না। তিনি একা আমাদের তিনজনকে প্রাণে মেরে ফেললেন আর আমাকেও যমের মুখে তুলে দিলেন।'

'এই যে মানুষ বলছে, সালাহুদ্দীন আইউবীর ঈমান এত শক্ত যে, কোন পাপিষ্ঠ তাকে হত্যা করতে পারে না, তাতো মিথ্যা নয়। তোমরা চারজনই তো মুসলমান ছিলে। এতটুকু চিন্তাও তোমরা করলে না যে, তিনিও মুসলমান।' বলল শারজা।

'তিনি আল্লাহর খলীফার সিংহাসনের অবমাননা করেছেন।' উল্টো দিকে ঘুরে যায় জখমীর মস্তিষ্ক। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, 'তুমি জান না যে, আল-আজেদ আল্লাহর প্রেরিত খলীফা ছিলেন।'

'হয়তো বা ছিলেন অথবা ছিলেন না। আমি শুধু এতটুকু জানি যে, তুমি আমার ভাই আর আমার থেকে তুমি আজীবনের জন্য হারিয়ে যাচ্ছ। তোমার মুক্তির কোন পথ বের করা যায় না কি?' বলল শারজা।

'হয়ে যাবে হয়তো। আমি এ শর্তেই তাদেরকে আমার সব তথ্য ফাঁস করে দিয়েছি যে, তারা আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু আমার অপরাধ এতই মারাত্মক যে, ক্ষমা বোধ হয় পাব না।' জবাব দেয় জখমী।

এ সময়ে জখমীর ঘুমিয়ে পড়ার কথা। এত কথা বলা ঠিক হচ্ছে না তার। পেটের জখম খুলে যাওয়ার আশংকা প্রবল। কিন্তু একনাগাড়ে বলেই যাচ্ছে সে। কাঁদছে তার বোন। হঠাৎ তার পেটের জখমে ব্যথা শুরু হয়ে যায়। অস্থির হয়ে উঠে সে। বোনকে বলে, 'শারজা! তুমি বাইরে যাও। কাউকে পেলে বল, ডাক্তার নিয়ে আসতে। আমি মরে যাচ্ছি।'

এক দৌড়ে বেরিয়ে পড়ে শারজা। প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। প্রহরীকে ভাইয়ের অবস্থা জানায়। প্রহরী শারজাকে ডাক্তারের ঘরটি দেখিয়ে দেয়। ডাক্তারের প্রতি নির্দেশ ছিল, দিন হোক রাত হোক জখমীকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। শাহী ডাক্তার তিনি।

প্রহরীর দেখিয়ে দেয়া পথ ধরে ছুটে যায় শারজা। পৌছে যায় ডাক্তারের ঘরে। ডাক্তারকে ভাইয়ের অবস্থা জানায়। সংবাদ পাওয়া মাত্র ছুটে আসেন ডাক্তার।

রক্তে লাল হয়ে গেছে জখমীর পেটের পট্টি। ডাক্তার সাথে সাথে পট্টিটা খুলে ফেলেন। রক্ত বন্ধ করার পাউডার মেখে দীর্ঘ সময় ব্যয় করে আবার পট্টি বেঁধে দেন। রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। ডাক্তার জখমীকে ওষুধ খাইয়ে দেন, যার ক্রিয়ায় ঘুমিয়ে পড়ে সে।

শাহী ডাক্তার বয়সে তরুণ। সুদর্শন চেহারা। আকর্ষণীয় দেহ। শারজার চোখ আটকে যায় তার প্রতি। আপন ভাইয়ের প্রতি তার সহানুভূতিতেও সে অতিশয় মুগ্ধ। এত রাতে সংবাদ পাওয়া মাত্র একজন কয়েদী জখমীর চিকিৎসার জন্য কেউ ছুটে আসতে পারে, তা কল্পনাও করতে পারছে না শারজা। কিন্তু ইনি আসলেন এবং পরম গুরুত্ব সহকারে জখমীর চিকিৎসা করলেন। তাই ডাক্তারের প্রতি অভিভূত শারজা। নিদ্রায় জখমীর দু'চোখের পাতা বন্ধ হয়ে এলে ডাক্তার নিজের চোখ দু'টো বন্ধ করে দু'হাত উর্ধে তুলে ধরে মোনাজাত করলেন– 'মানুষের জীবন-মৃত্যু দু-ই তোমার হাতে হে আমার আল্লাহ! এই হতভাগার প্রতি তুমি রহম কর। একে তুমি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা কর। একে সুস্থতা দান কর।'

দু'চোখ গড়িয়ে অশ্রু নেমে আসে শারজার। ডাক্তারের প্রতি ভক্তিতে-আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে সে। ডাক্তারের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তার একটি হাত মুঠি করে ধরে মাথানত করে চুমু খায় শারজা। শারজার পরিচয় জানতে চান ডাক্তার। শারজা বলে, আমি আপনার রোগীর বোন। বলেই সে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনার অন্তরে কি এতই দয়া যে, আপনি আমার ভাইকে কষ্টের মধ্যে দেখতে চান না। নাকি এ উদ্দেশ্যে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান যে, সে আপনাকে সব গোপন তথ্য ফাঁস করে দেবে?'

‘এর কাছে কোন তথ্য আছে কি নেই তা নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। আমার কর্তব্য একে বাঁচিয়ে রাখা এবং সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করে তোলা। আমার দৃষ্টিতে মুমিন-মুজরিমে কোন পার্থক্য নেই।’ বললেন ডাক্তার।

‘আপনি বোধ হয় জানেন না যে, এর অপরাধ কি? জানলে আপনি এর কাটা ঘায়ে পট্টি বাঁধার পরিবর্তে নুন ভরে দিতেন।’ বলল শারজা।

‘জানি। তবু আমি একে বাঁচিয়ে রাখার পূর্ণ চেষ্টা করে যাব।’ জবাব দেন ডাক্তার।

ডাক্তারের প্রতি প্রভাবিত হয়ে পড়ে শারজা। নিজের একান্ত ব্যক্তিগত বৃত্তান্ত শোনাতে শুরু করে সে ডাক্তারকে। শারজা জানায়, শৈশবে তার বাবা-মা দু'জনই মারা যান। সে সময়ে তার এই ভাইয়ের বয়স ছিল দশ-এগার বছর। ভাই তাকে লালন-পালন করে। ভাই না থাকলে এতদিন কেউ না কেউ তাকে অপহরণ করে নিয়ে যেত। ভাই তার জীবনটাকে ওয়াক্ফ করে দিয়েছিল বোনের জন্য।

ডাক্তার মনোযোগ সহকারে শারজার কথা শুনতে থাকেন। এক পর্যায়ে মেয়েটিকে তিনি বাইরে আঙ্গিনায় নিয়ে যান, পাছে জখমীর ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে। শারজার কথায় ডাক্তার এতই নিমগ্ন হয়ে পড়েন, যেন রাতটা তিনি এখানেই কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর যখন তিনি চলে যেতে উদ্যত হলেন, তখন শারজা তার হাত ধরে বলল, ‘আপনি চলে গেলে আমি ভয় পাব।’ ডাক্তার বললেন, ‘আমি না তোমায় সাথে করে নিয়ে যেতে পারি, না তোমার সাথে এখানে থাকতে পারি।’ তবু শারজার খাতিরে তিনি আরো কিছু সময় এখানে অতিবাহিত করে রাত দ্বি-প্রহরের পর ঘরে ফেরেন।

পরদিন ভোরবেলা। সূর্য এখনো উদয় হয়নি। ডাক্তার জখমীকে দেখার জন্য এসে পড়েন। রাতের ন্যায় যত্নের সাথে তিনি রোগীকে নিরীক্ষা করে দেখেন। জখমীকে দুধ পান করান এবং এমন খাবার খাওয়ান,যা শারজা কখনো স্বপ্নেও দেখেনি।

এ সময়ে জখমীর কক্ষে আসেন আলী বিন সুফিয়ান। জখমীকে এক নজর দেখে চলে যান তিনি। কিন্তু ডাক্তার যাননি এখনো। শারজার সাথে কথা বলতে শুরু করেন তিনি। কাটান অনেকক্ষণ।

সেদিন ডাক্তার সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনবার জখমীকে দেখতে আসেন। অথচ তার আসার কথা মাত্র একবার- দুপুরে। সন্ধ্যায় যখন ডাক্তার জখমীকে দেখে ফিরে যান, তখন জখমী তার বোনকে বলে, ‘শারজা! মনোযোগ দিয়ে তুমি আমার একটি কথা শোন। আমার জীবন এই ডাক্তারের হাতে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তোমাকে দেখার পর ডাক্তার চিকিৎসা আগের চেয়ে এখন অনেক ভালো করছেন। আমি মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পারি, কিন্তু এত বেশী মূল্য আমি তাকে দেব না, যার আশা সে পোষণ করছে। সন্দেহ নয়- আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমাকে জীবিত রাখার বিনিময়ে লোকটি তোমার ইজ্জতের নজরানা হাতিয়ে নিতে চায়।’

'আমি তো তাকে ফেরেশতা মনে করি। এ যাবত এমন কোন আভাস-ইঙ্গিতও পাইনি তার কাছে। তাছাড়া আমি তো আর ছোট্র খুকী নই যে, চাইলেই সে আমাকে পটাতে পারবে।'

রাতে ডাক্তার আসেন। ঘুমিয়ে পড়েছে জখমী। শারজা জাগ্রত। ডাক্তারের সঙ্গে বারান্দায় চলে যায় শারজা। দু'জন কথা বলে দীর্ঘক্ষণ। ডাক্তার বললেন, ওষুধের ক্রিয়ায় তোমার ভাই যে ঘুম ঘুমুচ্ছে, ভোর নাগাদ তার সজাগ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এসো, আমার ঘরে চল। ডাক্তারের প্রস্তাব ফেলে দিতে পারে না শারজা। চলে যায় তার সাথে।

সুশ্রী যুবক ডাক্তার একা থাকেন ঘরে। শারজা অতিশয় বুদ্ধিমতি তরুণী। তার ধারণা, আজ রাতে লোকটা ধরা খেয়ে যাবে নিশ্চয়। কিন্তু তেমনটি হয়নি। সমব্যাথী বন্ধুর ন্যায় শারজার সাথে কথা বলে সময় কাটান ডাক্তার। তার এই স্নেহমাখা পবিত্র আচরণ মুগ্ধ করে তুলে শারজাকে। হঠাৎ শারজা জিজ্ঞেস করে বসে, 'আমি সুদূর এক মরু অঞ্চলের একটি গরীব মেয়ে। তদুপরি এমন এক আসামীর বোন, যে মিসরের সুলতানের ন্যায় মহান ব্যক্তিকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। তথাপি তুমি আমার সাথে এমন সদয় আচরণ কেন করছ, যার আমি হকদার নই?'

জবাবে শুধু মুচকি একটা হাসি দেন ডাক্তার। শারজা বলে, 'আমার তো এ ছাড়া আর কোন গুণ নেই যে, আমি একটি যুবতী মেয়ে। আর সম্ভবত কিছুটা রূপ-সৌন্দর্য্যও আছে।'

তোমার মধ্যে আরো এমন একটি গুণ আছে, যা তোমার জানা নেই। আমার একটি বোন ছিল দেখতে ঠিক তোমারই মত। তোমাদের যেমন আর কোন ভাই-বোন নেই, তেমনি আমরাও ভাই-বোন দু'জনই ছিলাম। আব্বা-আম্মা মারা গেছেন। তোমার ভাইয়ের ন্যায় আমিও আমার বোনকে লালন-পালন করে বড় করেছিলাম। নিজের জীবনের সব হাসি-আনন্দ আমি তার জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলাম। এক সময়ে তার অসুখ হল আর মারা গেল আমারই হাতে। রয়ে গেলাম আমি একা। তোমাকে দেখে আমার সেই বোনের কথা মনে পড়ে গেল। মনে হল, আমার বোনকে আমি ফিরে পেয়েছি। তুমি যদি নিজেকে যুবতী ও সুন্দরী মেয়ে ভেবে আমার উপর সন্দেহ করেই থাক, তাহলে ঠিক আছে, তোমার ব্যাপারে আমার আর কোন কৌতূহল রইল না। আমি তোমার ভাইকে নিয়েই ব্যস্ত থাকি। তাকে সুস্থ করে তোলা আমার কর্তব্য।

শারজা যখন ডাক্তারের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, তখন গভীর রাত। মেয়েটির মনে এখন আর কোন সন্দেহ নেই। পরদিন ডাক্তার জখমীকে দেখতে আসেন। শারজার সাথে কোন কথা বলেন না তিনি। রোগী দেখে যখন কক্ষ থেকে বের হয়ে

যেতে উদ্যত হলেন, অমনি শারজা তার সামনে এসে পথ রোধ করে দাঁড়ায়। শারজার ধারণা, ডাক্তার তার সাথে রাগ করেছেন। ডাক্তার বলেন, আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নই। শারজা খানিকক্ষণ ডাক্তারের মুখপানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে পথ ছেড়ে দেয়। ডাক্তার চলে যান।

রাতে জখমীকে ঘুম পাড়িয়ে শারজা আবার হাঁটা দেয় ডাক্তারের বাড়িতে। ডাক্তারের সঙ্গে কাটায় দীর্ঘ সময়। নিজের মনে কিছু জট পড়ে আছে তার। সেগুলো খুলতে চাইছে সে। শারজা ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা বলুন তো, খলীফা কি আল্লাহর প্রেরিত ব্যক্তি নন?'

'না, খলীফা সাধারণ মানুষ হয়ে থাকেন। আল্লাহর প্রেরিত লোক তো ছিলেন নবী-রাসূলগণ। মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত এসে সে ধারা বন্ধ হয়ে গেছে।' জবাব দেন ডাক্তার।

'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী কি আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ?' জিজ্ঞেস করে মেয়েটি।

'না, তিনিও মানুষ। তবে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা তাঁর মর্যাদা বড়। কারণ, তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহান পয়গামকে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে পৌঁছিয়ে দিতে চাইছেন।' ডাক্তার জবাব দেন।

শারজা এরূপ আরো অনেকগুলো প্রশ্ন করে আর ডাক্তার জবাব দেন। সবশেষে শারজা বলে, 'আমার ভাইটি মস্তবড় পাপী। আপনি এই যে কথাগুলো আমায় বললেন, তা যদি আমার ভাইকে জানাতেন, তাহলে হয়তো ভাইটি আমার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারত। কিন্তু তার জীবন তো আর রক্ষা পাবে না।'

'পাবে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যখন বলে দিয়েছেন যে, একে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা কর, তো এর অর্থ হল, তাকে শাস্তি দেয়া হবে না। তোমার ভাইয়ের উচিত, পাপাচার থেকে তাওবা করে নেয়া। আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, তোমার ভাই ক্ষমা পেয়ে যাবে।' বললেন ডাক্তার।

কেঁদে ফেলে শারজা। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে, 'আমি সারাটা জীবন সালাহুদ্দীন আইউবীর খেদমতে কাটিয়ে দেব আর আমার ভাই আপনাদের গোলাম হয়ে থাকবে।' বলতে বলতে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে শারজা। আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডাক্তারের হাত ধরে বলে, 'আপনি মূল্য যা চাইবেন, আমি আদায় করব। আপনি আমায় আপনার দাসী বানিয়ে নিন, আপত্তি নেই। বিনিময়ে আমার ভাইকে সুস্থ করে তুলুন এবং তাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।'

'কাজের বিনিময় আমরা আল্লাহর নিকট থেকে গ্রহণ করে থাকি'— শারজার মাথায় হাত রেখে ডাক্তার বললেন— 'তুমি নিশ্চিত থাক, ভাইয়ের অপরাধের সাজা বোনকে দেয়া হবে না এবং ভাইয়ের চিকিৎসার মূল্যও বোন থেকে আদায় করা হবে না। সকলের রক্ষণাবেক্ষণকারী আল্লাহ। তিনিই আমার উপর তোমার ইজ্জত সংরক্ষণ

এবং ভাইয়ের সুস্থতার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। দু'আ কর, যেন আমি এই আমানতে খেয়ানত না করি। নারীর আহাজারি আল্লাহর আরশকে কাঁপিয়ে তুলতে পারে। তুমি দু'আ কর এবং সেই আল্লাহর মহত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখ, যার বিরুদ্ধে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।'

মেয়েটির হৃদয়জগতে জেঁকে বসেন ডাক্তার। ডাক্তারের যাদুমাখা কথা আর মায়াময় পবিত্র আচরণ চুম্বকের ন্যায় আকৃষ্ট করে তোলে মেয়েটিকে। ডাক্তারের ব্যাপারে মেয়েটির ধারণা ছিল এক রকম আর প্রমাণিত হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এমন নির্জন রাতে অতিশয় রূপসী একটি যুবতী যে তার দয়ার উপর নির্ভরশীল, সে অনুভূতিই যেন তার নেই। এভাবে কেটে গেল রাতের অর্ধেকটা। ডাক্তার তাকে বললেন, 'ওঠ, তোমাকে ওখানে রেখে আসি, তোমার ভাইকেও এক নজর দেখে আসি।'

ঘর থেকে বের হয় দু'জন। দরজায় তালা লাগিয়ে হাঁটা দেয় তারা। অন্ধকার রাত। দু'টি ঘরের মধ্যখানে একটি সরু গলিপথ অতিক্রম করতে হবে তাদের। এই গলিপথ অতিক্রম করে সামান্য একটু সামনে এগুলেই জখমী হাশীশীর থাকার ঘর। ঘরের দরজায় সান্ত্রী দণ্ডায়মান।

ডাক্তার ও শারজা গলির মধ্যে ঢুকতে যাবেন, ঠিক এমন সময়ে পেছন থেকে কারা যেন হঠাৎ ঝাঁপটে ধরে দু'জনকে। মোটা কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলা হয় দু'জনের মুখ। টু-শব্দটি পর্যন্ত করতে পারছে না তারা। ডাক্তার দৈহিক শক্তিতে দুর্বল নন। কিন্তু আগে টের পাননি বলে কোন প্রতিরোধ করতে পারলেন না তিনি। আক্রমণকারীরা পাঁচজন বলে মনে হল তাদের কাছে। ডাক্তার ও শারজাকে তুলে নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায় তারা।

কিছুদূরে দাঁড়িয়ে ছিল কয়েকটি ঘোড়া। ডাক্তারের হাত-পা রশি দ্বারা বেঁধে তুলে নেয়া হয় ঘোড়ার পিঠে। একজন চড়ে বসে তার ঘোড়ায়। একজনের কণ্ঠস্বর শুনতে পান ডাক্তার। লোকটি শারজাকে উদ্দেশ করে বলছে, 'শব্দ কর না শারজা! তোমার কাজ হয়ে গেছে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বস। এই নাও তোমার ঘোড়া।'

শারজার মুখের কাপড় সরিয়ে নেয়া হল। ডাক্তার তার কণ্ঠস্বর শুনতে পান, 'ওকে ছেড়ে দাও, ওর কোন দোষ নেই। লোকটি বড় ভালো মানুষ।'

'আমাদের ওকে প্রয়োজন আছে।' বলল একজন।

'শারজা! চুপচাপ ঘোড়ার পিঠে চড়ে বস।' আদেশের সুরে বলল আরেকজন।

'উহ্! তুমি?' শারজার কণ্ঠস্বর।

'সওয়ার হয়ে যাও। সময় নষ্ট কর না।' আদেশ দেয় আরেকজন।

শারজা ঘোড়ায় চড়ে বসে। ছুটে চলে কাফেলা। অল্পক্ষণের মধ্যে কায়রো থেকে বেরিয়ে যায় তারা।

❁ ❁ ❁

পরদিন ভোরবেলা। পাহারাদার পরিবর্তনের সময়। নতুন প্রহরী এসে দেখে রাতের প্রহরী নেই। ঘরের ভেতরে উঁকি মেরে দেখে জখমী শুয়ে আছে কম্বল মুড়ি দিয়ে। মুখটাও তার আবৃত। প্রহরী বাইরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তার জানা মতে জখমীকে দেখার জন্য এক্ষুণি ডাক্তার এসে পড়বেন। আসবেন আলী বিন সুফিয়ানও। সে এও জানত যে, জখমীর বোন জখমীর সঙ্গে থাকে এবং সে ছাড়া অন্য কারো ভেতরে যাওয়ার অনুমতি নেই। কিন্তু বোনটিকেও দেখা যাচ্ছে না এদিক-ওদিক কোথাও।

সূর্য উদয় হল। আলী বিন সুফিয়ান আসলেন। ডাক্তার এসেছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। প্রহরী, 'ডাক্তার আসেননি। আমি এসে পূর্বের প্রহরীকেও পাইনি। ভেতরে জখমীর বোনও নেই।' শুনে আলী বিন সুফিয়ান মনে করলেন, জখমীর ব্যাথা বোধ হয় বেড়ে গেছে ,তাই তার বোন ডাক্তার ডাকতে গেছে।

এই জখমী সালতানাতে ইসলামিয়ার জন্য মিসরের সমান মূল্যবান ব্যক্তি। অপেক্ষা শুধু তার সুস্থ হওয়ার। আলী বিন সুফিয়ানের আশা, তার মাধ্যমে ভয়ংকর এক ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচিত হবে।

দ্রুত ঘরে প্রবেশ করেন আলী বিন সুফিয়ান। জখমীর আপাদমস্তক কম্বল দিয়ে ঢাকা। তাজা রক্তের ঘ্রাণ নাকে আসে আলী বিন সুফিয়ানের। জখমীর মুখের কম্বল সরান তিনি। হঠাৎ আঁৎকে ওঠে সরে যান পেছন দিকে। যেন ওটা মানুষ নয়, অজগর। সেখানে দাঁড়িয়েই বাইরে দণ্ডায়মান প্রহরীকে ডাক দেন তিনি। ছুটে আসে প্রহরী। আলী বিন সুফিয়ান তাকে কম্বলাবৃত লোকটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ লোকটি রাতের প্রহরী না তো?' শায়িত লোকটির চেহারা দেখেই আতংকিত হয়ে উঠে প্রহরী। ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, তা-ই তো! ইনি এই বিছানায় শুয়ে আছেন কেন হুজুর? জখমী কোথায়?'

'শুয়ে আছে নয়– বল মরে আছে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

উপর থেকে কম্বলটা তুলে সরিয়ে ফেললেন আলী বিন সুফিয়ান। রক্তে রঞ্জিত বিছানা। জখমী হাশীশীর নয়– রাতের প্রহরীর লাশ। আলী বিন সুফিয়ান দেখলেন, লাশের হৃদপিন্ডের কাছে খঞ্জরের দু'টি জখম। জখমী হাশীশী উধাও। আলী বিন সুফিয়ান কক্ষে, বারান্দায়, বাইরে নিরীক্ষা করে দেখলেন। কোথাও এক ফোঁটা রক্তও চোখে পড়ল না। এতে পরিস্কার বোঝা গেল, প্রহরীকে জীবিত তুলে এনে বিছানায় শুইয়ে রেখে খঞ্জরের আঘাতে খুন করা হয়েছে। এতটুকু ছট্‌ফট্‌ও করতে দেয়া হয়নি। অন্যথায় এদিক-ওদিক রক্ত ছড়িয়ে থাকত। প্রাণ যাওয়ার পর লাশের উপর কম্বল মুড়িয়ে রাখা হয়েছে। তারপর ঘাতকরা জখমী ও তার বোনকে তুলে নিয়ে

গেছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, জখমীর বোন তার পলায়নে সাহায্য করেছে। সম্ভবত রূপের জালে আটকিয়ে মেয়েটি প্রহরীকে ভেতরে নিয়ে এসেছিল আর ঘাতকদল তাকে হত্যা করেছে।

আলী বিন সুফিয়ান নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হলেন যে, চার সঙ্গীকে জখমীর সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেয়া তার ঠিক হয়নি। তারা নিজেদেরকে জখমীর চাচাতো ভাই বলে পরিচয় দিয়েছিল। ভেতরে প্রবেশ করে তারা এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে গেছে। জখমীর বোনকেও এখানে থাকার অনুমতি না দেয়াই উচিত ছিল। তা ছাড়া মেয়েটি আসলেই জখমীর বোন কিনা, তাও তিনি যাচাই করে নিশ্চিত হননি।

আলী বিন সুফিয়ানের ন্যায় একজন অভিজ্ঞ গোয়েন্দা প্রধানকে ধোঁকা দেয়া সহজ ছিল না। কিন্তু এই জখমী ও তার সঙ্গীদের কাছে হেরে গেলেন তিনি। অনুতপ্ত হন নিজের ভুলের জন্য। প্রহরীকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করলে সে জানায়, এর আগের রাতে ডিউটি ছিল আমার। আমি মেয়েটিকে ডাক্তারের সঙ্গে তার ঘরে যেতে এবং গভীর রাতে ফিরে আসতে দেখেছি। এতে আলী বিন সুফিয়ানের সন্দেহ হল যে, তার মানে মেয়েটি ডাক্তারকেও রূপের জালে আটকে ফেলেছিল। আলী বিন সুফিয়ান প্রহরীকে বললেন, 'তুমি দৌঁড়ে গিয়ে ডাক্তারকে নিয়ে আস।'

প্রহরী চলে যাওয়ার পর আলী বিন সুফিয়ান তথ্য অনুসন্ধানে নেমে পড়েন। বাইরে গিয়ে মাটি পরীক্ষা করেন। তিনি মানুষের পায়ের চিহ্ন দেখতে পান। কিন্তু পদচিহ্ন তাকে কোন সাহায্য করতে পারল না। জখমী শহরে পালিয়ে থাকতে পারে না। পথ আছে মাত্র একটি। তা হল, জখমীর বোনকে যে গ্রাম থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল, সেখানে গিয়ে হানা দেয়া। কিন্তু সে তো অনেক দূরের পথ।

প্রহরী ফিরে এসে জানাল, ডাক্তার ঘরে নেই। আলী বিন সুফিয়ান নিজে তার ঘরে গেলেন। চাকর বলল, ডাক্তার গভীর রাতে একটি মেয়ের সাথে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন, আর ফিরেননি। মেয়েটি সম্পর্কে জানায়, এর আগেও সে ডাক্তারের সঙ্গে এ ঘরে এসেছিল এবং অনেক রাত পর্যন্ত দু'জন বসে বসে কথা বলেছিল। শুনে আলী বিন সুফিয়ান নিশ্চিত হন যে, ডাক্তারও তাহলে জখমীর পলায়ন ঘটনায় জড়িত এবং এর মূলে রয়েছে মেয়েটির রূপের যাদু।

আলী বিন সুফিয়ান তার গুপ্তচরদের ডেকে পাঠান। তারা এলে তিনি তাদের জখমীর ঘটনা অবহিত করেন। তথ্য অনুসন্ধানের জন্য তারা চারদিক ছড়িয়ে পড়ে। একস্থানে তারা অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন দেখতে পায়। স্থানীয় তিন-চার ব্যক্তি বলল, রাতে তারা অনেকগুলো ঘোড়া দৌড়ানোর শব্দ শুনতে পেয়েছিল। ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে শহরের বাইরে চলে যায় গুপ্তচররা। কিন্তু আর

অগ্রসর হওয়া নিরর্থক। রাতে পালিয়ে যাওয়া ঘোড়াগুলোর পায়ের চিহ্ন দেখে পাকড়াও করা কোনমতেই সম্ভব নয়। আসামী পালিয়ে কোন্দিকে গেছে, তা-ই শুধু নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছে তারা।

আলী বিন সুফিয়ানের আপাতত করণীয়, মিসরে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর স্থলাভিষিক্ত তকিউদ্দীনকে সংবাদ দেয়া যে, জখমী হাশীশীকে তার সতীর্থরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এখন আলী বিন সুফিয়ানের ধারণা, জখমী তাকে যে তথ্য দিয়েছিল, তা সঠিক নয়। নিজের জীবন রক্ষা এবং পালাবার একটি সুযোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই সে এ কৌশল অবলম্বন করেছিল। লোকটি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী এবং আলী বিন সুফিয়ান দু'জনকেই বোকা ঠাওরিয়ে ছাড়ল। আলী বিন সুফিয়ান তকিউদ্দীনকে সংবাদ জানানোর জন্য চলে গেলেন।

❁ ❁ ❁

বেলা দ্বি-প্রহর। যে জখমী কয়েদীর দাঁড়াবার শক্তি পর্যন্ত ছিল না, এখন সে পৌঁছে গেছে মিসর থেকে বহু দূরে জনশূন্য বিরান এক এলাকায়। ডাক্তারও আছেন তার সঙ্গে। ডাক্তারের হাত-পা বাঁধা। নির্জীবের মত পড়ে আছেন একটি ঘোড়ার পিঠে। পা দু'টি তার ঘোড়ার একদিকে, মাথা ও বাহুদ্বয় অপরদিকে। সারাটা রাত ঘোড়ার পিঠে এভাবেই কেটেছে তার। ভোরের আলো ফোটার আগেই ঘোড়া থেমে যায়। পট্টি বেঁধে দেয়া হয় ডাক্তারের দু'চোখে। পট্টিটা কে বাঁধল দেখতে পেলেন না তিনি। চোখে পট্টি বাঁধার পর পায়ের বন্ধন খুলে দিয়ে তাকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দেয়া হল। হাত দু'টি এখনো বাঁধা। তার পেছনে চড়ে বসে একজন। ঘোড়া চলতে শুরু করে। ডাক্তার অনুভব করছেন যে, তার পেছনে পেছনে আরো কয়েকটি ঘোড়া চলছে এবং আরোহীরা ফিস্ফিস্ করে কথা বলছে।

ঘোড়া এগিয়ে চলছে আর সূর্য নীচ থেকে উপরে উঠছে। এক পর্যায়ে ডাক্তার আন্দাজ করলেন, তার ঘোড়া চড়াই অতিক্রম করছে। একটু পর পর মোড় নিচ্ছে ডানে-বাঁয়ে। আবার নীচে নামছে। এতে তিনি অনুমান করলেন যে, এটি কোন পার্বত্য এলাকা।

এভাবে দীর্ঘক্ষণ পথ অতিক্রম করেন ডাক্তার। সূর্য তখন মাথার উপর উঠে এসেছে। হঠাৎ পেছন দিক থেকে উচ্চকিত এক কণ্ঠস্বর ভেসে আসে তার কানে। তাতে তিনি বুঝতে পারেন যে, কোন আরোহী ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে গেছে। তার ঘোড়াটি থেমে গিয়ে মোড় ঘুরিয়ে দাঁড়িয়েছে পেছন দিকে। তারপর আবার কণ্ঠস্বর- 'তুলে নাও, ছায়ায় নিয়ে চল, লোকটা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। উহ! রক্ত ঝরছে তো! ডাক্তারের চোখ ও হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দাও। তিনি রক্তক্ষরণ বন্ধ করে দেবেন। অন্যথায় ভাইটি আমার মরে যাবে।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়া লোকটি জখমী হাশীশী। সারাটা রাতের ঘোড়সাওয়ারীর ফলে পেটের জখম খুলে গেছে তার। উরুর ক্ষত থেকেও পুনরায় রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। রাতভর রক্ত ঝরেছে। অবশেষে এখানে এসে এত বেশী রক্ত ঝরল যে, লোকটা চৈতন্য হারিয়ে ফেলল এবং ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল। তাকে তুলে একটি টিলার ছায়ায় নিয়ে যাওয়া হল, মুখে পানি দেয়া হল। কিন্তু পানি কণ্ঠনালী অতিক্রম করছে না তার। রক্তে ভিজে গেছে তার গায়ের কাপড়-চোপড়।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামানো হয় ডাক্তারকে। চোখ দু'টি খুলে যায় তার। এদিক-ওদিক না তাকিয়ে সোজা সামনের দিকে হাঁটতে নির্দেশ দেয়া হয় তাকে। পেছনে পিঠ ঘেঁষে খঞ্জর ধরে আছে কেউ, টের পান ডাক্তার। নির্দেশনা অনুযায়ী সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করেন তিনি।

একটি টিলার পাদদেশে পড়ে আছে জখমী। পাশে উপবিষ্ট শারজা। ডাক্তারকে দেখেই শারজা বলে উঠে, 'আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি আমার ভাইকে রক্ষা করুন।'

জখমীর শিরায় হাত রাখেন ডাক্তার। এদিক-ওদিক তাকাবার অনুমতি নেই তার। হাত রেখে বসে পড়েন তিনি। পিঠে খঞ্জরের খোঁচা অনুভব করেন। জখমীর শিরা দেখে তিনি সটান উঠে দাঁড়ান। ঘাড় ঘুরিয়ে দৃষ্টি ফেলেন পেছন দিকে। সম্মুখে কালো মুখোশপরা চারজন লোক দাঁড়িয়ে। শুধু চোখগুলো দেখা যায় তাদের। একজনের হাতে খঞ্জর। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ডাক্তার বললেন, 'তোমাদের উপর আল্লাহর গজব পড়ুক। বাঁচাবার পরিবর্তে লোকটাকে তোমরা খুন করে ফেলেছ! আমরা একে চারপাই থেকে নড়তে দেয়নি। আর তোমরা কিনা একে এতদূর থেকে নিয়ে এসেছ ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে। ওর জখম খুলে গেছে এবং দেহের সব রক্ত ঝরে গেছে। লোকটা বেঁচে নেই।'

ভাইয়ের লাশের উপর লুটিয়ে পড়ে শারজা। হাউমাউ করে বিলাপ জুড়ে দেয় মেয়েটি। ডাক্তারের চোখের উপর আবার পট্টি বেঁধে দেয় মুখোশধারীরা। নিয়ে যায় সেখান থেকে খানিক দূরে। ঘোড়ার পিঠে তুলে নেয়া হয় লাশটি। চলতে শুরু করে কাফেলা।

শারজার বুক-চেরা কান্নার করুণ শব্দ শুনতে পান ডাক্তার। মুহূর্তের জন্যও থামছে না মেয়েটি। ডাক্তার তার ঘোড়ার আরোহীকে বললেন, 'লোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যেত। কিন্তু তোমরা তাকে মেরে ফেললে। তাকে কোন সাজাও ভোগ করতে হতো না।

আরোহী বলল, 'আমরা তাকে তার প্রাণরক্ষা করার জন্য নিয়ে আসিনি। আমরা মূলত সেইসব গোপন তথ্য অপহরণ করেছি, যা তার সঙ্গে ছিল। তার মৃত্যুতে আমাদের কোন দুঃখ নেই। তার বুকে আমাদের যেসব তথ্য লুকায়িত ছিল, তোমার সরকার যে তা বের করতে পারেনি, তা-ই আমাদের পরম পাওয়া।'

'তা আমাকে তোমরা কোন্ অপরাধে শাস্তি দিচ্ছ?' জিজ্ঞেস করেন ডাক্তার।

'আমরা তোমাকে দেবতার হালে রাখব। একটু গরম বাতাসও তোমার গায়ে লাগতে দেব না। তোমাকে আমরা নিয়ে এসেছি তিনটি কারণে। এক. পথে জখমীর কোন সমস্যা দেখা দিলে তুমি চিকিৎসা করবে। কিন্তু আমরা ভেবেই দেখেনি যে, তোমার কাছে না আছে ওষুধ, না আছে ব্যান্ডেজ করার সরঞ্জাম। দুই. শারজাকেও আমাদের আনবার প্রয়োজন ছিল। ঘটনাক্রমে তুমি ছিলে তার সাথে। এমতাবস্থায় তোমাকে ছেড়ে আসা ছিল আমাদের জন্য বিপজ্জনক। তাই তোমাকেও তুলে আনতে হল। তৃতীয় কারণ, আমাদের একজন ডাক্তারের প্রয়োজন। তোমাকে আমরা সবসময় আমাদের সাথে রাখব।'

'আমি এমন লোকদের চিকিৎসা করব না, যারা আমার সরকারের বিরোধী। তোমরা খৃস্টান, সুদানী ও ফাতেমীদের আপন এবং তাদেরই ইঙ্গিতে তোমরা সালতানাতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছ। আমি তোমাদের কোন কাজে আসব না।' ডাক্তার বললেন।

'তাহলে আমরা তোমাকে হত্যা করে ফেলব।' বলল আরোহী।

'তা-ই বরং ভালো।' জবাব দেন ডাক্তার।

'তাহলে আমরা তোমার সঙ্গে এমন আচরণ করব, যা তোমার জন্য প্রীতিকর হবে না। তবে আমি আশা করছি, তোমার সাথে আমাদের খারাপ আচরণের প্রয়োজন পড়বে না। তুমি সালাহুদ্দীন আইউবীর শাসন দেখেছ। আমাদের রাজত্বও দেখবে। তখন তুমি বলবে, আমি এখানেই থাকতে চাই। এ তো জান্নাত। কিন্তু যদি তুমি আমাদের জান্নাতকে প্রত্যাখ্যান কর, তাহলে আমাদের জাহান্নাম কি জিনিস, তা তুমি দেখতে পাবে।' বলল আরোহী।

চলতে থাকে ঘোড়া। ডাক্তারের চোখে পট্টি বাঁধা। পট্টির অন্ধকার ভেদ করে নিজের ভবিষ্যত দেখার চেষ্টা করছেন তিনি। মনে মনে পালাবার পন্থাও খুঁজতে থাকেন। বারবার শারজার কথা মনে পড়ে তার। কিন্তু এই ভেবে তিনি নিরাশ হয়ে পড়ছেন যে, এ মেয়েটিও এদেরই লোক। তার সহযোগিতা পাওয়ার আশা করা বৃথা।

❁ ❁ ❁

সফরটা তাদের এতো দীর্ঘ ছিল না। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সীমান্ত প্রহরীদের হাতে ধরা খাওয়ার ভয়ে চুপিচুপি দূরবর্তী আঁকা-বাঁকা পথ ধরে অতিক্রম করতে হয়েছে এ সন্ত্রাসী চক্রটির। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ার পরও পথচলা অব্যাহত থাকে কাফেলার।

মধ্যরাতের খানিক আগে কাফেলা থেমে যায়। ঘোড়া থেকে নামিয়ে হাত-পা খুলে দেয়া হয় ডাক্তারের। চোখের পট্টিও সরিয়ে ফেলা হয় তার। তবু অন্ধকারের কারণে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। তাকে কিছু খাবার খেতে দেয়া হয় এবং পানি পান করানো হয়।

আহার শেষে আবার তার হাত-পা বেঁধে ফেলা হয়। শুয়ে পড়তে বলা হয় তাকে। ডাক্তার শুয়ে পড়েন। মুহূর্তের মধ্যে রাজ্যের ঘুম নেমে আসে ডাক্তারের ক্লান্ত-অবসন্ন চোখে।

শুয়ে পড়ে কাফেলার অন্যান্য লোকেরাও। জিন খুলে ঘোড়াগুলো বেধে রাখে সামান্য দূরে। ডাক্তারের পালাবার কোন আশংকা নেই। হাত-পা তার শক্ত করে বাঁধা।

কিছুক্ষণ পর কারো ডাকে ডাক্তারের চোখ খুলে যায়। ভাবলেন, আবার রওনা হওয়ার জন্য ডাকা হচ্ছে। পরক্ষণে মনে হল, কেউ তার পায়ের বাঁধন খুলছে। চুপচাপ পড়ে থাকেন তিনি। মৃত্যুর জন্য তিনি পূর্ব থেকেই প্রস্তুত। তার আশংকা ছিল, খুন করে হয়ত তাকে কোথাও ফেলে দেয়া হবে। কিন্তু পায়ের বাঁধন খুলে যাওয়ার পর যখন হাতের বাঁধনও খুলে যেতে শুরু করল, তখন তিনি কার যেন ফিস্‌ফিস্ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। কে যেন তার কানে কানে বলছে, 'আমি দু'টি ঘোড়ায় জিন বেঁধে রেখে এসেছি। চুপচাপ আমার পেছনে পেছনে আস। আমিও তোমার সাথে যাব। ওরা ঘুমুচ্ছে।' এ কণ্ঠস্বর শারজার।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় ডাক্তার। শারজার পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করেন তিনি। জায়গাটা বালুকাময় হওয়ার কারণে পায়ের শব্দ হচ্ছে না। সম্মুখে দু'টি ঘোড়া দণ্ডায়মান। ডাক্তারকে ইশারা দিয়ে একটিতে চড়ে বসে শারজা। অপরটিতে উঠে বসেন ডাক্তার। শারজা বলে, 'তুমি যদি দক্ষ ঘোড়সাওয়ার না-ও হয়ে থাক, তবু ভয় নেই, পড়বে না! ঘোড়া ছুটাও, লাগাম ঢিলে করে দাও। ঘোড়াটিকে ডানে-বাঁয়ে ঘুরাতে তো পারবে!'

প্রত্যুত্তরে কিছু না বলেই ডাক্তার ঘোড়া ছুটায়। সমান তালে ছুটে চলে শারজার ঘোড়াও। ধাবমান ঘোড়ার পিঠে থেকেই শারজা বলে, 'তুমি আমার পেছনে পেছনে থাক। আমি পথ চিনি। অন্ধকারে আমার থেকে আলাদা হবে না কিন্তু।'

দ্রুত ধাবমান ঘোড়া দু'টোই সজাগ করে তোলে অপহারণকারীদের। কিন্তু ধাওয়া করা অত সহজ নয়। তাদের প্রথমে দেখতে হবে, যে ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনি শোনা গেল, সেগুলো কার। তাদের মনে শারজার পালাবার কোন আশংকাই ছিল না। ঘোড়া ছুটিয়ে কে গেল তার সন্ধান নিতে নিতে কেটে গেল কিছুক্ষণ। জানা গেল, শারজা এবং ডাক্তার পালিয়ে গেছে। এরপর তাদের ঘোড়ায় জিন বাঁধতে হবে। এসবে যে সময় ব্যয় হল, ততক্ষণে পলায়নকারীরা অতিক্রম করে গেছে দু'-আড়াই মাইল পথ।

বারবার পেছন দিকে তাকাচ্ছে ডাক্তার ও শারজা। কেউ তাদের ধাওয়া করছে কিনা, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে তারা। না, তারা নিশ্চিত, কেউ তাদের পিছু নেইনি। তবু ঘোড়ার গতি হ্রাস করে না তারা। ছুটে চলে তীরবেগে। এতক্ষণে তারা বহু পথ অতিক্রম করে আসে। ডাক্তার শারজাকে বলেন, 'আশপাশে কোথাও না কোথাও সীমান্ত চৌকি থাকার কথা। কিন্তু তা কোথায় নির্দিষ্টভাবে আমার জানা নেই।' বলতে পারে না শারজাও। শারজা ডাক্তারকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলে, 'আমরা সঠিক পথেই কায়রো অভিমুখে এগিয়ে চলছি। পথও আর বেশী নেই।'

❁ ❁ ❁

পরদিন দ্বি-প্রহর। মিসরের ভারপ্রাপ্ত গবর্নর তকিউদ্দীনের সামনে বসে আছেন আলী বিন সুফিয়ান। তকিউদ্দীন বলছিলেন, 'আমি এ জন্য বিস্মিত নই যে, আপনার ন্যায় একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই ভুল করেছেন যে, একটি সন্দেহভাজন মেয়েকে জখমী বন্দীর নিকট থাকার অনুমতি দিয়েছেন এবং চারজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকেও জখমীর সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ প্রদান করেছেন। আমার বিস্ময় এ কারণে যে, এই চক্রটি অত্যন্ত দুঃসাহসী ও সুসংগঠিত। জখমীকে তুলে নিয়ে যাওয়া, প্রহরীকে হত্যা করে জখমীর বিছানায় ফেলে যাওয়া অতিশয় দুঃসাহসী অভিযানই বটে। সীমাহীন দুর্ধর্ষ ও সুসংগঠিত চক্র ছাড়া এমন সাহস কেউ দেখাতে পারে না।'

'আমার মনে হয়, ডাক্তার আর মেয়েটি এই অভিযানকে সহজ করে দিয়েছিল। এই অপরাধেও আমাদের জাতির সেই দুর্বলতা কাজ করেছে, যার জন্য সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী অস্থির, পেরেশান। যার কারণে তিনি বলে থাকেন যে, নারী আর ক্ষমতার মোহ মিল্লাতে ইসলামিয়াকে ডুবিয়ে ছাড়বে। ডাক্তারকে আমি সচ্চরিত্রবান যুবক মনে করতাম। একটি তরুণী তাকেও অন্ধ করে দিল। যা হোক, জখমী কয়েদীর গ্রামের ঠিকানা আমি পেয়ে গেছি। একটি বাহিনী রওনাও করিয়ে দিয়েছি।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'আর জখমী কয়েদী দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার যে প্রাসাদটির কথা বলেছিল, তার ব্যাপারে আপনি কি সিদ্ধান্ত নিতে চান?' জিজ্ঞেস করলেন তকিউদ্দীন।

'আমার মনে হচ্ছে, লোকটি মিথ্যে বলেছে। নিজের জীবন রক্ষা করার জন্য একটি ভূয়া গল্প বানিয়েছিল বোধ হয়। তথাপি আমি খোঁজ-খবর নিয়ে দেখব।' জবাব দেন আলী বিন সুফিয়ান।

কক্ষে বসে এ বিষয়ে কথা বলছেন দু'জন। হঠাৎ দারোয়ান ভেতরে প্রবেশ করে এমন একটি সংবাদ বলে, যা তাদের হতভম্ব করে দেয়। একজনের মুখের প্রতি তাকিয়ে থাকেন অন্যজন। বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন যেন তারা। সম্বিত ফিরে পেয়ে আলী বিন সুফিয়ান উঠে দাঁড়ান এবং 'অন্য কেউ হবে বোধ হয়' বলে বাইরে বেরিয়ে যান। তার পেছনে বেরিয়ে পড়েন তকিউদ্দীন। কিন্তু লোকটা অন্য কেউ নয়- তাদেরই ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছেন তাদের সামনে। সঙ্গে তার জখমী কয়েদীর বোন শারজা। ঘোড়াগুলো হাঁপাচ্ছে তাদের। ডাক্তার ও শারজার সমস্ত শরীর ধূলিমাখা। ওষ্ঠদ্বয় কাঠের মত শুষ্ক।

আলী বিন সুফিয়ান খানিকটা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কয়েদীকে কোথায় রেখে এসেছ?' ডাক্তার হাতের ইশারায় বললেন, 'আমাদের একটুখানি বিশ্রাম নিতে দিন।' আলী বিন সুফিয়ান দু'জনকে ভেতরে নিয়ে যান। তাদের জন্য খাবার ও পানির ব্যবস্থা করার আদেশ দেন।

ডাক্তার তার ও শারজার অপহরণের কাহিনীর সবিস্তার বিবরণ দেন। এও জানান যে, জখমী কয়েদী মারা গেছে। তিনি বলেন, আমি জানতাম না যে, জখমী কয়েদীও অপহরণ হয়েছে। পরদিন যখন একটি লোক ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে জখম খুলে গেল এবং বিপুল রক্তক্ষরণের দরুন লোকটা মারা গেল, তখনই আমি বিষয়টি জানতে পাই। তারপর ডাক্তার তার মুক্ত হয়ে ফিরে আসার কাহিনী শোনান।

কথা বলে শারজা। আলী বিন সুফিয়ান এবার বুঝতে পারেন মেয়েটি মরু অঞ্চলের মানুষ এবং অতি সাহসী ও গোঁয়ার প্রকৃতির। সে জানায়, আমি আমার ভাইয়ের আশ্রয়ে এবং তারই মুখ পানে তাকিয়ে বেঁচে ছিলাম। ভাইয়ের জন্য আমি জীবন দিতেও প্রস্তুত থাকতাম সবসময়। আপনারদের ডাক্তার যেরূপ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আমার ভাইয়ের চিকিৎসা করেছিলেন, তাতে আমি তার অনুরক্ত হয়ে যাই। আমার কাছে ডাক্তার ফেরেশতার মত মনে হতে লাগল।

শারজা জানায়- 'আমার সাথে যে চারজন লোক এসেছিল, তারা আমাদের আত্মীয় ছিল না। তারা ছিল সেই চক্রের সদস্য, যারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ও তাঁর পদস্ত কর্মকর্তাদের হত্যাচেষ্টায় তৎপর। আপনার লোকেরা যখন আমাকে আনার জন্য আমাদের গ্রামে যায়, তখন তারা চারজন গ্রামে অবস্থান করছিল। তারা জানতে পেরেছিল যে, আমার ভাই জখমী অবস্থায় আপনাদের হাতে বন্দী হয়ে আছে। তাই তাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আমার সাথে চলে আসে। তাদের আশংকা ছিল, জখমীর কাছে যে তথ্য আছে, তা ফাঁস হয়ে যাবে। জখমী কোথায় কোন্ অভিযানে আহত হয়েছে, তা তাদের জানা ছিল।'

শারজার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তার পরিকল্পনাও এটাই ছিল যে, সে ভাইকে অপহরণ করাবে। ভাইয়ের নিকট থাকার যে আবেদন সে করেছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল দু'টি। প্রথমতঃ ভাইয়ের সেবা-শুশ্রূষা করা, দ্বিতীয়তঃ সুযোগ পেলে ভাইকে অপহরণ করান।

জখমীর সাথে সাক্ষাৎ করে তারা। কায়রোতেই অবস্থান নিয়েছিল এক জায়গায়। শারজার ইঙ্গিতের অপেক্ষায় ছিল তারা। কিন্তু ডাক্তার মেয়েটিকে এমনভাবে প্রভাবিত করে ফেলেন যে, চিন্তাই পাল্টে যায় তার। ডাক্তার শারজাকে নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, তার ভাইয়ের সাজা হবে না। তাছাড়া তিনি মেয়েটিকে এমন এমন কথা শোনান, যা এর আগে কখনো সে শোনেনি। তিনি মেয়েটির হৃদয়ে ইসলামের মর্যাদা জাগ্রত করে দেন এবং উন্নত চরিত্রের প্রমাণ দিয়ে তাকে ভক্ত বানিয়ে ফেলেন। মেয়েটি সারাক্ষণ ডাক্তারের কাছে বসে বসে তার মধুর-মূল্যবান কথা শুনতে ব্যাকুল হয়ে উঠে।

একদিন ডাক্তারের ঘরে যাওয়ার পথে চারজনের একজনের সাথে দেখা হয়ে যায় শারজার। লোকটি শারজাকে বলে, তোমার ভাইয়ের অপহরণে আর বিলম্ব করা ঠিক

নয়। জবাবে শারজা সাফ জানিয়ে দেয়, আমি আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ফেলেছি। ভাই আমার এখানেই থাকবে। লোকটি বলল, তোমার ভাইয়ের যদি মতিভ্রম হয়েই থাকে, তাহলে ওকে আমরা বেঁচে থাকতে দেব না।

চার কুচক্রী জখমীকে এমন সাহসিকতার সাথে অপহরণ করে নিয়ে যাবে, তা ছিল শারজার কল্পনার অতীত। তাই সে ডাক্তারকেও অবহিত করা প্রয়োজন মনে করেনি যে, তার ভাই অপহৃত হওয়ার আশংকা আছে। সে রাতেই শারজা ও ডাক্তার পড়ে যায় চার কুচক্রীর কবলে। অপহরণ করে যখন তাদেরকে ঘোড়ার পিঠে তুলতে নিয়ে যাওয়া হল, তখন শারজা দেখতে পেয়েছিল যে, তার ভাই বসে আছে। ভাই মুক্ত হয়েছে দেখে তখন কিছুটা আনন্দিতও হয়েছিল সে। পলায়নে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল নিজেও। কিন্তু ডাক্তারকে ওদের বন্দী হিসেবে দেখে মেনে নিতে পারেনি শারজা। তাই সে ডাক্তারকে ছেড়ে দিতে অনুরোধও করেছিল। কিন্তু সে অনুরোধ রক্ষা করেনি সন্ত্রাসীরা। হাত-পা বেঁধে ঘোড়ার পিঠে তুলে নেয় তারা ডাক্তারকে। পথে জখমীকে কিভাবে অপহরণ করল সে কাহিনী শোনায় তারা শারজাকে।

ওখানে গিয়েছিল মাত্র দু'জন। পথের কথা জিজ্ঞেস করার নাম করে একজন আলাপে ভুলিয়ে দেয় প্রহরীকে। এই সুযোগে পেছন থেকে প্রহরীর ঘাড় ঝাপটে ধরে ফেলে অপরজন। এবার দু'জনে মিলে তুলে নিয়ে যায় তাকে ভেতরে। তাদের দেখে উঠে বসে জখমী। বিছানা থেকে সরে দাঁড়ায় সে। প্রহরীকে বিছানায় শুইয়ে দেয় সন্ত্রাসীরা। খঞ্জর দ্বারা গভীর দু'টি আঘাত হানে তার হৃদপিন্ডে। মারা যায় প্রহরী। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কম্বল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় প্রহরীর রক্তাক্ত লাশটা। জখমী কয়েদীকে নিয়ে বেরিয়ে যায় দু'জন।

শারজা ডাক্তারের ঘরে আছে, তাও জানা ছিল অপহরণকারীদের। তাদের আশংকা ছিল, শারজা বিষয়টা মেনে নেবে না এবং তাদের এই অপহরণ অভিযানকেও ব্যর্থ করে দেবে। অথচ তাকেও এখান থেকে সরিয়ে ফেলা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, অনেক তথ্য তারও জানা। তাই একস্থানে ওঁৎ পেতে বসে যায় দু'জন। গভীর রাতে ঘর থেকে বের হয়ে ডাক্তার ও শারজা যেই মাত্র অন্ধকার সরু গলিতে প্রবেশ করে, অম্নি পেছন থেকে দু'ব্যক্তির বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় তারা। সফল হয়ে যায় অপহরণ অভিযান।

✿ ✿ ✿

ডাক্তার ও শারজার কথায় পুরোপুরি বিশ্বাস করলেন না আলী বিন সুফিয়ান। তিনি ভাবলেন, এটিও ষড়যন্ত্রের অংশ হতে পারে। তাই তিনি দু'জনকে পৃথক করে ফেললেন। আলাদা আলাদা জিজ্ঞাসাবাদ করেন তাদের। ডাক্তার অতিশয় জ্ঞানী লোক। তিনি আলী বিন সুফিয়ানকে আশ্বস্ত করতে সক্ষম হন যে, তার বক্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তিনি বললেন, আকার-আকৃতিতে মেয়েটিকে আমার এক মৃত বোনের

মত দেখা যায়। তাই আবেগাপ্লুত হয়ে আমি তাকে আমার ঘরে নিয়ে যাই। কয়েকবারই সে আমার ঘরে যায় এবং দীর্ঘ সময় ধরে আমি তার সাথে কথাবার্তা বলি। জখমীর ঘরেও আমি তার সাথে বসে থাকতাম। মেয়েটির প্রতি আমি কখনো কুদৃষ্টিতে তাকাইনি।

ডাক্তার জানায়, আমার এই অমলিন সদাচারে মেয়েটি এতই প্রভাবিত হয়ে পড়ে যে, ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে সে তার মনের কতিপয় সন্দেহ আমার সামনে উপস্থাপন করে। আমি এক এক করে তার সব সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করি। এতে সে আরো প্রভাবিত হয়ে যায়। আমার প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ বেড়ে যায়। মেয়েটি মুসলমান। কিন্তু আমি বুঝলাম, সে দারুণ বিভ্রান্ত। আমি তার সব ভ্রান্তি দূর করে দেই। চিন্তা-চেতনায় ছিল মেয়েটি পশ্চাৎপদ। কুসংস্কারাচ্ছন্ন পল্লী অঞ্চলের মানুষ। তার কথা-বার্তায় আমি বুঝতে পেরেছি যে, তার এলাকায় ইসলাম পরিপন্থী ধ্যান-ধারণা এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী-বিরোধী প্রচারণা জোরে-শোরে বিস্তার লাভ করছে।

শারজার নিকট থেকে কোন জবানবন্দী নেননি আলী বিন সুফিয়ান। তিনি মেয়েটিকে প্রশ্ন করতে থাকেন আর মেয়েটি তার উত্তর প্রদান করে। তার জবাবী বক্তব্যই তার জবানবন্দীর রূপ লাভ করে। ফেরাউনী আমলের পরিত্যক্ত প্রাসাদসমূহ সম্পর্কে সেও সেই বিবরণ প্রদান করে, যা আমরা উপরে বিবৃত করে এসেছি। সেও প্রাসাদের রহস্যময় অদৃশ্য দরবেশের ভক্ত।

শারজা জানায়, তার ভাই সেনাবাহিনীতে চাকরি করত। নিজে ঘরে একা থাকত। গাঁয়ের কতিপয় লোক এই বলে তাকে প্রাসাদে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেয় যে, ওখানকার দরবেশ সুন্দরী কুমারীদের বেশ পছন্দ করেন।

আলী বিন সুফিয়ান কৌশলে তার থেকে এ তথ্যও বের করে আনেন যে, তার গ্রামের তিনটি কুমারী মেয়ে ঐ প্রাসাদে গিয়েছিল। কিন্তু পরে আর ফিরে আসেনি। একবার তার ভাই বাড়ী আসে। শারজা তার নিকট প্রাসাদে যাওয়ার অনুমতি চায়। কিন্তু ভাই তাকে বারণ করে দিয়েছিল। শারজা অবস্থাটা স্পষ্টরূপে ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে না পারলেও আলী বিন সুফিয়ান এতটুকু বুঝে ফেললেন, মিসরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে কি সব হচ্ছে।

ডাক্তার সম্পর্কে শারজা বলে, অপহরণকারীরা যদি তাকে গ্রামে নিয়েও যেত, এমনকি যদি বন্দীশালায় আবদ্ধ করে ফেলত, তবু আমি তাকে মুক্ত করেই ছাড়তাম। কিন্তু যখন আমার ভাই মরে গেল, আমি গ্রামে যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করলাম এবং সংকল্প নিলাম, যে কোন মূল্যে হোক ডাক্তারকে আমি এখান থেকেই মুক্ত করব। চার অপহরণকারীকে সে তার আপন মনে করত। কিন্তু ডাক্তার তাকে জানাল যে, এরা আল্লাহর মস্তবড় দুশমন। শারজা আরো জানতে পেরেছে যে, এরা তার ভাইয়ের সাথে

ভালো আচরণ করেনি। তার কাছে যেসব তথ্য ছিল, তা যেন ফাঁস হয়ে না যায়, সে জন্যেই এদের এতো ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান। উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পর ইচ্ছে করেই এরা তার ভাইকে মেরে ফেলেছে।

আলী বিন সুফিয়ান শারজাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন তুমি কি করতে চাও? নিজের ব্যপারে তুমি কি চিন্তা করছ?' শারজা জবাব দেয়, 'আমি আমার সারাটা জীবন ডাক্তারের চরণে কাটিয়ে দিতে চাই। তিনি যদি আমাকে আগুনে ঝাঁপ দিতে বলেন, আমি তাও করতে প্রস্তুত আছি।' শারজা সম্মতি প্রকাশ করে যে, আপনি যদি ফেরাউনী প্রাসাদে অভিযান প্রেরণ করেন, তাহলে আমি তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব এবং আমার গ্রামের যারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিপক্ষে, তাদের ধরিয়ে দেব।

আলী বিন সুফিয়ানের পরামর্শে সামরিক ও প্রশাসনিক শীর্ষ কর্মকর্তাদের জরুরী বৈঠক তলব করা হয় এবং তকিউদ্দীনকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। সকলের ধারণা ছিল, তকিউদ্দীন মিসরে নতুন এসেছেন। এত বড় গুরুদায়িত্ব তার ঘাড়ে চাপে এই প্রথম। তাই তিনি আপাততঃ ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন না।

বৈঠকে অধিকাংশ কর্মকর্তা অভিন্ন মত পোষণ করলেন যে, যেহেতু এত বিশাল একটি এলাকার এতগুলো মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, সেহেতু আপাততঃ তাদের বিরুদ্ধে কোন সামরিক অভিযান পরিচালনা করা ঠিক হবে না। প্রাসাদের অভ্যন্তরের যে পরিস্থিতি জানা গেছে, তাতে প্রতীয়মান হয় যে, সেখান থেকে যে একটি নতুন বিশ্বাস আত্মপ্রকাশ করেছে, জনগণ তা বরণ করে নিয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ তাদের এই উপাসনালয় ও বিশ্বাসের উপর আমাদের এই সামরিক অভিযান সহ্য করবে না। তার পরিবর্তে বরং সেখানে কিছু মুবাল্লিগ প্রেরণ করা হোক। দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে লোকদের সঠিক পথে আনার চেষ্টা করলে ভালো ফল হবে আশা করা যায়। বৈঠকে একটি পরামর্শ এই দেয়া হয় যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে এই পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে তাঁর মতামত নিয়ে অভিযান পরিচালনা করা হোক।

'তার মানে আপনারা মানুষকে ভয় পাচ্ছেন! আপনাদের মনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভয় নেই, যাদের সত্য ধর্মের অবমাননা করা হচ্ছে। আমার প্রথম কথা হচ্ছে, মিসরের বর্তমান পরিস্থিতির সংবাদ ঘুণাক্ষরে আমীরে মেসেরের কানে দেয়া যাবে না। আপনারা কি জানেন না যে, তিনি কেমন শক্তিশালী দুশমনের মোকাবেলায় মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছেন? আপনারা কি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে একথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, দু'চার হাজার দেশদ্রোহী পাপিষ্ঠকে আমরা ভয় পাচ্ছি? আমি সরাসরি এবং কঠিন অভিযান পরিচালনা করতে চাই।' জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন তকিউদ্দীন।

'গোস্তাখী মাফ করবেন মুহতারাম আমীর! খৃস্টানরা আমাদের বিরুদ্ধে অপবাদ

আরোপ করছে যে, ইসলাম তরবারির জোরে বিস্তার লাভ করেছে। আমরা কাজে-কর্মে এ অপবাদের প্রতিবাদ করতে চাই। আমরা তাদের কাছে স্নেহ-ভালোবাসার বার্তা নিয়ে যেতে চাই।' বললেন এক নায়েব সালার।

'তা-ই যদি হয়, তাহলে কোমরে তরবারী ঝুলিয়ে রেখেছ কেন? এতো টাকা ব্যয় করে সেনাবাহিনী পুষছই বা কেন? তার চে' বরং এটা উত্তম নয় কি যে, তোমরা সেনাবাহিনী বিলুপ্ত করে দিয়ে অস্ত্রগুলো সব নীল নদে ফেলে দিয়ে দাওয়াত-তাবলীগের মিশন নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে গাশ্‌ত কর, দরবেশের ন্যায় গ্রামে-গ্রামে, পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে বেড়াও।' তিরস্কারের সুরে বললেন তকিউদ্দীন। বলতে বলতে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেন তিনি। তিনি বললেন–

'রাসূলে খোদার পয়গামের বিরুদ্ধে যদি ক্রুশের তরবারী উত্তোলিত হয়, তাহলে ইসলামের তরবারীও কোষবদ্ধ থাকবে না। আর ইসলামের তরবারী যখন কোষমুক্ত হবে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) দুশমনদের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করবে। ইসলামের সত্য-সঠিক বাণীকে যারা অস্বীকার করবে, তাদের জিহ্বা কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। খৃস্টানরা যদি এই অপবাদ আরোপ করে থাকে যে, ইসলাম তরবারীর জোরে বিস্তার লাভ করেছে, তাহলে আমি তাদের নিকট এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে প্রস্তুত নই। আপনারা কি জানেন, সালতানাতে ইসলামিয়া কেন দিন দিন অধঃপাতে যাচ্ছে? বলতে পারেন, স্বয়ং মুসলমান কেন ইসলামের দুশমনে পরিণত হচ্ছে? তার একমাত্র কারণ, খৃস্টানরা মদ, নারী, অর্থ আর ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে ইসলামের তরবারীতে জং ধরিয়ে রেখেছে। তারা আমাদের উপর যুদ্ধপ্রিয়তা ও জুলুমের অভিযোগ আরোপ করে আমাদের সামরিক শক্তিকে নিঃশেষ করে দিতে চায়। আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মুরোদ তাদের নেই। তাদের স্থলবাহিনী-নৌবহর সব ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে তারা নাশকতামূলক অভিযান পরিচালনা করছে। আল্লাহর সত্য দ্বীনে কুঠারাঘাত করছে। আর আপনারা কিনা ওদের উপর অস্ত্রধারণ করতে বারণ করছেন।'

'মনোযোগ দিয়ে শুনুন বন্ধুগণ! খৃস্টান ও আমাদের অন্যান্য দুশমনরা ভালোবাসার প্রলোভন দেখিয়ে আমাদের হাত থেকে তরবারী ছিনিয়ে নিতে চায়। তারা চায় আমাদের পিঠে আঘাত হানতে।'কেউ তোমার এক গালে চড় মারলে অপর গালটাও এগিয়ে দাও' তাদের এই নীতি প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। কার্কের মুসলমানদের সাথে তারা কি নির্মম আচরণ করেছে, তাতো আপনাদের অজানা নয়। শোবক দুর্গ জয় করার পর আপনারা কি সেখানকার বেগার ক্যাম্পের করুণ দৃশ্য দেখেননি? সেখানকার মুসলিম নারীদের সম্ভ্রম নিয়ে তারা যে ছিনিমিনি খেলা খেলেছিল, তা কি আপনারা শুনেননি? অধিকৃত ফিলিস্তীনের মুসলমানরা চরম ভয়-উৎকণ্ঠা, অপমান ও নির্যাতনের মধ্যে জীবন-যাপন করছে। খৃস্টানরা লুণ্ঠন করছে মুসলমানদের কাফেলা,

অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে মুসলিম নারীদের। আর আপনারা কিনা বলছেন, ইসলামের নামে অস্ত্রধারণ করা অন্যায়। এমন পরিস্থিতিতে ইসলামের নামে অস্ত্রধারণ করা যদি অন্যায়ই হয়ে থাকে, তাহলে আমি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করছি, এই অপরাধে আমি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নই। খৃস্টানদের তরবারী নিরস্ত্র মুসলমানদের উপর আঘাত হানছে। তাদের একমাত্র অপরাধ তারা মুসলমান। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) কথা বলে। তারা ক্রুশ ও প্রতিমার পূজারী নয়। আপনাদের তরবারী হাত থেকে খসে পড়বে তখন, যখন আপনাদের সম্মুখের লোকটি হবে নিরস্ত্র এবং তার কাছে ইসলামের পয়গাম পৌঁছেনি। এই যে কে যেন বললেন 'মানুষের চেতনার উপর আঘাত করা ঠিক নয়'। আমি এই মতের সমর্থন করি না। আমি দেখেছি যে, আরব রাজ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম শাসক ও অযোগ্য নেতৃবর্গ সাধারণ লোকদের সন্তুষ্ট করার জন্য তোষামোদমূলক কথা বলে থাকে। জনগণকে তাদের খেয়াল-খুশি মত চলার সুযোগ দিয়ে নিজেরা ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকে। তারা নিজেদের চারপাশে এমন কিছু চাটুকার জুড়িয়ে নিয়েছে, যারা তাদের সব কথায় 'জ্বী হুজুর' এর নীতি পালন করে এবং প্রজাদের মধ্যে ঘুরে-ফিরে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, আমাদের শাসকবর্গ যা কিছু বলছেন ও করছেন, সবই ঠিক। এর ফল কি হল? আল্লাহর বান্দাগণ দুশ্চরিত্র বিলাসী লোকদের গোলামে পরিণত হতে চলেছে। জাতি শাসক ও শাসিতে বিভক্ত হতে চলেছে।

আমি দেখতে পাচ্ছি যে, দুশমন আমাদের মূলোৎপাটন করছে এবং আমাদের জাতির একটি অংশকে কুফ্‌রের অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় আমরা যদি কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ না করি, তবে তার অর্থ হবে, আমরাও কুফরকে সমর্থন করছি। আমার ভাই সুলতান সালাহুদ্দীন বলেছিলেন, গাদ্দারী আমাদের রীতিতে পরিণত হতে চলেছে। আর আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের মধ্যে আরও একটি রীতি এই চালু হতে যাচ্ছে যে, জাতির একটি গোষ্ঠী শাসন করবে আর অন্যরা শাসিত হবে। শাসক গোষ্ঠীটি জনগণের সম্পদকে মদের স্রোতে ভাসিয়ে দেবে আর জনগণ এক ঢোক পানিও পান করতে পারবে না। আমার ভাই ঠিকই বলেছেন যে, আমাদের জাতি ও ধর্মের ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। আমাদের জনগণের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ ও সচ্চরিত্রতা সৃষ্টি করতে হবে। এর জন্যে আমাদের কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে হবে। এই সঠিক পদক্ষেপ জাতির গুটিকতক মানুষের জন্য ক্ষতিকর হলেও পরোয়া করা যাবে না। জাতির গুটিকতক মানুষের জন্য আমরা গোটা জাতির মর্যাদাকে বিসর্জন দিতে পারি না। জাতির একটি অংশকে আমরা কেবল এই জন্য দুশমনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের হাতে সোপর্দ করতে পারি না যে, সেখানকার মানুষের চেতনায় আঘাত আসবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, সেখানকার মানুষগুলো সরল-সহজ ও অশিক্ষিত। তাদের সমাজপতিরা দুশমনের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করছে।'

সভাসদদের কারুর এই কল্পনাও ছিল না যে, তকিউদ্দীনের দৃষ্টিভঙ্গি এত কঠোর। তার সিদ্ধান্ত এত কঠিন হবে। তার উপস্থাপিত যুক্তি-প্রমাণের বিরুদ্ধে কেউ টু-শব্দটি করার সাহস পেলেন না। তিনি বললেন, 'মিসরে এখন যে বাহিনী আছে. তারা যুদ্ধফেরত সৈনিক। এর আগেও তারা লড়াই করেছে। এ বাহিনীর পাঁচশ' অশ্বারোহী, দুইশ' উষ্ট্রারোহী এবং পাঁচশ' পদাতিক সৈন্য আজ সন্ধ্যায় সেই অঞ্চল অভিমুখে রওনা করিয়ে দিন। এই বাহিনী সন্দেহজনক প্রাসাদ থেকে এতটুকু ব্যবধানে অবস্থান করবে যে, প্রয়োজনে যেন সাথে সাথে তারা প্রাসাদ অবরোধ করে ফেলতে পারে। আমার সাথে দামেশ্‌ক থেকে যে দু'শ' সাওয়ার এসেছে, তারা এলাকায় প্রবেশ করে প্রাসাদের উপর আক্রমণ চালাবে। একটি কমান্ডো দল প্রাসাদের অভ্যন্তরে ঢুকে যাবে। দু'শ' অশ্বারোহী প্রাসাদ অবরোধ করে রাখবে। যদি বাইরে থেকে আক্রমণ আসে কিংবা যদি সংঘাত হয়, তাহলে বাহিনীর বড় অংশটি তার মোকাবেলা করবে এবং অবরোধ সংকীর্ণ করতে থাকবে। এই অভিযানে বাহিনীকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়ে রাখবে, যেন তারা কোন নিরস্ত্রের উপর আঘাত না করে।'

তকিউদ্দীন এ সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরপরই সেনাকর্মকর্তাগণ বাহিনীর রওনা হওয়া, আক্রমণ ও অবরোধ প্রভৃতির পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

❁ ❁ ❁

মিসরের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে অবহিত নন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। কার্ক ও শোবকের মধ্যবর্তী এলাকার মাইলের পর মাইল বিস্তৃত মরু অঞ্চলে খৃস্টানদের নয়া যুদ্ধ পরিকল্পনা মোতাবেক নিজের বাহিনীকে প্রস্তুত ও বিন্যস্ত করছেন তিনি। গুপ্তচররা তাকে রিপোর্ট দিয়েছিল যে, দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে খৃস্টানরা দুর্গের বাইরে এসে আক্রমণ চালাবে। তাদের এ বাহিনীর সৈন্যরা থাকবে অধিকাংশ বর্মপরিহিত। তারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনীকে মুখোমুখী লড়াইয়ে বাধ্য করার চেষ্টা করবে। একদল হামলা চালাবে পেছন দিক থেকে।

নিজের বাহিনীকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তিনি সর্বপ্রথম যে কাজটি করলেন, তাহল, যে ক'টি স্থানে পানি ও গাছ-গাছালি ছিল, তার সব ক'টি এলাকা তিনি দখলে নিয়ে নেন। জায়গাগুলোর নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখার জন্য তিনি বড় বড় ধনুকধারী তীরান্দাজদের সেসব স্থানে পাঠিয়ে দেন। স্থাপন করলেন অগ্নিগোলা নিক্ষেপকারী মিনজানিক। এসব আয়োজনের উদ্দেশ্য, যাতে শত্রু কাছে আসতে না পারে। আশপাশের উচুঁ জায়গাগুলোও দখল করে নেন তিনি। সব ক'টি বাহিনীকে তিনি নির্দেশ দেন, দুশমন যদি সম্মুখ দিক হতে হামলা করে, তাহলে যেন তারা আরো ছড়িয়ে পড়ে, যাতে দুশমনও বিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য হয়। তিনি তার সৈন্যদের এমনভাবে বিন্যস্ত করলেন যে, দুশমন বুঝতেই পারেনি, মুসলিম বাহিনীর পার্শ্ব কোন দিক্ আর পেছন কোন্ দিক।

বাহিনীর বড় একটা অংশ রিজার্ভ রেখে দেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। একটা অংশকে তিনি এমনভাবে তৎপর রাখেন যে, প্রয়োজন হলেই যেন তারা সাহায্যের জন্য যথাস্থানে পৌঁছুতে পারে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হল কমান্ডো বাহিনী। তদপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা বিভাগ, যারা খৃস্টানদের যে কোন তৎপরতার সংবাদ পৌঁছিয়ে দেবে সুলতানের কাছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী শোবক দুর্গ জয় করে নিয়েছেন আগেই। খৃস্টানদের পরিকল্পনার একটি ছিল এই যে, পরিস্থিতি অনুকুলে এসে গেলে অবরোধ করে তারা শোবক পুনর্দখল করবে। তাদের আশা ছিল, তাদের এই বিপুল সৈন্য সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর স্বল্পসংখ্যক সৈন্যকে মরুভূমির তপ্ত বালুতেই নিঃশেষ করে ফেলতে কিংবা এতটুকু দুর্বল করে দিতে সক্ষম হবে যে, তারা বাইরে থেকে শোবককে সাহায্য দিতে পারবে না।

তাদের এই পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী শোবকের সেই দিকটিকে শূন্য করে ফেলেন, যেদিক থেকে খৃস্টানরা দুর্গের উপর আক্রমণ করার সম্ভাবনা আছে। পথ পরিস্কার দেখে খৃস্টানরা যাতে শোবক আক্রমণে এগিয়ে আসে, তার জন্য সুযোগ করে দেন সুলতান। সেদিক থেকে তিনি পর্যবেক্ষণ চৌকিগুলোও প্রত্যাহার করে নেন এবং দূর-দূরান্ত পর্যন্ত এলাকা খালি করে দেন।

খৃস্টান গুপ্তচররা সাথে সাথে কার্কে সংবাদ পৌঁছিয়ে দেয় যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী খৃস্টানদের সাথে লড়াই করতে তার বাহিনীকে শোবক থেকে দূরে এক স্থানে সমবেত করেছে এবং শোবকের রাস্তা খালি করে দিয়েছে। এই সংবাদ পেয়ে খৃস্টানরা তাদের বাহিনীকে– যাদেরকে সুলতান আইউবীর উপর সম্মুখ থেকে আক্রমণ পরিচালনা করার জন্য রওনা করা হয়েছিল– নির্দেশ প্রদান করে, যেন তারা গতি পরিবর্তন করে শোবকের দিকে চলে যায়। নির্দেশমত বাহিনীটি শোবকের পথ ধরে অগ্রসর হতে শুরু করে। তাদের পেছনে পেছনে আসছে বিপুল রসদবাহী কাফেলা। শোবকের চার মাইল দূরে থাকতেই কাফেলা যাত্রাবিরতি দেয় এবং অস্থায়ী ছাউনী ফেলে সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করে। রসদবাহী হাজার হাজার ঘোড়া-গাড়ী ও উট-খচ্চর এখনো এসে পৌঁছায়নি। কোন শংকা নেই তাদের মনে। কারণ, দূর-দূরান্ত পর্যন্ত মুসলিম বাহিনীর নাম-চিহ্নও দেখছে না তারা।

আনন্দে উৎফুল্ল খৃস্টান সম্রাটগণ। শোবক দুর্গকে তারা তাদের পদানত দেখছে। কিন্তু রাতে পাঁচ-ছয় মাইল দূরের আকাশটা হঠাৎ লাল হয়ে গেছে দেখতে পায় তারা। একদিক থেকে ছুটে গিয়ে আকাশ লাল করে অপর একদিকে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে অসংখ্য অগ্নিশিখা। কি হল দেখে আসার জন্য অশ্বারোহী ছুটায় খৃস্টানরা। তাদের রসদবাহী কাফেলা শেষ হয়ে গেছে সব। ঘটনাস্থলে পৌঁছে অশ্বারোহী দলটি দেখতে

পায়, লাগামহীন ঘোড়া আর দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য উট-খচ্চরগুলো ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করছে মরুভূমিতে।

এ ধ্বংসযজ্ঞ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর একটি কমান্ডো বাহিনীর কৃতিত্ব। খৃস্টানদের রসদের মধ্যে ঘোড়ার খাদ্য হিসেবে শুকনো খড় বোঝাই ছিল অসংখ্য ঘোড়াগাড়ী। রসদ-ক্যাম্পে চারদিকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল সেগুলো। খৃস্টানদের মুখে বিজয়ের আগাম হাসি। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের উপর যে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সতর্ক দৃষ্টি বিদ্যমান, সে খবর তাদের নেই। রাতে যখন রসদ ক্যাম্পের সবাই নিশ্চিন্ত ঘুমিয়ে পড়ে, তখন এই মুসলিম কমান্ডো বাহিনীটি শুকনো ঘাসের উপর আগুনের সলিতা বাঁধা তীর ছুড়ে। সাথে সাথে ঘাসে দাউ দাউ করে আগুন ধরে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের বেষ্টনীতে পড়ে যায় গোটা ক্যাম্প। অবরুদ্ধ মানুষগুলো প্রাণরক্ষা করার উদ্দেশ্যে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করতে শুরু করলে তাদের উদ্দেশ্যে তীর ছুড়ে কমান্ডো সেনারা। যেসব পশু রশি ছিঁড়ে পালাতে সক্ষম হয়, সেগুলো প্রাণে বেঁচে যায়। আর যারা রশি ছিঁড়তে পারেনি, সেগুলো জীবন্ত পুড়ে ছাই হয়ে যায়। জাহান্নামে পরিণত হয় বিশাল ক্যাম্পটি। সম্ভব পরিমাণ উট-ঘোড়া ধরে নিয়ে পালিয়ে যায় কমান্ডোরা।

ভোরবেলা রসদ-ক্যাম্প পরিদর্শন করে খৃস্টান কমান্ডোরা। কিছুই নেই, জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সব। ধ্বংস হয়ে গেছে তাদের এক মাসের রসদ। তারা বুঝে ফেলে, শোবকের পথ পরিষ্কার থাকা ছিল সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর একটি কৌশল। কার্ক থেকে শোবক পর্যন্ত পথটা তাদের জন্য মোটেও নিরাপদ নয়, তাও বুঝে ফেলে তারা। তাই তারা শোবক অবরোধের পরিকল্পনা মুলতবী করে দেয়। রসদ ছাড়া দুর্গ অবরোধ ছিল অসম্ভব। আর যখন তারা সংবাদ পেল যে, গত রাতে তাদের সেই বাহিনীর রসদও ধ্বংস হয়ে গেছে ,যারা আইউবীর বাহিনীর উপর সম্মুখ থেকে আক্রমণ করতে যাচ্ছিল, তখন তারা পুরো পরিকল্পনাই পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন অনুভব করে। কোথাও সুলতান বাহিনীর কোন সৈন্য চোখে পড়ছিল না তাদের। তাদের গুপ্তচররাও জানাতে পারেনি যে, সুলতানের সৈন্য সমাবেশ কোথায়। মূলত ছিলও না কোথাও।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সংবাদ পান, উভয় যুদ্ধক্ষেত্রেই খৃস্টানরা তাদের অগ্রযাত্রা স্থগিত করে দিয়েছে। তিনি তাঁর কমান্ডারকে ডেকে বললেন, 'খৃস্টানরা যুদ্ধ মুলতবী করে দিয়েছে, কিন্তু আমাদের যুদ্ধ বন্ধ হবে না। তারা যুদ্ধ মনে করে দু'বাহিনীর মুখোমুখি সংঘাতকে। আর আমাদের যুদ্ধ হল কমান্ডো আর গেরিলা আক্রমণ। এখন গেরিলা বাহিনীকে তৎপর রাখ। খৃস্টানরা উভয়দিক থেকেই পেছনে সরে যাচ্ছে। তাদেরকে তোমরা শান্তিতে কেটে পড়তে দিও না। পেছন থেকে, পার্শ্ব

থেকে কমান্ডো হামলা চালাও। খৃস্টানরা আমাদেরকে মুখোমুখি নিয়ে লড়াই করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তাদেরকে আমার পছন্দসই এমন জায়গায় মুখোমুখি নিয়ে আসব, যেখানে বালুকণাটিও আমাদের সহযোগিতা করবে।' সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর কোন ঠিকানা নেই। আমলা-রক্ষীবাহিনীর সাথে তিনিও যাযাবর। কোন এক স্থানে স্থির থাকছেন না বলে মনে হচ্ছে। সব জায়গায়ই আছেন তিনি।

❁ ❁ ❁

মিসরে খৃস্টানদের অপর যুদ্ধক্ষেত্রের উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ভাই তকিউদ্দীন। এটি মিসরের দক্ষিণ-পশ্চিমের পার্বত্য এলাকার ফেরাউনী আমলের সেইসব ভয়ংকর প্রাসাদ, যেখানে হযরত ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন বলে মানুষের বিশ্বাস। নতুন এক বিশ্বাসের অনুসারী হয়ে গিয়েছিল যে এলাকার সব মানুষ।

এক বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যাবেলা। শতশত দর্শনার্থী গুহাসদৃশ দরজা অতিক্রম করে প্রবেশ করছে প্রাসাদের ভিতরে। ভেতরের বৃহৎ কক্ষটিতে গুঞ্জরিত হচ্ছে রহস্যময় কণ্ঠস্বর। নেক-বদ নির্বিশেষে সব মানুষই বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায় ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে। হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় রহস্যময় সেই দরবেশের কণ্ঠস্বর, যার ব্যাপারে জনশ্রুতি ছিল যে, বদকার মানুষ তার সাক্ষাৎ পায় না। তার স্থলে ভেসে এল আরেকটি কণ্ঠস্বর– 'লোক সকল! আজ রাতে তোমরা কেউ ঘরে যেও না। কাল সকালে তোমাদের সম্মুখে সেই রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে, যার জন্য তোমরা উদগ্রীব হয়ে আছ। এক্ষুণি তোমরা এখান থেকে বের হয়ে যাও। হযরত ঈসা (আঃ) আগমন করছেন। এ প্রাসাদ থেকে বের হয়ে দূরে কোথাও গিয়ে তোমরা শুয়ে পড়।'

ইতিপূর্বে বড় কক্ষের দেয়ালে যেসব উজ্জ্বল তারকা ভেসে উঠত, আজ তা মন্দীভূত। দৃশ্যে যেসব রূপসী তরুণী আর সুদর্শন পুরুষ হেসে-খেলে ভেসে বেড়াত, এবার দেখা গেল সিপাহীর মত একদল মানুষ তাদের ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। চিৎকারের শব্দও ভেসে আসছে মাঝে-মধ্যে। বন্ধ হয়ে গেছে মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের চমক। এলাকাবাসীর চোখে যে স্থানটি ছিল অতিশয় পবিত্র, সেটি এখন ভয়ংকর এক স্বপ্নপুরী। ভয়ার্ত মানুষগুলো অল্পক্ষণের মধ্যে হুড়মুড় করে বেরিয়ে যায়। শূন্য হয়ে যায় প্রাসাদ।

এ বিপ্লব সাধন করেছেন তকিউদ্দীন ও আলী বিন সুফিয়ান। তকিউদ্দীনের প্রেরিত সৈন্যরা সন্ধ্যার পর গিয়েছিল পার্বত্য এলাকার সন্নিকটে। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে শারজা। শারজা অশ্বারোহী। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সৈন্যদের পার্বত্য এলাকায় নিয়ে আসে মেয়েটি। প্রতি সপ্তাহে এইবারে এখানে মেলা বসে এবং দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন ছুটে আসে। বাহিনীর বড় অংশটিকে– যাতে আছে দু'শ' অশ্বারোহী, দু'শ' উষ্ট্রারোহী আর পাঁচশ' পদাতিক– দাঁড় করিয়ে রাখা হয় খানিক দূরে। সুদানের

সীমান্তের উপর নজর রাখা তাদের দায়িত্ব। অসামরিক লোকদের উপর আক্রমণ করতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে তাদের। প্রাসাদের নাশকতামূলক তৎপরতা যেহেতু পরিচালিত হচ্ছিল খৃস্টান ও সুদানীদের পৃষ্ঠপোষকতায়, তাই সেখানে সামরিক অভিযান পরিচালিত হলে সুদানীদের পক্ষ থেকে হামলা আসার আশংকা ছিল প্রবল।

তকিউদ্দীনের সাথে দামেশ্ক থেকে এসেছিল বাছা বাছা দু'শ' দু'সাহসী অশ্বারোহী। ধাবমান ঘোড়ার পিঠ থেকে লক্ষ্যভেদী তীর নিক্ষেপ করা তাদের একটি বিশেষ গুণ। পদাতিক বাহিনীতে আছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নিজ হাতে গড়া বেশকিছু দুর্ধর্ষ কমান্ডো। তাদের এমন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল যে, অতীব দুর্গম টিলা-পর্বত ও বিশাল বিশাল গাছে অবলীলায় উঠানামা করতে পারে তারা। কয়েক গজ বিস্তৃত জ্বলন্ত আগুনের মধ্যদিয়ে আক্রমণ করা তাদের জন্য সাধারণ ব্যাপার।

দর্শনার্থীরা যখন দলে দলে প্রাসাদে প্রবেশ করছিল, ঠিক তখন প্রাসাদ অভিমুখে রওনা করা হয় এই জানবাজ কমান্ডোদের। সে পর্যন্ত নিয়ে যায় তাদের শারজা। সাথে তাদের আলী বিন সুফিয়ান। সাথে আছে তাদের দ্রুতগামী দূত, যাতে বার্তা পৌঁছাতে সময় না লাগে। প্রাসাদের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন লোক। ভেতরে গমনকারীদের তিনটি করে খেজুর আর পানি খাওয়াচ্ছে তারা। দরজা অতিক্রম করে ভেতরে প্রবেশ করলেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাইরে জ্বলছে ক্ষীণ আলোর একটি প্রদীপ।

দর্শনার্থীদের সাথে প্রাসাদের ফটকের নিকট পৌঁছে যায় ছয়জন লোক। সবার মাথা চাদর দিয়ে ঢাকা। ভেতরে গমনকারীদের খেজুর খাওয়াচ্ছে যে চারজন, ভিড় এড়িয়ে তাদের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায় তারা। তাদেরকে সম্মুখ দিয়ে যেতে বলা হয়; কিন্তু কারো কথায় কর্ণপাত নেই তাদের। উল্টো দু'জনের পিঠে খঞ্জরের আগা ঠেকিয়ে কানে কানে বলে, 'বাঁচতে হলে এখান থেকে সরে যাও। এ মুহূর্তে তোমরা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ঘেরাওয়ে রয়েছ।' তারা ছয়জন কমান্ডো সদস্য।

টু-শব্দটি না করে সরে যায় লোক দু'জন। উপস্থিত জনতাকে না দেখিয়ে নিজ নিজ চোগার পকেটে খঞ্জরগুলো লুকিয়ে ফেলে কমান্ডোরা। বাইরে ছদ্মবেশে দাঁড়িয়ে আছে আরো দশ-বারোজন কমান্ডো। ছয় কমান্ডোর হুমকির মুখে চার ব্যক্তি যেইমাত্র বাইরে বেরিয়ে আসে, অমনি তাদের ঘিরে ফেলে ছদ্মবেশী দশ-বারোজনের কমান্ডো দলটি। কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে তাদের টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যায় দূরে। সেখানে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলা হয় তাদের। খেজুরের স্তূপ ও পানির মশকের নিকট দণ্ডায়মান ছয় কমান্ডো ভেতরে গমনকারী জনতাকে বলতে শুরু করে, আপনারা আজ খেজুর-পানি ছাড়াই ভেতরে ঢুকে পড়ুন। ভেতর থেকে নতুন পয়গাম এসেছে। কোন উচ্চবাচ্য না করে জনতা ভেতরে প্রবেশ করতে শুরু করে।

এবার আম-জনতার সাথে কমান্ডো সদস্যও ভেতরে ঢুকতে শুরু করে। ঢুকছে

বাতি-প্রদীপ। অন্তত পঞ্চাশটি বাতি ও দু'শ' কমান্ডো ভেতরে ঢুকে যায়। আলোকিত কক্ষে না গিয়ে তারা চলে যায় অন্ধকার সরুপথ ও ছোট কক্ষে- বাইরের মানুষ যেখানে ইতিপূর্বে যায়নি কখনো। তাদের কারো কাছে খঞ্জর, কারো নিকট তরবারী, কারো হাতে ছোট ছোট তীর-ধনুক। যে পথে জনতা বাইরে বের হত, সে পথেও ঢুকে পড়ে কমান্ডোরা। নির্দেশনা মোতাবেক আঁকাবাঁকা সরু গলিপথে ঢুকে পড়ে তারা।

সম্মুখে এগিয়ে আসে তকিউদ্দীনের দু'শ' অশ্বারোহী। তারা প্রাসাদ এলাকাটি ঘিরে ফেলে। পদাতিক বাহিনীও আছে তাদের সাথে। ভেতর থেকে বহির্গমনকারীদের একদিকে একত্রিত করতে শুরু করে তারা। মশালধারীদের পেছনে পেছনে ভিতরে প্রবেশ করার পর কমান্ডোদের কাছে মনে হল, যেন তারা কারো উদরে চলে এসেছে। সরুপথ অতিক্রম করে করে তারা এমন এক স্থানে গিয়ে উপনীত হয়, সেখানকার দৃশ্য দেখে কমান্ডোরা থমকে দাঁড়ায়।

একটি খোলামেলা কক্ষ। ছাদটি বেশ উঁচু। ভেতরে অনেক নারী আর পুরুষ। তাদের কারো কারো চেহারা বাঘের ন্যায় ভয়ংকর। অনেকের চেহারা এতই বীভৎস ও ভয়ংকর যে, দেখলে ভয়ে দেহের লোম দাঁড়িয়ে যায়। দেখতে তাদের জিন-ভূতের ন্যায় মনে হয়। তাদের মাঝে চকমকে পোশাক পরিহিত কিছু সুন্দরী যুবতী হাসছে-খেলছে। একদিকে দেয়ালের সাথে কয়েকটি রূপসী মেয়ে কয়েকজন সুদর্শন পুরুষের সাথে ঠাঁট করে হেঁটে যাচ্ছে। অপরদিকে ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত দীর্ঘ একটি পর্দা ঝুলে আছে। পর্দাটা ডানে-বাঁয়ে নড়াচড়া করছে এবং একবার খুলে যাচ্ছে আবার বন্ধ হচ্ছে। আরেক দিকে চোখ ঝলসানো আলো জ্বলছে আর নিভছে।

কমান্ডোদের যদি নিশ্চিতভাবে জানানো না হত যে, প্রাসাদে যাকেই দেখবে, যেমন আকৃতিই চোখে পড়বে, সকলেই মানুষ এবং সেখানে ভূত-প্রেত বলতে কিছু নেই; তাহলে ভয়ে তারা সেখান থেকে নির্ঘাত পালিয়ে যেত। সেখানকার সুন্দরী মেয়ে আর সুদর্শন পুরুষগুলোও ভয়ংকর বলে মনে হচ্ছিল তাদের কাছে। কমান্ডোদের দেখে অদ্ভুত এই প্রাণীগুলো ভীতি সৃষ্টির জন্য ভয়ংকর শব্দ করতে শুরু করে দিয়েছিল। বাঘের চেহারার বীভৎস লোকগুলোর শব্দ ছিল বেশী ভীতিকর। এ সময়ে সম্ভবত ভয়ে দু'তিনজন লোক তাদের মুখোশ খুলে ফেলে। তাদের চেহারা ছিল বাঘের ন্যায়। ব্যাঘ্রের মুখোশ খুলে ফেলার পর ভেতর থেকে আসল মানবাকৃতি বেরিয়ে আসে তাদের।

কমান্ডোরা ঘিরে ধরে ফেলে তাদের সকলকে। মুখোশ খুলে ফেলে সব ক'জনের। নিয়ে যাওয়া হল বাইরে।

অনুসন্ধান চালানো হল প্রাসাদের অন্যত্র। পাকড়াও করা হল এক ব্যক্তিকে। লোকটি একটি সরু সুড়ঙ্গের মুখে মুখ রেখে বলছে, 'তোমরা গুনাহ থেকে তওবা

কর। হযরত ঈসা (আঃ) এসে গেছেন বলে...।' এ সুড়ঙ্গ পথটি এঁকেবেঁকে চলে গেছে সেই আলোকময় কক্ষে যেখানে দর্শনার্থীদের এসব রহস্যময় ভয়ংকর ও সুদর্শন দৃশ্যাবলী প্রদর্শন করে লোকদের অভিভূত করা হয়। লোকটিকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে কমান্ডো বাহিনীর এক কমান্ডার সুড়ঙ্গে মুখ রেখে বলে, 'লোক সকল! আজ রাতে তোমরা ঘরে ফিরো না। কাল সকালে তোমাদের সামনে সেই রহস্য উন্মোচিত হবে, তোমরা যার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছ।'

কমান্ডোদের সাথে সংঘাতে আসেনি প্রাসাদের কেউ। কমান্ডোদের খঞ্জর ও তরবারীর সামনে গ্রেফতারির জন্য নিজেদের সমর্পণ করে একে একে সকলে। গ্রেফতারকৃতদের নির্দেশনা মোতাবেক কমান্ডোরা সেসব জায়গায় পৌঁছে যায়, যেখানে বিজলীর ন্যায় উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা ছিল। ছিমছাম নিরাপদ একটি স্থানে কতগুলো বাতি জ্বলছে। বাতিগুলোর পেছনে কতগুলো কাঠের তক্তা। তক্তাগুলো শীশার মত পাত করা। এই শীশার চমকই মানুষের চোখে গিয়ে পড়ত। কক্ষটিকে অন্ধকার করার জন্য বাতিগুলো নিয়ে যাওয়া হত পেছনে। একদিকে ঝুলানো অনেকগুলো পর্দা। পর্দাগুলোর স্থানে স্থানে শীশার টুকরো আটকানো। এগুলোতে আলো পড়লেই ঝলমল করে উঠতো তারকার ন্যায়। তাছাড়া পর্দাগুলোর রঙও এমন যে, কারো বলার সাধ্য ছিল না যে এগুলো কাপড়। দেখলে মনে হয় ফাটা দেয়াল। বিবেকসম্পন্ন লোকদের কাছে এসব বিস্ময়কর কিছু নয়। এসব হল আলোর জাদু, যা সম্মোহিত করে ফেলত মানুষদের। কিন্তু যে-ই ভেতরে প্রবেশ করত, তার হুঁশ-জ্ঞান তার নিজের আয়ত্বে থাকত না। ভেতরে প্রবেশ করার সময় লোকদের যে খেজুর-পানি খাওয়ানো হত, তাতে নেশাকর মিশ্রণ থাকত। খাওয়ার পর সাথে সাথে তার ক্রিয়া শুরু হয়ে যেত। ফলে দর্শনার্থীদের মন-মস্তিষ্কে যে ধারণা এবং কানে যে শব্দই দেয়া হত, তাদের কাছে তা শতভাগ সঠিক বলে মনে হত। সে নেশার প্রতিক্রিয়ায়ই মানুষ বাইরে বের হয়ে পুনরায় প্রাসাদের ভেতরে প্রবেশ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে যেত। তারা জানত না যে, এটি তাদের বিশ্বাসের ক্রিয়া নয়; এটি সেই নেশার ক্রিয়া, যা তাদের খেজুর ও পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো হত।

খেজুরের স্তূপ আর পানির মশকগুলোও কব্জা করে নেয় কমান্ডোরা। ধর-পাকড় অব্যাহত থাকে ভেতরে। বাইরে সমগ্র প্রাসাদ এলাকাটি অবরোধ করে আছে দু'শ' সৈন্য। সর্বত্র মশালের আলো। ফৌজের বৃহৎ অংশটি এবং দু'টি সীমান্ত ইউনিট টহল দিচ্ছে সুদানের সীমান্ত এলাকায়।

রাত কেটে গেছে। সুদানের দিক থেকে কোন হামলা আসেনি। সংঘাত হয়নি প্রাসাদেও। সর্বত্র ভীত-সন্ত্রস্ত এলাকাবাসীর ভীড়। রাতে এদিক-ওদিক ঘুমিয়েছিল অনেকে। তাদের অবরোধ করে রেখেছে অশ্বারোহী বাহিনী।

❁❁❁

কিছূক্ষণ পর একস্থানে একত্রিত করে বসিয়ে দেয়া হয় জনতাকে। সংখ্যায় তারা তিন থেকে চার হাজার। একদিক থেকে এক পাল লোককে হাঁকিয়ে নিয়ে আসে সেনারা। এরা সকলে ব্যাঘ্রের মুখোশপরা মানুষ। কুৎসিত ও ভয়ানক এদের আকৃতি। 'এরা সেইসব লোক, প্রাসাদের ভেতরে জনতাকে যাদের প্রদর্শন করা হত আর বলা হত এরা পাপিষ্ঠ। কৃত অপরাধের সাজা ভোগ করছে এরা। এদের অপরাধ ছিল, এরা যুদ্ধ-বিগ্রহে অভ্যস্ত ছিল।' অর্থাৎ এরা মুজাহিদ।

তারপর দশ-বারটি মেয়েকেও নিয়ে আসা হয় জনতার সম্মুখে। এরা অত্যন্ত রূপসী যুবতী। এদের সাথে আছে বেশক'জন সুদর্শন পুরুষ।

জনতার ভীড়ের সামনে একটি উঁচু স্থানে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয় এ দল দু'টিকে। মুখোশ খুলে জনতার সামনে আসল রূপ প্রদর্শন করার নির্দেশ দেয়া হয় তাদের। সাথে সাথে বাঘের কৃত্রিম চেহারা খুলে ফেলে তারা। স্বাভাবিক মানবাকৃতির বেরিয়ে আসে তার ভেতর থেকে।

জনতাকে নির্দেশ দেয়া হয়, তোমরা কাছে এসে দেখ এদের চেন কিনা। নির্ভয়ে তাদের নিকটে যায় জনতা। চোখ বুলিয়ে দেখে সবাইকে। দেখে তারা হতভম্ব। কোথাকার এরা আকাশের প্রাণী! এরা দেখছি সকলেই আমাদের চেনা-জানা পরিচিত। সকলেই তাদের এলাকার মানুষ। এ খৃস্টান চক্রটির উদ্দেশ্য, মুসলমানদের মধ্যে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করা যে, সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়া অন্যায় কাজ। যুদ্ধ করা মস্ত বড় পাপ। এ উদ্দেশে চক্রটি সম্পূর্ণ সফল। এ এলাকার লোকদের মনে সুদানীদের প্রতি সমর্থন সৃষ্টিতেও সফল হয়েছে এ চক্রটি। ধর্ম পরিবর্তন না করেই তাদের ধর্মহীণ করে তুলেছে তারা।

জনতাকে বলা হল, এবার তোমরা প্রাসাদে ঢুকে অবলীলায় ঘুরে-ফিরে দেখ এবং খৃস্টান কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র-প্রতারণার প্রমাণ স্বচক্ষে দেখে আস। মানুষ দলে দলে ভেতরে ঢুকে পড়ে। স্থানে স্থানে দাঁড়িয়ে আছে সেনারা। এখানে জনতাকে কিভাবে প্রতারিত করা হয়েছিল, সেনারা তার বিবরণ দেয়।

দীর্ঘ সময় পর্যবেক্ষণ করে জনতা বাইরে বেরিয়ে এলে তকিউদ্দীন তাদের উদ্দেশে ভাষণ দান করেন। ভাষণে তিনি জানান, প্রাসাদে প্রবেশ করার সময় আপনাদের যে খেজুর ও পানি দেয়া হত, তার সাথে আপনাদের নেশা মিশিয়ে খাওয়ানো হত। ভেতরে যে জান্নাত-জাহান্নাম দেখানো হত, তা নেশার ক্রিয়ায় আপনাদের দৃষ্টিগোচর হত। এই কুচক্রীদের বলুন, ভেতরে গিয়ে তোমরা দেখাও হযরত মূসা (আঃ) কোথায় এবং মৃত খলিফা আল আজেদই বা কোথায়। এসব ছিল প্রতারণা। এ সেই নেশা, যা খাইয়ে হাশীশীদের গুরু হাসান ইবনে সাব্বাহ মানুষদের জান্নাত প্রদর্শন করত। সে তো একসময়ে কয়েকজন মানুষকে নেশা খাওয়াত মাত্র। আর এখানে ইসলামের এই

দুশমনরা বিশাল একটি অঞ্চলের বাসিন্দাদের মাতাল করে তুলেছে।

জনতার সামনে ঘটনার আসল চিত্র তুলে ধরে তকিউদ্দীন বললেন, প্রথমে আপনাদেরকে একজন দরবেশের কাহিনী শোনানো হয়েছিল, যে পথিকদের উষ্ট্র ও স্বর্ণমুদ্রা দান করত। তা ছিল নিছক ভিত্তিহীন গুজব। যারা আপনাদেরকে এসব কাহিনী শোনাত, তারা ছিল ইসলামের দুশমনদের দালাল, খৃস্টানদের মদদপুষ্ট।

তকিউদ্দীনের ভাষণের পর উত্তেজিত হয়ে উঠে জনতা। ক্ষিপ্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুচক্রীদের উপর। ততক্ষণে রাতের নেশা কেটে গেছে তাদের। বিক্ষুব্ধ জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে সেনারা। কিন্তু গ্রেফতারকৃত সকল কুচক্রী ও মেয়েদের প্রাণে মেরেই তবে ক্ষান্ত হয় জনতা।

এলাকায় সেনাবাহিনী ছড়িয়ে দেন তকিউদ্দীন। দুশমনের দালালদের খুঁজে খুঁজে গ্রেফতার করে তারা। কায়রোর হক্কানী আলেমদের ইমাম নিযুক্ত করা হয় মসজিদগুলোতে। ধর্মীয় ও সামরিক তালিম-তরবিয়ত শুরু করে দেয়া হয় ফেরাউনী আমলের পরিত্যক্ত প্রাসাদগুলোতো।

কায়রো ফিরে গিয়ে দু'টি কাজ আঞ্জাম দেন তকিউদ্দীন। প্রথমত ডাক্তার–শারজাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলেন, যা ছিল শারজার মনের ঐকান্তিক কামনা। দ্বিতীয়ত সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমান্ডোকে সুদান আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। প্রাসাদ অভিযানে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রতিবেশী রাষ্ট্র সুদান মিসরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে এমনভাবে তাদের প্রভাব-বলয়ে নিয়ে নিয়েছে যে, প্রচণ্ড সামরিক অভিযান ছাড়া তা প্রতিহত করা সম্ভব নয়। তিনি আরো তথ্য পেয়েছিলেন যে, সুদানীরা খৃস্টানদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে এবং তারা যথারীতি মিসর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই তার আগেই সুদান আক্রমণ করা অত্যাবশ্যক বলে সিদ্ধান্ত নেন তিনি। তাতে সুদানের কোন এলাকা দখলে আসুক বা না আসুক এতটুকু উপকার অবশ্যই হবে যে, দুশমনের আয়োজন লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে এবং তাদের পরিকল্পনা দীর্ঘ সময়ের জন্য পিছিয়ে যাবে।

রাইনি আলেকজান্ডার-এর চূড়ান্ত লড়াই

খৃস্টানদের একটি ষড়যন্ত্র যথাসময়ে নস্যাৎ করে দিলেন মিসরের ভারপ্রাপ্ত গবর্নর তকিউদ্দীন। ষড়যন্ত্রের আখড়াটি ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন তিনি। তবু তিনি চিন্তামুক্ত হতে পারেননি। কারণ, তিনি জানেন যে, ইসলাম-বিধ্বংসী হলাহল মিশে গেছে জাতির শিরায় শিরায়। খৃস্টানদের এই নাশকতামূলক কর্মকান্ডে সমর্থন যোগাচ্ছে সুদানীরা। আর সুদানীরা পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে খৃস্টানদের।

ফেতনার এই আড্ডাটিও ধ্বংস করার পরিকল্পনা নেন তকিউদ্দীন। সুদান আক্রমণের জোরদার প্রস্তুতি শুরু করে দেন তিনি। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী গোয়েন্দা পাঠিয়ে রেখেছিলেন সুদানেও। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে রিপোর্ট প্রেরণ করছে তারা। সুদানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচ্ছেন তকিউদ্দীন। কিন্তু সেসব তথ্যাবলীকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যতটুকু কাজে লাগাতে পারতেন, ততটুকু পারছেন না ভাই তকিউদ্দীন। দু'ভাইয়ের চিন্তা-চেতনা, আবেগ-জযবা সমান বটে; কিন্তু দু'জনের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতায় তফাত অনেক। দু'জনের সিদ্ধান্তই কঠোর—আপোসহীন। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী পা ফেলেন মেপে মেপে—সাবধানে। আর তকিউদ্দীন হলেন অস্থির স্বভাবের মানুষ।

সামরিক উপদেষ্টাগণ বললেন, 'সুদান আক্রমণের সিদ্ধান্ত সঠিক ও সময়োচিত পদক্ষেপ। কিন্তু মহামান্য এতে সুলতানের মতামত নেয়া প্রয়োজন।' জবাবে তকিউদ্দীন তার উপদেষ্টাদের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে বললেন—' আপনারা কি মোহতারাম আইউবীকে একথা বুঝাতে চান যে, আপনারা তাকে ছাড়া কিছুই করতে পারেন না? আপনারা কি জানেন না যে, মিসর থেকে সুদূর এক এলাকায় কেমন এক ঝড়ের তিনি মোকাবেলা করছেন? আমাদের তার পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকার অর্থ হবে সুদানীদেরকে মিসর আক্রমণের সুযোগ করে দেয়া।'

' আপনি এক্ষুণি আক্রমণ করার আদেশ দিন। বাহিনী এ মুহূর্তে যে অবস্থায় আছে, রসদ ছাড়াই সে অবস্থায় রওনা হয়ে যাবে। কিন্তু আমি এত বড়, এত গুরুত্বপূর্ণ একটি অভিযানের জন্য গভীর ভাবনা-চিন্তা প্রয়োজন মনে করি। রওনা হওয়ার সকল আয়োজন আমরা অতি অল্প সময়ে সম্পন্ন করে ফেলতে পারি। কিন্তু আমরা চাই যে, আপনি মহামান্য আইউবীকেও বিষয়টি অবহিত করে রাখুন, যাতে তিনি ও মোহতারাম জঙ্গী এদিকে দৃষ্টি রাখেন।'

কিন্তু তকিউদ্দীন মানলেন না। তিনি বললেন–' মিসরে আপনারা এক একজন গাদ্দার, এক একটি সন্ত্রাসী গ্রেফতার করছেন আর মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছেন। আমি চাই এই গাদ্দারী আর নাশকতার উৎস বন্ধ করতে। এ কাজের জন্য আমার কারো নির্দেশ বা পরামর্শের প্রয়োজন নেই।'

মিসরে খৃস্টান ও সুদানীদের গুপ্তচররা তৎপর। এখানকার সামরিক সব তৎপরতার প্রতি নজর রাখছে তারা। ইচ্ছে করলে তারা তকিউদ্দীনের সুদান আক্রমণের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিতে পারে। কিন্তু তকিউদ্দীন সে বিষয়টি ভেবে দেখলেন না। তার একটি দুর্বলতা এও ছিল যে, তার দুশমনের গুপ্তচরদের একদল হল মুসলমান, যাদের এক একজন প্রশাসন ও সামরিক বিভাগের পদস্থ কর্মকর্তা। তার বিপরীতে তকিউদ্দীনের গুপ্তচররা সুদানের রাজনৈতিক ও নীতি নির্ধারকদের পর্যন্ত যেতে পারে না। তাছাড়া সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ১১৬৯ সালে মিসরের যে সুদানী বাহিনীটিকে বিলুপ্ত করে দিয়েছিলেন, তার কয়েকজন কমান্ডার-কর্মকর্তা এখন সুদানে অবস্থান করছেন। তারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সমর-কৌশল সম্পর্কে অবহিত। সেই কৌশল অনুযায়ী তাদের বাহিনীকে গড়ে নিয়েছে তারা। খৃস্টানরা তাদের উন্নতমানের অস্ত্র এবং প্রয়োজনেরও অধিক সামরিক সরঞ্জাম দিয়ে রেখেছে। মিসরের নাড়ী-নক্ষত্র তাদের জানা।

তকিউদ্দীন আরো যে বিষয়টি ভেবে দেখলেন না, তা হল, তিনি সুদানের যে এলাকায় পা রাখতে যাচ্ছেন, সেটি বিশাল এক মরু অঞ্চল। পানির অভাব সেখানো অত্যন্ত প্রকট। আর যে জায়গায় গিয়ে তার আক্রমণ করতে হবে, মিসর থেকে তার দূরত্ব এত বেশী যে, সে পর্যন্ত রসদ সরবরাহ অব্যাহত রাখা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সর্বোপরি মিসরের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং নাশকতামূলক কর্মকান্ডের প্রতি নজরদারী করার জন্যও সৈন্যের প্রয়োজন। কিন্তু তকিউদ্দীন এতই আবেগ-প্রবণ হয়ে উঠেছেন যে, এসব কিছু উপেক্ষা করেই তিনি আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে দেন এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে অবহিত না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

তকিউদ্দীনের এই স্বাধীনচেতা মানসিকতায় সেই জযবাই কাজ করছিল, যা ছিল সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর মধ্যে। তিনি জানতেন যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী কেমন প্রচন্ড ঝড়ের মোকাবেলা করছেন এবং খৃস্টানরা চূড়ান্ত লড়াই করার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে।

এ মুহূর্তে কার্ক থেকে আট-নয় মাইল দূরে একটি পার্বত্য এলাকায় হেডকোয়ার্টারে অবস্থান করছেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। এটি তার অস্থায়ী ছাউনি। কৌশলগত কারণে এক সময় এক স্থানে অবস্থান নিচ্ছেন তিনি। যখন তিনি যে এলাকায় আক্রমণ

পরিচালনা করার কিংবা গেরিলা হামলার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তখন তার সন্নিকটে কোথায় ছাউনি ফেলছেন। আক্রমণকারী বাহিনীর কমান্ডারকে জানিয়ে রাখছেন, ফেরার সময় তিনি কোথায় থাকবেন।

শত্রুবাহিনীর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে ফিরছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর কমান্ডো বাহিনী। জানবাজ কমান্ডোদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলো এক মহাবিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে মরুভূমিতে ছড়িয়ে থাকা খৃস্টান বাহিনীর জন্য। ব্যাপক ক্ষতি সাধন হচ্ছে খৃস্টানদের।

কিন্তু কমান্ডোদের শাহাদাতবরণের ঘটনাও বেড়ে গেছে ব্যাপকহারে। আক্রমণকারী দলে কমান্ডো থাকে যদি দশজন, তো ফিরে আসে তিন-চারজন। খৃস্টানরা এমন ব্যবস্থা করে রেখেছে, যা কমান্ডোদের সাফল্যের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। ফলে জীবনের সীমাহীন ঝুঁকি নিয়ে অভিযান পরিচালনা করতে হচ্ছে তাদের। তাই কৌশল পরিবর্তনের কথা ভাবতে শুরু করেছেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

'খৃস্টানরা বোধ হয় আমাকে মুখোমুখী লড়াইয়ে আসতে বাধ্য করছে। কিন্তু আমি তাদেরকে সফল হতে দেব না। তাছাড়া আপাততঃ আমার এতো লোকও আমি মরতে দেব না।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

'আমি আপনাকে গেরিলা বাহিনীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করার পমামর্শ দেব। এ পরামর্শও দেব যে, আমাদের শুধু এ কারণে দুশমনের শক্তিকে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না যে, আমাদের সৈন্যদের আবেগ অনেক বেশী। কিন্তু আবেগ একজন সৈনিককে প্রাণপণ যুদ্ধে জড়িয়ে খুন করাতে পারে, বিজয়ের জামিন হতে পারে না। খৃস্টানদের মোকাবেলায় আমাদের সৈন্যসংখ্যা অনেক কম। আমাদের এ কথাও ভুললে চলবে না যে, খৃস্টানদের অধিকাংশ সৈনিক বর্মপরিহত।' বললেন এক নায়েব।

মুচকি হাসলেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। বললেন–' তারা যে লোহা পরিধান করে রেখেছে, তা তাদের নয়– উপকার দেবে আমাদের। দেখেননি, ওরা মার্চ করে হয়তো রাতে অথবা ভোরে? কারণ, তারা রোদ সহ্য করতে পারে না। সূর্যের তাপ তাদের বর্মগুলোকে জ্বলন্ত অংগারের ন্যায় উত্তপ্ত করে তোলে। তখন বর্মপরিহিত সৈনিকেরা তাদের লোহার ঐ পোশাকগুলো খুলে ছুড়ে ফেলতে চায়। তাছাড়া লোহার ওজন তাদের চলাচলের গতিও ব্যাহত করে তুলে। আমি তাদেরকে দুপুর বেলা লড়াই করতে বাধ্য করব। তাদের মাথার শিরস্ত্রাণগুলো ঘাম ঝরিয়ে ঝরিয়ে চোখে ফেলবে। তারা অন্ধ হয়ে যাবে। আর সংখ্যার ঘাটতি আমাদের পূরণ করতে হবে আবেগ ও কৌশল দিয়ে।'

এ সময়ে এসে উপস্থিত হন আলী বিন সুফিয়ানের এক নায়েব জাহেদান। সাথে

তাঁর দু'জন লোক। চমকে উঠলেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তাদের বসতে দিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ' খবর কি?' জামার ভেতর হাত ঢোকালেন তারা। বের করে আনলেন কাঠের তৈরি দু'টো ক্রুশ। এগুলো ঝুলানো ছিল তাদের গলায়। এরা খৃস্টান নয়- মুসলমান। নিজেদের খৃস্টান জাহির করার জন্য তারা গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে রাখে। দু'জনই ক্রুশ দু'টো খুলে নীচে ফেলে দেয়। রিপোর্ট পেশ করে একজন।

❁ ❁ ❁

এরা দু'জন গুপ্তচর। ফিরে এসেছে কার্ক থেকে। কার্ক ফিলিস্তীনের দুর্গবেষ্টিত একটি শহর। দখল খৃস্টানদের। শোবক নামক একটি দুর্গও তাদের দখলে ছিল। সেটির পতন ঘটেছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর হাতে। কার্ক দুর্গকে কোনক্রমেই হাতছাড়া করতে চাইছে না তারা। তাই তারা শোবক পতনের পর কার্কের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অনেক শক্ত করে ফেলেছে। এখন আর তারা দুর্গের ভেতরে থেকে যুদ্ধ করতে চাইছে না।

শোবক পতনের পর মুসলমানদের ভয়ে যখন খৃস্টান ও ইহুদী নাগরিকরা পালিয়ে কার্ক চলে যেতে শুরু করেছিল, তখন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তার সেনাবাহিনী ও প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, পলায়নপর অমুসলিমদের যেন ফিরিয়ে আনে এবং তাদের সাথে ভাল আচরণ করে। কিন্তু সুলতান একটি গোপন নির্দেশ এ-ও দিয়ে রেখেছিলেন যে, যারা চলে যেতে চায়, তাদেরকে যেতে দাও। রহস্য এই ছিল যে, তাহলে অমুসলিম নাগরিকদের সাথে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচররাও কার্ক ঢুকে যেতে পারে। দুশমনের এই নগরীতে এবং তার আশ-পাশে–যার উপর অল্প ক'দিন পরই আক্রমণ হতে চলেছে–গুপ্তচর ঢুকিয়ে রাখার এটি এক মোক্ষম সুযোগ। ইহুদী ও খৃস্টান শরণার্থীদের বেশে মুসলিম গুপ্তচররা সে সুযোগে ঢুকে পড়েছিল কার্কে। সেখানকার মুসলিম বাসিন্দাদের সাথে নিয়ে একটি গোপন আড্ডা তৈরী করে নিয়েছিল তারা। সেখান থেকে তথ্য প্রেরণ করছিল সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট। সুলতান নিজ কানে শুনতেন তাদের রিপোর্ট।

আজও আসল দু'জন গুপ্তচর। তৎক্ষণাৎ তাদের তাঁবুতে ডেকে নিয়ে গেলেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। সরিয়ে দিলেন অন্য সকলকে। খৃস্টান বাহিনীর গতি-বিধি ও বিন্যাস সম্পর্কে নানা তথ্য প্রদান করে তারা। সে মোতাবেক ছক তৈরি করতে শুরু করেন সুলতান। এ সময়ে চেহারায় তার কোন পরিবর্তের ছাপ পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু গুপ্তচররা যখন কার্কের মুসলিম নাগরিকদের নির্যাতনের করুণ চিত্র তুলে ধরতে শুরু করল, তখন বিবর্ণ হয়ে গেল সুলতানের চেহারা। আবেগাপ্লুত হয়ে এক পর্যায়ে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁবুর মধ্যে পায়চারী করতে শুরু করলেন।

গুপ্তচররা তাকে জানায়, শোবকে পরাজয় বরণ করে খৃস্টনরা কার্কের মুসলমানদের

বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিয়ে গেছে। সেখানকার হাট-বাজারগুলোতে মুসলমান ব্যবসায়ীরা পথে বসতে শুরু করেছে। অমুসলিম ক্রেতারা তো তাদের থেকে সওদা ক্রয় করেই না, উপরন্তু মুসলমারদেরও ভয় দেখিয়ে তাদের দোকান থেকে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। সেখানে ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানোর কাজ রুটিনে পরিণত হয়েছে। ইহুদী-খৃস্টানরা মসজিদগুলোর চত্বরে উট-ঘোড়া ও গরু-ছাগল বেঁধে রাখছে। আযান-নামাযের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই বটে, তবে আযান শুরু হলেই অমুসলিমরা হৈ-চৈ, গান-বাদ্য শুরু করে দিয়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে।

গোয়েন্দা আরো জানায়–

মুসলমানদের জাতীয় চেতনা নস্যাৎ করার জন্য সেখানে জোরেশোরে ছড়ানো হচ্ছে নানা রকম গুজব। প্রচার করা হচ্ছে সালাহুদ্দীন আইউবী গুরুতর জখম হয়ে দামেশ্‌ক চলে গেছেন। এতক্ষণে হয়ত তিনি মারা গেছেন। আরো বলা হচ্ছে, নেতৃত্বের দুর্বলতার ফলে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সৈন্যরা মরুভূমিতে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে এবং তারা পালিয়ে মিসর চলে যাচ্ছে। গুজব ছড়ানো হচ্ছে, মুসলমানদের এখন আর কার্ক আক্রমণ করার শক্তি নেই এবং অতি সত্বর শোবক দুর্গ খৃস্টানদের হাতে চলে আসছে। প্রচার করা হচ্ছে, সুদানীরা মিসর আক্রমণ করেছে এবং মিসরের সৈন্যরা স্বপক্ষ ত্যাগ করে সুদানীদের সাথে একাত্ম হয়ে গেছে। আরো কত কি গুজব ছড়িয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে কার্কের মুসলমারদের।

গুপ্তচররা জানায়, এখন প্রতিদিন ভোরে খৃস্টান পাদ্রীরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায় এবং মুসলমানদের ঘরের দরজায় গিয়ে গিয়ে ঘন্টা বাজায়, গান গায় ও মুসলমানদের জন্য প্রার্থনা করে। পাদ্রীরা এর বেশী কিছু করে না। ইহুদী ও খৃস্টান মেয়েরা মুসলমানদের মধ্যে তাদের ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়। প্রেম-ভালোবাসার ফাঁদ পেতে মুসলিম যুবকদের চিন্তা-চেতনা ধ্বংস করছে সুন্দরী তরুণীরা। বান্ধবী বানিয়ে ঘনিষ্ঠতা অর্জন করে স্বাধীনতার চিত্তাচর্ষক প্রলোভন দেখাচ্ছে তারা মুসলিম মেয়েদের। তাদের ধারণা দিচ্ছে যে, মুসলিম বাহিনী যখনই যে এলাকা জয় করছে, তারা সেখানকার অন্যদের সাথে মুসলিম মেয়েদেরও সম্ভ্রম নষ্ট করছে।

গোয়েন্দাদের এ রিপোর্ট সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর জন্য নতুন কিছু ছিল না। কার্কের মুসলমানদের করুণ দশা সম্পর্কে তিনি পূর্ব থেকেই অবহিত। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে কোন গুজব কানে নিতে প্রস্তুত ছিল না সেখানকার মুসলমানরা। কিন্তু গুজব শুনতে শুনতে এখন কান ঝালা-পালা হয়ে গেছে তাদের। যখন যে কথা তাদের কানে ঢুকছে,সবই আঘাত হানছে তাদের মনোবলে। কত আর শোনা যায়। এখন ধীরে ধীরে প্রভাবিত হতে শুরু করেছে তারা।

ভয়ে তারা মুখ খুলতে পারছে না। তাদের ঘরের দেয়ালেরও কান আছে। পদে

পদে গুপ্তচর। শবযাত্রা-বরযাত্রায়ও গোয়েন্দা। মসজিদে-মসজিদেও গুপ্তচর। তাদের বড় দুর্ভাগ্য, তাদের মুসলমান ভাই খৃস্টানদের পক্ষে চরবৃত্তি করছে। নিজ ঘরে বসে কথা বলতে হয় তাদের কানে কানে। 'অমুক মুসলমান খৃস্টান সরকারের বিরোধী' শুধু এতটুকু রিপোর্টই যথেষ্ট একজন মুসলমানের বেগার ক্যাম্পে ঠাঁই নেয়ার জন্য।

'কিন্তু সালারে আজম! সেখানে নতুন এক চাল শুরু হয়েছে। খৃস্টানরা মুসলমানদের সাথে ভালো আচরণ করতে শুরু করেছে। এই তো অল্প ক'দিন আগের ঘটনা। খৃস্টান সরকারের এক কর্মকর্তা একটি মসজিদের দৈন্যদশা দেখে সাথে সাথে মসজিদটা মেরামত করে দেয়ার ঘোষণা দেন এবং অল্প ক'দিনের মধ্যে নিজে উপস্থিত থেকে মসজিদটি মেরামত করেও দেন। তারা বেগার ক্যাম্পের মুসলমানদের মুক্তি দেয়নি ঠিক, কিন্তু তাদের কষ্ট অনেকটা লাঘব করে দিয়েছে এবং শ্রমের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছ। কিন্তু তাদের বুঝানো হচ্ছে, তোমরা ক্রুশের বিরুদ্ধে মারাত্মক অন্যায় করেছ, তথাপি আমরা তোমাদের উপর রহম করছি। কার্কের খৃস্টানদের এই ভালোবাসার অস্ত্র বড়ই ভয়ংকর। কৃত্রিম এই ভালোবাসা দিয়ে তারা মুসলিম যুবকদেরকে নেশা ও জুয়াবাজিতে অভ্যস্ত করে তুলছে। আমরা যদি আক্রমণে বিলম্ব করি, তাহলে সেখানকার মুসলমানরা ততদিনে কুরআনের পরিবর্তে গলায় ক্রুশ ধারণ করবে। মুসলমান থাকেও যদি থাকবে নামমাত্র। তখন আমরা কার্ক অবরোধ করলে তারা আমাদের কোন সহায়তা করবে না। পাশাপাশি মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃস্টানদের চরবৃত্তিও আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। ধরপাকড় অব্যাহত রয়েছে। তবে মুসলমানদের ঈমানী চেতনা এখনো বহাল আছে। এখনো তারা ঈমানের উপর দৃঢ় থাকতে সংকল্পবদ্ধ। এখনো তারা খৃস্টানদের ভালোবাসাকে বরণ করে নেয়নি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এভাবে চলতে থাকলে তারা বেশীদিন টিকে থাকতে পারবে না।' বলল এক গোয়েন্দা।

পরিস্থিতির বিবরণ শুনে বিচলিত হয়ে পড়েন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। 'মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করছে ' এ রিপোর্টটি বেশী পীড়াদায়ক তার কাছে। অধিকৃত অঞ্চলে মুসলমানদের সাথে খৃস্টানদের ভালো আচরণ এবং তার পাশাপাশি মুসলিম যুবকদের চরিত্র ধ্বংসের অভিযোগ তাঁর পেরেশানীর আরেকটি কারণ। সবচে' বেশী ভয়াবহ হল সেইসব গুজব, যা ছড়ানো হচ্ছে সেখানকার মুসলমানদের মধ্যে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তাঁর গোয়েন্দা বিভাগের নায়েব জাহেদানকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন, ' তুমি কি এদের বক্তব্য শুনেছ?'

'বর্ণে বর্ণে শুনেই তবে এদের আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।' জবাব দেন জাহেদান।

'আলী বিন সুফিয়ানকে কায়রো থেকে ডেকে আনবে? ...নাকি তুমিই তার স্থান পূরণ করতে পারবে? বিষয়টি কিন্তু বড় স্পর্শকাতর। দুশমনের নগরীতে মুসলমানদেরকে গুজব এবং দুশমনের বিষাক্ত ভালোবাসা থেকে রক্ষা করতে হবে।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

'আলী বিন সুফিয়ানকে কায়রো থেকে ডেকে আনার প্রয়োজন নেই। হাসান ইবনে আব্দুল্লাহকেও তার সাথে থাকতে দিন। মিসরের পরিস্থিতি ভালো নয়। দেশ নাশকতাকারী ও গাদ্দারে ভরে গেছে। কার্কের বিষয়টা আমিই সামলে নেব।' বললেন জাহেদান।

'তুমি কী চিন্তা করেছ?' জিজ্ঞেস করলেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। মূলতঃ পরীক্ষা নিচ্ছিলেন তিনি জাহেদানের। সুলতান জানতেন, জাহেদান নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী গুপ্তচর এবং আলী বিন সুফিয়ানের হাতেগড়া লোক। তার প্রতি পূর্ণ আস্থা আছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর। তারপরও তিনি নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন মনে করছেন যে, জাহেদান তার ওস্তাদের অভাব পূরণ করতে পারবে কি-না। জাহেদানের জবাবের অপেক্ষা না করেই সুলতান বললেন,' জাহেদান! আমি কখনো যুদ্ধের ময়দানে পরাজয়বরণ করিনি। এ ময়দানেও আমি পরাজিত হতে চাই না। আমি কার্কের মুসলমানদের চারিত্রিক ও আদর্শিক পতন থেকে রক্ষা করতে চাই।'

'আপনি জানেন, কার্কে আমাদের গুপ্তচর আছে। এ লক্ষ্য অর্জনে আমি তাদের কাজে লাগাব। তারা সেখানকার মুসলমানদেরকে আপনার সম্পর্কে, আমাদের সেনা বাহিনী ও মিসর সম্পর্কে সঠিক খবরাখবর শোনাতে থাকবে এবং তাদের কাছে আপনার পয়গাম পৌঁছাতে থাকবে।' বললেন জাহেদান।

'ওখানকার মুসলিম মহিলাদের মধ্যে জাতীয় ও ঈমানী চেতনার কমতি নেই। আমরা মুসলিম যুবতীদের বলে দেব, যেন তারা ঘরে ঘরে মুসলিম মহিলাদের মন-মানসিকতা ধোলাই করতে থাকে। আমি তো নিজের চোখে দেখেছি, সেখানকার মেয়েরা অস্ত্র হাতে লড়াই পর্যন্ত করতে প্রস্তুত।' বলল এক গোয়েন্দা।

'মহিলারা যদি নিজ নিজ ঘর ও শিশু-সন্তানদের চরিত্র গঠনের ময়দান নিয়ন্ত্রণে রাখে, তাহলে তাতেই ইসলামের প্রসার ও ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তারে অনেক সাহায্য পাওয়া যাবে। তাদের বলে দাও, যেন তারা মুসলিম পরিবারগুলোতে এবং মুসলিম শিশু-কিশোরদের মধ্যে অনৈসলামী কার্যকলাপ ও ইসলাম-বিরোধী চিন্তা-চেতনা ঢুকতে না দেয়। আমি চেষ্টা করছি, যাতে শীঘ্র কার্ক আক্রমণ করতে পারি এবং শোবকের ন্যায় সেখানকার মুসলমানদেরও নির্যাতনের যাঁতাকল থেকে উদ্ধার করতে পারি।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তিনি জাহেদানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ মিশন নিয়ে তুমি কাকে কার্ক পাঠাবে?'

'এই দু'জনকে। আসা-যাওয়ার পথ ও কর্মপন্থা সম্পর্কে এরা অভিজ্ঞ। ওখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথেও পরিচিত।' জবাব দেন জাহেদান।

কার্কের মুসলমানদের উপর ভালোবাসার যে অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছিল, তা ছিল খৃস্টানদের গোয়েন্দা প্রধান হরমুনের আবিস্কার। শোবকে পরাজয়বরণ করার পর তিনি খৃস্টান সম্রাটদের উপর চাপ দিয়ে আসছিলেন যে, কার্কের মুসলমানদেরকে ভালোবাসার টোপ দিয়ে ক্রুশের অনুগত বানানো হোক কিংবা অন্ততঃ সালাহুদ্দীন আইউবীর শত্রুতে পরিণত করা হোক। কিন্তু খৃস্টান শাসকগণ মুসলমালদের এতই ঘৃণা করত যে, তাদের প্রতি কৃত্রিম ভালোবাসা প্রদর্শন করতেও তারা রাজী নন। অত্যাচার-নির্যাতন দিয়েই মুসলমানদের জাতীয় চেতনা ধ্বংস করতে চাইতেন তারা।

জার্মান বংশোদ্ভূত হরমুন একজন অভিজ্ঞ গোয়েন্দা। মানুষের সাইকোলজী বুঝেন তিনি। খৃস্টান সম্রাটদের অনেক বুঝিয়ে-শুনিয়ে বড় কষ্টে তিনি নিজের মতে নিয়ে আসতে সক্ষম হন এবং পরিকল্পনা পাস করিয়ে নেন যে, শহর ও শহরতলীতে যেসব মুসলমান বাস করছে, তাদেরকে সন্দেহভাজন ও গুপ্তচর হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। যার ব্যাপারে সামান্যতম প্রমাণও পাওয়া যাবে, তাকে গ্রেফতার করে গুম করে ফেলা হবে। কিন্তু সব মুসলমান নাগরিককে আতংকগ্রস্ত করা যাবে না। পলিসির একটি মৌলিক দিক এই ছিল যে, খৃস্টান মেয়েদের দ্বারা মুসলিম মেয়েদের মধ্যে বেহায়াপনা ঢুকিয়ে দিতে হবে এবং মুসলিম মেয়েদেরকে বিলাসী ও মদ্যপ বানাতে হবে। তাদের চরিত্র ও নৈতিকতা ধ্বংস করতে হবে।

পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হল। সূচনা হল গুজব ছড়ানোর মধ্য দিয়ে। মুসলমানদের মধ্যে গাদ্দারীর জীবাণু সৃষ্টি করার জন্য আগেই বিপুল অর্থ বরাদ্দ নিয়ে রেখেছিলেন হরমুন।

হরমুন কয়েকজন মুসলমানকে হাত করে নেন। আকর্ষণীয় কয়েকটি ঘোড়াগাড়ী দিয়ে শাহজাদার মর্যাদায় ভূষিত করেন তাদের। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরবৃত্তি করবে এবং তাদের মধ্যে গুজব ছড়াবে।

মাঝে-মধ্যে নিমন্ত্রণ করে দরবারে এনে তাদের রাজকীয় মর্যাদা দেয়া হবে। তাদের স্ত্রীদেরও দাওয়াত করে এনে সাদর আপ্যায়ন করা হবে, যাতে ধীরে ধীরে তারা তাদের মূল পরিচয় ও ইসলামী চেতনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে 'উদারপন্থী' পরিচয় ধারণ করে।

হরমুন বললেন, 'আপনারা যদি মুসলমানদেরকে আপনাদের গোলাম বানাতে চান, তাহলে তাদের মাথায় ক্ষমতা ও রাজত্বের পোকা ঢুকিয়ে দিন। গাড়ী-বাড়ী দিয়ে তাদের মুঠোয় কিছু অর্থ ধরিয়ে দিন। দেখবেন, ক্ষমতার নেশায় তারা আপনাদের আঙ্গুলের ইশারায় নাচতে শুরু করবে। শূন্য করতে শুরু করবে গ্লাসের পর গ্লাস।

নিজ কন্যাদের বিবস্ত্র করে তুলে দেবে আপনাদের হাতে। যদি আপনারা মুসলমানদের ভবিষ্যত অন্ধকার বানাতে চান, তাহলে আমার এই ফর্মুলাটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। আমি আপনাদের আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি, ইহুদীরা মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংস করার জন্য তাদের মেয়েদের পেশ করেছে। আপনারা তো জানেন যে, মুসলমানদের সবচে' আদি ও সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু হল ইহুদী জাতি। ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য তারা নিজ কন্যার ইজ্জত এবং সঞ্চিত অর্থের শেষ মুদ্রাটিও উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত থাকে।'

❁ ❁ ❁

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যেদিন জাহেদানের উপর কার্কের পরিস্থিতি সামাল দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করেন, তার বিশদিন পরের ঘটনা। হঠাৎ এক পাগল আত্মপ্রকাশ করে কার্কে। হাতে তার হাত দুয়েক লম্বা একটি কাঠের ক্রুশ। ক্রুশটি উর্ধ্বে তুলে ধরে লোকটি চীৎকার করে বলছে–

'মুসলমানদের পতনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। শোবকে মুসলমানরা তাদেরই মেয়েদের সম্ভ্রমহানী করছে। মিসরে মুসলমানরা মদপান শুরু করেছে। যীশুখৃষ্ট বলেছেন, এ জাতির আর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার নেই। মুসলমানগণ! নূহ এর দ্বিতীয় তুফান থেকে যদি তোমরা রক্ষা পেতে চাও, তাহলে ক্রুশের ছায়াতলে এসে পড়। ক্রুশ যদি তোমাদের পছন্দ না হয়, তাহলে ইহুদী হয়ে যাও। এখন আর মসজিদের সেজদা করে তোমাদের লাভ নেই।'

পোষাক ও গঠন-প্রকৃতিতে লোকটাকে ভালো মানুষ বলেই বোঝা যায়। কিন্তু কথা-বার্তা আর চালচলনে মনে হয় লোকটা পাগল। মুখে দাড়ি আছে। পরনে লম্বা চোগা। মাথায় পাগড়ী। তার উপরে রুমাল। লোকটার চেহারা ও কাপড়-চোপড় ধূলা-মলিন। অনেক দূর থেকে সফর করে এসেছে মনে হয়। কেউ থামতে বললে থমকে দাঁড়ায়। কিছু জিজ্ঞেস করলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, যেন কারো কথাই বুঝছে না সে। যে যা জিজ্ঞেস করছে, মুখে একই বুলি, একই ঘোষণা, 'মুসলমানদের পতনের সময় ঘনিয়ে এসেছে ....।'

কেউ জানতে চেষ্টা করল না, লোকটা কে, কোথা থেকে এসেছে। খৃষ্টানরা এজন্য আনন্দিত যে, তার হাতে ক্রুশ, মুখে যীশুখৃষ্টের নাম। ইহুদীরা এজন্য উৎফুল্য যে, মুসলমানদের ইহুদী হওয়ার আহ্বান করছে। একটি কারণে উভয় ধর্মের মানুষই আনন্দিত যে, লোকটি মুসলমানদের ধ্বংসের সুসংবাদ প্রচার করছে। তার ঘোষণা শুনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। খৃষ্টবাহিনীর কয়েকজন সৈনিক পাগল বলে ভ্রুক্ষেপ করল না পুলিশের লোকেরা, মুসলমানদের কারও এত বড় বুকের পাটা নেই যে, তার মুখটা বন্ধ করে দেবে। তার মুখে নিজেদের পতনের ঘোষণা শুনে মুসলমানরা ভয় পেয়েছে, ক্ষুব্ধও হয়েছে। কিন্তু তারা অসহায়।

পাগলটা শহরের অলি-গলি আর হাট-বাজার ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলছে, ' মুসলিম বাহিনী কার্কে আসবে না। তাদের সালাহুদ্দীন আইউবী মরে গেছে।' কখনো বা এমন আবোল-তাবোল বকছে, যার কোন অর্থ হয় না। তাতে প্রমাণিত হয় লোকটা পাগল।

এলাকার শিশু-কিশোররা জড়ো হয়ে ছুটছে পাগলটার পিছনে। বড়রাও কেউ কিছু দূর তার পিছনে হেঁটে কেটে পড়ছে। এলাকার কিছু মানুষ পিছু নিয়েছে তার। ক্ষোভে ফেটে যাচ্ছে মুসলমানরা। শিশুদের ফেরানোর চেষ্টা করছে তারা। শুধু একজন মুসলমান– মাত্র একজন পেছনে পেছনে যাচ্ছে পাগলটার। দু'জনের মাঝে ব্যবধান দশ-বারো কদম। এক যুবক মুসলমান পথে দু'জন খৃস্টান তাকে দেখে টিপ্পনি কাটে, তিরস্কার করে। একজন বলে,' ওসমান ভাই! তুমিও খৃস্টান হয়ে যাও। ক্রুশের ছায়ায় এসে পড়।' রোশকষায়িত নয়নে তাদের প্রতি তাকায় ওসমান। গোস্বা হজম করে চুপচাপ এগিয়ে সামনের দিকে পাগলটার পিছু নেয়। খৃস্টান যুবকদ্বয় জানেনা, ওসমানের কাছে খঞ্জর আছে , জানেনা পাগলটাকে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়ে হাঁটছে ওসমান।

যুবকের পুরো নাম ওসমান সারেম। বাবা-মা জীবিত। ছোট একটি বোন আছে। নাম আন-নূর সারেম। বয়স বাইশ-তেইশ বছর। ওসমান তার তিন বছরের বড়। বড় তেজস্বী যুবক। ইসলামের জন্য নিবেদিত মুসলমান। খৃস্টান সরকারের সন্দেহভাজনদের তালিকার একজন। কারণ, মুসলমান যুবকদের খৃস্টান সরকারের বিরুদ্ধে গোপন অভিযানের জন্য প্রস্তুত করেছিল সে। কিন্তু খৃস্টানরা এ যাবত হাতে-নাতে ধরতে পারেনি তাকে।

পাগলটার আওয়াজ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ওসমান সারেম। তখন ইয়া বড় এক ক্রুশ উঁচিয়ে মুসলমানদের ধ্বংস ঘোষণা করে ফিরছিল পাগলটা। গায়ে আগুন ধরে যায় ওসমানের। ওসমান দেখল না, লোকটা পাগল। ক্রুশ দেখে পাগলের কথা শুনে স্থির থাকতে পারল না যুবক। ঘরে ফিরে তুলে নেয় খঞ্জরটা। জামার তলে লুকিয়ে হাঁটা দেয় পাগলের পিছনে পিছনে। নিরাপদ কোন এক স্থানে খুন করতে হবে লোকটিকে। নিজে ধরা পড়া যাবে না। খৃস্টানদের বিরুদ্ধে আরো কিছু কাজ করার জন্য বেঁচে থাকা প্রয়োজন তার। পাগলটা থেকে দশ-বারো কদম দূর দিয়ে হাঁটছে আর তার ঘোষণা শুনছে। খৃস্টান যুবকদ্বয় তিরস্কার করায় দু'চোখে তার রক্ত জমে যায়। হত্যার মনোবৃত্তি আরো দৃঢ় হয়ে যায় তার।

পাগলটার পেছনে ও দু'পাশে জনতার যে ভীড়, তার অধিকাংশই কৌতূহলী শিশু-কিশোর। যেন বিশাল এক শোভাযাত্রা। খুন করার পরিবেশ পাচ্ছে না ওসমান।

এভাবে কেটে যায় সারাটা দিন। ক্ষীন হয়ে আসে পাগলের কণ্ঠও। কমে যায় উৎসুক জনতার সংখ্যা। শিশু-কিশোররা কেটে পড়ে এক এক করে।

সূর্য ডুবতে এখনো সামান্য বাকি। সামনে একটি মসজিদ। মসজিদের দরজায় গিয়ে বসে পড়ে পাগলটা। হাতের ক্রুশটি ঊর্ধ্বে তুলে ধরে বলে, ' এটি এখন আর মসজিদ নয়–গীর্জা।'

ওসমান সারেম নিকটে গিয়ে দাঁড়ায় পাগলটার। ওসমান ভালো করেই জানে যে, লোকটি আসলেই পাগল। তবুও তাকে হত্যা করলে শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। কারণ, হাতে তার ক্রুশ। কণ্ঠ তার উচ্চকিত মুসলমানদের বিরুদ্ধে। ওসমান সারেম পাগলটার কাছে ঘেঁষে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, 'এখান থেকে এক্ষুণি উঠে যাও, ক্রুশটা নিয়ে পালিয়ে যাও এলাকা থেকে। নইলে খৃস্টানরা এখান থেকে তুলে নেবে তোমার লাশটা।'

যুবকের প্রতি চোখ তুলে তাকায় পাগলটা। অপলক চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। আশ-পাশে দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো শিশু। পাগলটা ওসমানের কথায় কোন জবাব না দিয়ে ধমক দিয়ে চলে যেতে বলে শিশুদের। ভয়ে পালিয়ে যায় শিশুরা।

পাগল ঢুকে পড়ে মসজিদের ভিতরে। ওসমান সারেমের জন্য এটি মহা সুযোগ। সেও ঢুকে পড়ে মসজিদে। বন্ধ করে দেয় দরজাটা। আঘাত করতে উদ্যত হয় পাগলটার পিঠে। অমনি মোড় ঘুরিয়ে তাকায় পাগল। যুবকের খঞ্জরের আঘাত নিজের গায়ের দিকে আসতে দেখেই সামনে বাড়িয়ে ধরে হাতের ক্রুশটা। আঘাতটা নিয়ে নেয় ক্রুশের গায়ে। বলে– 'থামো যুবক। ভিতরে চল। আমি মুসলমান।'

আর আঘাত করল না ওসমান সারেম। পায়ের জুতা খুলে মসজিদের মিম্বরের কাছে চলে যায় পাগল। ক্রুশটা আছে তার হাতেই। এগিয়ে যায় ওসমানও। দু'জনে বসে সামনাসামনি। পাগল যুবকের নাম জিজ্ঞেস করে। যুবক নিজের নাম জানায়। পাগল বলে 'আমি মুসলমান । তোমাকে আমার বড় প্রয়োজন। তা তুমি কখন থেকে আমার পিছু নিয়েছ?'

'আজ সারাটি দিনই আমি তোমার পিছনে পিছনে ঘুরেছি। কিন্তু তোমাকে খুন করার মওকা পাইনি।' জবাব দেয় ওসমান সারেম।

'আমাকে তুমি কেন খুন করতে চাইছ?' জিজ্ঞেস করে পাগল।

'কারণ, আমি ইসলাম ও সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে কোন কথা সহ্য করতে পারি না। তুমি পাগল হও বা না হও আমি তোমাকে জীবিত রাখব না।' ওসমান জবাব দেয়।

পাগলটা ওসমান সারেমকে আরো কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করে। শেষে বলে–

'আমার তোমার মত একটি যুবকের প্রয়োজন ছিল। ভালই হল যে. তুমি নিজেই আমার পিছনে এসে পড়েছ। আমার আশা ছিল যে, কষ্টে হলেও আমি মনের মত একজন মুসলমান পেয়ে যাব। আমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রেরিত গোয়েন্দা।

খৃস্টানদের বোকা ঠাওরানোর জন্য আমি সফর করে এসেছি। তোমার সাথে আমার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। পিছন দিকে খেয়াল রেখ। কোন খৃস্টান এসে পড়লে আমি আগের মত বকওয়াস শুরু করে দেব। তুমি তন্ময় হয়ে আমার কথাগুলো শুনতে থাকবে, যেন তুমি আমার কথায় প্রভাবিত হচ্ছ। মাগরিবের নামাযের সময় হয়ে আসছে। মুসলমানদের মধ্যেও খৃস্টানদের চর আছে। মসজিদের নামাজীদের আগমন শুরু হওয়ার আগেই আমি আমার কথা শেষ করতে চাই।'

কখনো গোয়েন্দা দেখেনি ওসমান সারেম। লোকটা যে কত অস্বাভাবিক বিচক্ষণ, তা জানেনা ওস্মান। ওসমানকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করেই গোয়েন্দ বুঝে ফেলে যে, যুবকটাকে বিশ্বাস করা যায়। গোয়েন্দা তাকে বলল–

তুমি তোমার মত আরো কয়েকটি যুবককে একত্রিত কর। মুসলমান মেয়েদেরও প্রস্তুত কর। প্রতিটি মুসলিম পরিবারে তোমাদেরকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর পয়গাম পৌছিয়ে দিতে হবে যে, সালাহুদ্দীন আইউবী জীবিত আছেন। নিজ বাহিনীর সাথে তিনি এখান থেকে মাত্র আধা দিনের পথ দূরে অবস্থান করছেন। তাঁর গোটা ফৌজ কার্ক আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতই নয় শুধু, খৃস্টান বাহিনীর দম নাকের আগায় এনে রেখেছেন তিনি। মিসরের পরিস্থিতি শান্ত-স্বাভাবিক। খৃস্টানদের ষড়যন্ত্রের গোড়া উপড়ে ফেলা হয়েছে সেখানে।

'সালাহুদ্দীন আইউবী কার্ক আক্রমণ করবেন?' জানতে চায় ওসমান সারেম। বলে, আমরা তাঁর পথপানে চেয়ে আছি। তোমাকে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তোমরা যদি বাইরে থেকে আক্রমণ কর, তাহলে ভেতর থেকে আমরাও খৃস্টানদের উপর ঝাপিয়ে পড়ব। আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা জলদি এসে পড়।

ধৈর্যের সাথে কাজ কর যুবক। আগে সালাহুদ্দীন আইউবীর পয়গাম শোন। সব মুসলিম যুবকের কানে পয়গামটা পৌছিয়ে দাও। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী কার্কের মুসলিম যুবকদের বলতে বলেছেন–

'তোমরা দেশ ও ধর্মের মোহাফেজ। আমি যখন প্রথম যুদ্ধ করি, তখন আমি কিশোর। লড়াই করেছি শত্রুর হাতে অবরুদ্ধ অবস্থায়। ফৌজের কমান্ডো ছিল আমার চাচার হাতে। তিনি আমায় বলেছিলেন, অবরোধে পড়েছ বলে ভয় পেওনা। এ বয়সে যদি ভীত হয়ে পড়, তাহলে সারাটা জীবনই কাটবে ভয়ে ভয়ে। যদি ইসলামের আলমবরদার হতে চাও, তাহলে এই পতাকা আজই হাতে তুলে নাও এবং দুশমনের ব্যূহ ভেঙ্গে বেরিয়ে যাও। তারপর মোড় ঘুরিয়ে আবার ফিরে এসে দুশমনের উপর ঝাপিয়ে পড়। তিন মাসের অবরোধে আমরা না খেয়ে কাটিয়েছি অনেক দিন। তথাপি আমরা অবরোধ ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলাম। এ সময়ে আমরা যা খেয়েছি, সব দুশমনের ছিনিয়ে আনা রসদ। অবরোধে আমাদের যেসব ঘোড়া ক্ষুৎ-পিপাসায় মারা গিয়েছিল, তার অভাব আমরা দুশমনের ঘোড়া দিয়ে পূরণ করেছি...।'

সালাহুদ্দীন আইউবী বলেছেন, 'আমার কওমের মেয়েদের বলবে, দুশমন তোমাদের উপর ভালোবাসার অস্ত্র দিয়ে আঘাত, হামলা করেছে। তোমরা স্মরণ রাখবে, কোন অমুসলিম কখনো কোন মুসলমানের আপন হতে পারে না। খৃস্টানরা যুদ্ধের ময়দানে টিকতে পারেনি। তাদের সব পরিকল্পনা ধুলোয় মিশে গেছে। সেজন্য এখন তারা মুসলমানদের নতুন প্রজন্মের চিন্তা থেকে দেশপ্রেম ও ঈমানী চেতনা বিলুপ্ত করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। তারা যে অস্ত্র ব্যবহার করেছে, তা বড় ভয়ংকর। বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতা, আলস্য ও কর্তব্যে অবহেলা– এ তিনটি দোষ তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করার জন্য একজোট হয়েছে ইহুদী ও খৃস্টানরা। ইহুদীরা তাদের মেয়েদের দিয়ে তোমাদের মধ্যে পশুবৃত্তি উস্কে দেয়ার চেষ্টা করছে এবং তোমাদেরকে নেশায় অভ্যস্ত করে তুলছে। আমি একথা বলব না যে, এই পাশবিকতা ও মাদকাসক্তি তোমাদের আখেরাত নষ্ট করবে আর মৃত্যুর পর তোমরা জাহান্নামে যাবে। আমি বরং তোমাদের বুঝাতে চাই যে, এই চারিত্রিক ত্রুটিগুলো তোমাদের জন্য এ দুনিয়াটাকে জাহান্নামে রূপান্তরিত করবে। যাকে তোমরা জান্নাতের স্বাদ মনে করছ, মূলতঃ তা জাহান্নামের আজাব। তোমরা সেই খৃস্টানদের গোলামে পরিণত হবে, যারা তোমাদের বোনদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। তোমাদের পবিত্র কুরআনের পাতা অলি-গলিতে উড়বে এবং তোমাদের মসজিদগুলো পরিণত হবে ঘোড়ার আস্তাবলে...।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী আরো বলেছেন–

'তোমরা যদি মর্যাদাসম্পন্ন জাতির ন্যায় বেঁচে থাকতে চাও, তাহলে নিজেদের আদর্শ-ঐতিহ্য ভুলো না। খৃস্টানরা একদিকে তোমাদের উপর অত্যাচার করছে, অন্যদিকে ঘোড়া-গাড়ীর লোভ দেখাচ্ছে। মনে রেখ, তোমাদের সম্পদ হল তোমাদের চরিত্র– তোমাদের ঈমান। খৃস্টানরা যে আমাদের কাছে পরাজিত, তার প্রমাণ তারা তোমাদের তীর-তরবারীতে ভীত হয়ে এখন নিজ কন্যাদের বেশ্যা বানিয়ে তোমাদের পিছনে লেলিয়ে দিয়েছে। ওহে আমার জাতির যুবকগণ! তোমরা তোমাদের নীতি-আদর্শ রক্ষা কর। নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কর। অত্যাচারী রাজারা মূলতঃ দুর্বল শাসক হয়ে থাকে। তারা তাদের প্রতিপক্ষের পদানত রাখার চেষ্টা করে কাউকে নীপিড়ন দিয়ে, কাউকে সম্পদের লোভ দেখিয়ে। তোমরা কারো নির্যাতনেও ভয় পেয় না, কারো লোভেও পড় না। তোমরা জাতির ভবিষ্যৎ আমরা জাতির অতীত। দুশমন তোমাদের মস্তিস্ক থেকে তোমাদের গৌরবময় অতীতকে মুছে দিয়ে তাতে তাদের চিন্তা-চেতনা স্থাপন করার চেষ্টা করছে, যাতে ইসলামের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যায়। তাই তোমরা নিজেদের গুরুত্ব অনুধাবন কর। দুশমন শুধু এই কারণে তোমাদেরকে তাদের তাবেদার বানাতে চায় যে, তারা তোমাদের ভয় পায়। দৃষ্টি আজকের উপর নয়, আগামী দিনের উপর নিবদ্ধ রাখ। কারণ, দুশমনের নজর তোমাদের দ্বীন-ধর্মের

ভবিষ্যতের উপর। তোমরা তো দেখেছ যে, দুশমন তোমাদের কি দশা করেছে। তোমরা যদি বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতায় নিপতিত হও, তাহলে গোটা মিল্লাতের ইসলামিয়ার সে পরিণতিই বরণ করতে হবে, যা ঘটছে তোমাদের বেলায়।

গোয়েন্দ ওসমান সারেমকে অতিদ্রুত সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর পয়গাম শুনিয়ে দেন এবং কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সবক দেন। সে বলল–

'মহান সেনাপতি বিশেষভাবে উপদেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা আবেগতাড়িত না হও। বিবেকের উপর আবেগকে বিজয়ী হতে না দেও যেন। কখনো উত্তেজিত না হও। নিজেদেরকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে কাজ কর। সতর্কতা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। কখনো অসাবধান হয়ো না।'

গোয়েন্দা ওসমান সারেমকে জানায়, সে এবং তার দু'সঙ্গী কোন না কোন বেশে এসে তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে। প্রাথমিক পর্যায়ে যে বিষয়টি আবশ্যক, তাহল মুসলমানরা নিজ নিজ ঘরে গোপনে তীর-ধনুক-বর্শা তৈরী করবে। মহিলারা ঘরে বসেই খঞ্জর ও বর্শা চালানোর প্রশিক্ষণ নেবে এবং আক্রমণ প্রতিহত করার কৌশল রপ্ত করবে। ইহুদী মেয়েদের কথায় তারা কর্ণপাত করবে না। তাদের সাথে এমন কোন কথা বলবে না, যাতে তাদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। নিজেদের পক্ষ থেকে তোমরা কোন সামরিক পদক্ষেপ নেবে না। আগে সংগঠিত হও. নেতৃত্ব সৃষ্টি কর। যে যা করবে, সবই যেন নেতার নির্দেশনা মোতাবেক হয়। কারো কোন পদক্ষেপই যেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃকক্ষের অনুমতি ছাড়া না হয়।'

সূর্যটা পশ্চিম আকাশে অস্ত গেল বলে। মসজিদের ঈমাম এসে গেছেন। তাকে দেখেই গোয়েন্দা ক্রুশটা হাতে নিয়ে একদৌড়ে বেরিয়ে যায় মসজিদ থেকে। আবার শুরু হয় সেই ঘোষণা–' মুসলমানগণ! ক্রুশের ছায়ায় এসে পড়। তোমাদের ইসলাম মরে গেছে।'

ঈমাম সাহেব ওসমান সারেমের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'লোকটা এখানে কি করছিল? আর তুমিই বা ওকে ভিতরে এনে বসিয়ে রাখলে কেন? পাগলটাকে মেরে ফেলতে পারলে না? তোমাদের শিরায় কি মুসলমান বাপের রক্ত শুকিয়ে গেছে? বুড়ো না হলে আমি বেটাকে এখান থেকে জ্যান্ত বের হতে দিতাম না।'

'আমি লোকটার পিছনে পিছনে এ জন্যই এসেছিলাম যে, এখান থেকে তাকে জীবন নিয়ে যেতে দেব না।' বলেই ওসমান সারেম ঈমাম সাহেবকে খঞ্জরটা দেখিয়ে আবার বলতে শুরু করল–

'কিন্তু আল্লাহর শোকর, বেচারা ক্রুশ দ্বারা আঘাতটা প্রতিহত করেছে। লোকটা পাগল নয়। খৃস্টান বা ইহুদীও নয়– মুসলমান। এসেছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর পয়গাম নিয়ে।'

ওসমান সারেম বৃদ্ধ ঈমামকে আইউবীর পয়গাম শোনাল এবং বলল, সুলতানের এ পয়গাম আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। এ সন্ধ্যা থেকেই আমি কাজ শুরু করতে যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের একজন নেতার তো প্রয়োজন। আপনি কি নেবেন সে দায়িত্বটা? তবে মনে রাখতে হবে, খৃস্টান সরকার জানতে পারলে আমীরের গর্দানই উড়ে যাবে আগে।

'মসজিদে দাঁড়িয়ে কি আমি কথা বলার দুঃসাহস দেখাতে পারি যে, আমি আমার জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকব? তবে আমি আমীর হওয়ার যোগ্য কিনা সে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব দেশবাসির। আমি আল্লাহর ঘরে দাঁড়িয়ে ওয়াদা করছি যে, আমি আমার মেধা, সম্পদ, সন্তানাদি ও আমার জীবন ইসলামের সুরক্ষায়, দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও ক্রুশের মূলোৎপাটনে কোরবান করব। শোন বৎস, সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রতিটা বর্ণ মুখস্থ করে রাখো। তিনি ঠিকই বলেছেন যে, যুবকরা জাতি ও ধর্মের ভবিষ্যৎ। যুবকরা যেমন নিজেদের দেশ, জাতি ও ধর্মকে আলোকিত করতে পারে, তেমনি পারে তার উল্টোটাও। একজন মুসলিম যুবক যখন ইহুদী-খৃস্টানদের বেহায়াপনার শিকার হয়ে যুবতীদের প্রতি কু-নজরে দৃষ্টিপাত করা শুরু করে, তখন সে বুঝতে পারে না যে, তার আপন বোনও তারই ন্যায় কোন যুবকের কু-দৃষ্টির শিকারে পরিণত হচ্ছে। এখানেই একটি জাতির কবর রচিত হয়। ওসমান, তুমি এই আল্লাহর ঘরে দাঁড়িয়ে ওয়াদা কর, তোমরা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর পয়গাম অনুযায়ী কাজ করবে।' বললেন ঈমাম সাহেব।

✿ ✿ ✿

মাগরিবের নামাজ আদায় করে ওসমান সারেম। ঘরে গিয়ে ছোট বোন আন-নূরকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর পয়গাম শোনায় এবং বলে–

'আন-নূর! আমাদের ধর্ম ও আমাদের জাতি তোমার থেকে অনেক কুরবানী আশা করছে। দেশের সব মুসলমান মেয়ের কাছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর এ পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমি তোমার উপর অর্পণ করলাম। মেয়েদের কাছে সুলতানের এ পয়গাম পৌঁছিয়ে তুমি তাদেরকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত কর। আমি তোমাকে বর্শা-তীর-কামান-খঞ্জরের ব্যবহার শিখিয়ে দেব। তবে সাবধান থাকতে হবে, যেন কেউ ঘুণাক্ষরেও টের না পায় যে, আমরা কি করছি।'

'আমি সবরকম ত্যাগ স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত আছি। নিজেদের আযাদী এবং দেশের জন্য কি করা যায়, সে বিষয়ে আমি ও আমার বান্ধবীরা অনেক আগে থেকেই ভাবছি। কিন্তু পুরুষদের থেকে পরিকল্পনা না পেলে আমরা মেয়েরা কি করতে পারি?' নিজের প্রতিক্রিয়া জানায় আন-নূর।

ওসমান সারেম বোনকে জানায়, সালাহুদ্দীন আইউবী ও তার সেনাবাহিনী সম্পর্কে

এখানে যত খবর প্রচার করা হয়, সবই মিথ্যা। ওসমান আরো জানায়, আমাদের মুসলমানদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা গাদ্দার এবং খৃস্টানদের চর। তোমরা মুসলমানদের ঘরে ঘরে গিয়ে মহিলাদের সঠিক সংবাদ সম্পর্কে অবহিত কর। ওসমান তিন-চারটি পরিবারের কথা উল্লেখ করে বোনকে বলে, তোমরা এসব ঘরে গিয়ে মহিলাদের বলে আসবে, তাদের স্বামীরা বিশ্বাসঘাতক, খৃস্টানদের দালাল। তাদেরকে আরো জানিয়ে আস, তোমরা ইহুদী ও খৃস্টান মেয়েদের প্রীতি থেকে নিজেদের রক্ষা করে চল। ওদের পেয়ার-প্রীতি প্রতারণা বৈ কিছু নয়।

'তাহলে কি আমি রাইনীকে এখানে আসতে নিষেধ করে দেব? ওতো তোমার সঙ্গেও ফ্রি হয়ে গেছে।' জিজ্ঞেস করে আন-নূর।

'ওকে আমি বলে দেব যে, তুমি আর আমাদের ঘরে এসো না। মেয়েটা বড় চটপটে ও বিচক্ষণ।' বলল ওসমান।

রাইনী এক খৃস্টান যুবতী। ওসমান সারেমের ঘরের সামান্য দূরে তার ঘর। পিতা প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তা। মেয়েটির পুরো নাম রাইনী আলেকজান্ডার। আন-নূরের বান্ধবী। ওসমান সারেমের সাথেও প্রেম নিবেদন করতে চেষ্টা করছে মেয়েটি। কিন্তু ওসমান পাত্তা দিচ্ছে না তাকে। আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ওসমান জানে যে, এই খৃস্টান মেয়েটি তাদের কাছে ঘেঁষছে গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য। তবে ওসমান উপরে উপরে ভাব দেখাত, যাতে তার মনে কোন সন্দেহ জাগতে না পারে। কিন্তু এখন তো এ ঘরে তার আনা-গোনা বিপজ্জনক। কিন্তু ওসমান তাকে কি করে বলবে যে, তুমি আর আমাদের ঘরে এসো না। অথচ আনাগোনা তার বন্ধ না করলেই নয়। ওসমানের ঘরে এখন চলবে সামরিক প্রশিক্ষণ।

ভেবে-চিন্তে বুদ্ধি একটা ঠিক করে ওসমান। বোনকে বলে দেয়, রাইনী যদি আবার কখনো আসে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তুমি এই বলে বের হয়ে যেও যে, আমি এক বান্ধবীর নিকট যাচ্ছি, তুমি অন্য সময় এসো। এভাবে মেয়েটাকে উপেক্ষা করতে থাক,দেখবে আপনা থেকেই সে এখনে আসা ছেড়ে দেবে।

পাগলটার কথা এখন কার্কবাসীর মুখে মুখে। খৃস্টানদের নিকট বড় ভালো লেগেছিল লোকটাকে। কিন্তু এখন আর তাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। খুঁজছে সবাই। খুঁজছে সরকার। খৃস্টান সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মুসলমানদের মনে ভীতির সঞ্চার ও মুসলমানদের জযবা দমন করার কাজে পাগলটাকে ব্যবহার করবে। কিন্তু হঠাৎ করে লোকটা কোথায় চলে গেল কেউ জানে না। ঐ যে মসজিদ থেকে বের হল, সে রাতেই হাওয়া হয়ে গেছে সে। দশ-বারো দিন পর্যন্ত চলল তার অনুসন্ধান। কিন্তু পাওয়া গেল না।

এই দশ-বার দিনে ওসমান সারেম তার মিশনকে এগিয়ে নিয়ে গেছে অনেক দূর। বোন আন-নূর ও তার বান্ধবীদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়েছে সে। বড় পরিশ্রম করে তরবারী চালনা শিক্ষা দিয়েছে সে মেয়েগুলোকে। তাছাড়া গোপনে গোপনে সে সুলতান আইউবীর পয়গাম শুনিয়ে শুনিয়ে মুসলিম যুবকদের সংঘবদ্ধ করে তুলে। যুবকরা হাত করে নেয় তীর-ধনুক-বর্শা প্রস্তুতকারী কারীগরদের। এরা সকলেই খৃষ্টানদের বেতনভোগী কর্মচারী। নিজেদের জন্য কোন অস্ত্র তৈরী করতে পারেনা তারা। অস্ত্র রাখা মুসলমানদের জন্য অন্যায়।

কিন্তু এবার তারা নিজ নিজ ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে অস্ত্র তৈরী শুরু করে দেয়। এ এক মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। ধরা পড়লে শুধু মৃতুদণ্ড-ই যে ভোগ করতে হবে তা নয়, মৃতুর আগে খৃষ্টানদের নির্মম অত্যাচার সহ্য করতে হবে তাদের। এখানে কোন মুসলমান কোন লঘু অপরাধে কিংবা সন্দেহবশত: ধরা পড়লে তাকে জিজ্ঞাসা করা হত, মুসলমানদের ঘরে কি হচ্ছে এবং তোমাদের গোয়েন্দারা কোথায়। তার সঙ্গে সঙ্গে তুলোধুনা করা হত তাদের শরীরে।

কারীগরদের তৈরী করা অস্ত্রগুলো বিভিন্ন ঘরে লুকিয়ে রাখছে ওসমান সারেমের সহকর্মী যুবকেরা। দিনের বেলা মেয়েরা বোরকা পরে লুকিয়ে লুকিয়ে তীর -ধনুক-খঞ্জরগুলো নিয়ে যেত বিভিন্ন মুসলমানের ঘরে। কিন্তু অস্ত্র তৈরী এবং ঘরে ঘরে পৌঁছানোর কাজটা চলছে খুব ধীরগতিতে।

ওদিকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট সংবাদ পৌঁছে গেছে যে, কার্ক ও তার আশপাশের মুসলমানদের ঘরে ঘরে আপনার পয়গাম পৌঁছে গেছে এবং সেখানকার মুসলিম যুবক-যুবতীরা আন্ডারগ্রাউন্ড তৎপরতা শুরু করে দিয়েছে। একজন বিচক্ষণ ও নির্ভীক গোয়েন্দা সংবাদটা পৌঁছিয়ে দিয়েছে সুলতানের কাছে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে সে জানায়, ওসমান সারেমের নিকট যে গোয়েন্দা পাগলের বেশ ধারণ করে আপনার পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছে, সে ষোলআনা সাফল্য অর্জন করেছে। এ সংবাদ শুনে সুলতান খুব খুশী হলেন এবং বললেন, 'যে জাতির যুবকেরা সজাগ হয়ে যায়, কোন শক্তি তাদের পরাজিত করতে পারে না।'

'এই সাফল্য আমার সাহস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। আপনার অনুমতি পেলে অধিকৃত অঞ্চলের যুবকদের আমি এমনভাবে উত্তেজিত করে তুলতে পারি যে, তারা অগ্নিস্ফূলিঙ্গে পরিণত হয়ে সমগ্র কার্ক ও জেরুজালেমে আগুন ধরিয়ে দেবে।' বলল গোয়েন্দা উপ-প্রধান জাহেদান।

'আর সেই আগুনে তারা নিজেরাও পুড়ে মরবে'– বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী– 'আমি যুবকদের অগ্নিস্ফূলিঙ্গ বানাতে চাই না। আমি তাদের বুকে ঈমানের আগুন জ্বালাতে চাই। যুবসমাজকে উত্তেজিত করে তোলা কঠিন কাজ নয়। বন্দুকের

মুখ খুলে দিয়ে দেখ, কিভাবে তারা তোমার কথায় উঠাবসা করতে শুরু করে। অধিকাংশকে জ্বালাময়ী বক্তৃতা আর উত্তেজনাকর শ্লোগানে মাতিয়ে তোলা যায়। তারপর তুমি তাদের দিয়ে যা করাতে চাও করাতে পার। তুমি তাদের আপসেও লড়াতে পার। তার কারণ এই নয় যে, তারা বোকা ও গোঁয়ার। তার অর্থ এই নয় যে, তাদের নিজস্ব বুদ্ধি নেই। আসল কারণ হল, এই বয়সটাই এমন হয়ে থাকে যে, রক্তের উষ্ণতা তাদের কিছু একটা করতে বাধ্য করে। এ সময়ে মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আবার সৎকর্মের প্রতিও ঝুঁকে পড়ে। তরুণ মেধাগুলোকে তুমি যেভাবে ব্যবহার করতে চাইবে, সেভাবেই ব্যবহৃত হবে। আমাদের দুশমন আমাদের এই নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিলাসিতা ও পাশবিকতার জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য একটাই, যাতে আমরা আমাদের যুবসমাজকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে দুশমনের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে না পারি। তুমি বরং এই চেষ্টা চালিয়ে যাও, যাতে আমাদের যুবকরা উত্তেজিত না হয়। যাতে তারা ঠান্ডা মাথায় ভাবতে শিখে। আমাদের প্রিয়নবী (সঃ) বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের পরিচয় লাভ কর এবং শত্রু-মিত্র চিহ্নিত কর।' তুমি নিজেও এ মহান শিক্ষা অনুযায়ী আমল কর এবং যুবকদের এ কথাটি বুঝাও। যুবকদের চিন্তা-চেতনা পাল্টিয়ে দাও। তাদের মধ্যে ঈমান ও দেশপ্রেম জাগ্রত কর। এটি দেশের যুবসমাজের বড় মূল্যবান সম্পদ। তুমি ওদেরকে উত্তেজিত হয়ে পুড়ে জীবন দেয়া থেকে রক্ষা কর। যুবকদের মৃত্যুর হাতে ঠেলে দেয়া বুদ্ধির কাজ নয়। তাদের হাতে দুশমনদের শেষ করাও। এটা বুদ্ধিমানের কাজ। তবে দুশমন কারা, তা ওদের স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। কোন মুসলমান যদি আমাকে মন্দ-শক্ত বলে, তবে সে না ইসলামের দুশমন, না গাদ্দার। সে আমার দুশমন । ইসলাম ও সালতানাতে ইসলামিয়ার সুরক্ষার জন্য প্রণীত আইনের আশ্রয়ে আমি তাকে শাস্তি দেব না। দেশের আইন দেশনেতার ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রয়োগ করা যাবে না। গাদ্দারীর সাজা তাকেই দেয়া হবে, যে দেশ ও জাতির মূলোৎপাটন ও ইসলামের শত্রুদের হাত শক্ত করে। দেশনেতা নিজেও যদি এ দোষে দুষ্ট হন, তাহলে তিনিও গাদ্দার এবং শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।'

'তাহলে কী কারা যায়? সেখানকার যুবকরা তো প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের পরিকল্পনার অপেক্ষায় প্রহর গুণছে।' জিজ্ঞেস করলেন জাহেদান।

'তাদেরকে হুঁশ-জ্ঞান ঠিক রেখে অগ্রসর হতে বল– জবাব দেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী– 'তাদের চিন্তা-চেতনাকে জাগিয়ে তোল। সেখানকার পরিস্থিতি অনুপাতে তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবে, কি করতে হবে। আবেগের বশীভূত হয়ে যেন কিছু না করে ফেলে, সে মানসিকতা তাদের মধ্যে সৃষ্টি কর। সেখানে আরো বেশী করে বিচক্ষণ চর পাঠাও। স্মরণ রেখ জাহেদান! দুশমন আমাদের নয়-ধ্বংস করতে

চাইছে আমাদের যুবসমাজের চরিত্র কিংবা সেই কর্মকর্তাদের, যাদের বিবেক কিশোরদের ন্যায় আনাড়ী। একটি জাতিকে যদি তুমি যুদ্ধ ছাড়া পরাজিত করতে চাও, তা হলে সে জাতির যুবকদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতায় ডুবিয়ে দাও। দেখবে, সে জাতি এমনভাবে তোমাদের গোলামে পরিণত হবে যে, তারা আপন স্ত্রী-কন্যা-বোনদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে গর্ববোধ করবে। ইহুদী-খৃস্টানরা আমাদেরকে এ ধারায়ই ধ্বংস করতে চাইছে।'

হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গেল সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর। জাহেদানকে বললেন, কার্কের যেসব মুসলমান অস্ত্র তৈরি করছে, কাকে যেন বলেছিলাম, যেন তাদের কাছে বারুদ পৌঁছিয়ে দেয় কিংবা তাদেরকে বারুদ তৈরি করার ফর্মুলা এবং ব্যবহারের প্রক্রিয়া শিখিয়ে দেয়। কিন্তু তার কি হল, জানতে পারলাম না।

'হ্যা, তা তাদের শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। খবর পেয়েছি, মুসলমানরা বারুদ তৈরির কাজ শুরুও করে দিয়েছে।' জবাব দেন জাহেদান।

❁ ❁ ❁

আকস্মিকভাবেই কার্কে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে গেল যে, সেখানকার মুসলিম যুবকেরা আপনা-আপনিই জেগে উঠল। অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে খৃস্টানরা কাফেলা লুণ্ঠনেরও ধারা শুরু করে রেখেছিল। দস্যু-তস্করের ভয়ে ব্যবসায়ী ও অন্যান্য ভ্রমণকারীরা একত্রিতভাবে সফর করত। অনেক সময় এক একটি কাফেলার সদস্য সংখ্যা দেড়-দু'শ হয়ে যেত। সশস্ত্র যোদ্ধাও থাকত কাফেলায়। উট-ঘোড়া থাকত প্রচুর। বিপুল পণ্যদ্রব্য নিয়ে এক স্থান থেকে অন্যত্র যেত বণিকরা। এক এক সময় এক এক স্থানে অবস্থান করত তারা। অল্প ক'জন ডাকাতের পক্ষে এসব কাফেলা লুট করা সম্ভব ছিল না। আক্রান্ত হলে মোকাবেলা করত তারা। এই লুট-তরাজের কাজটা করত খৃস্টান সৈন্যরা। কোন পথে কোন মুসলিম কাফেলার গমনের সংবাদ পেলেই দু'এক প্লাটুন সৈন্যকে মরুচারী লোকের বেশে প্রেরণ করে সেটি লুট করাত। কাফেলায় থাকত শুধু মুসলমান। এই অপকর্ম সেসব খৃস্টান সম্রাটগণও করিয়েছেন এবং লুণ্ঠিত সম্পদের ভাগ গ্রহণ করেছেন, যাদেরকে আজ ইতিহাসে ক্রুশের লড়াইয়ের হিরো বলে পরিচিত করা হচ্ছে।

এ অপকর্মে কতিপয় মুসলমান আমীরও শামিল ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতগুলো প্রদেশের শাসক ছিল তারা। সৈন্যও ছিল তাদের কাছে। লুণ্ঠিত কাফেলার দু'চারজন লোক তাদের নিকট গিয়ে ফরিয়াদও পেশ করত। কিন্তু মজলুমের সেই আহজারি ঢুকত না তাদের কানে। কারণ, নারী,মদ আর উপঢৌকনের নামে তাদেরও ভাগ দিত খৃস্টানরা। মদ-নারী আর অর্থের লোভে পড়ে নিজেদের ঈমান ও স্বাধীনতা-স্বকীয়তা খৃস্টানদের কাছে বিকিয়ে দিয়েছিল তারা।

এ মুসলিম প্রদেশগুলো কব্জা করতে চাইছেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। এ মুসলিম শাসকদেরকে খৃস্টানদের চাইতেও ভয়ংকর মনে করছেন তিনি। সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী একবার তাঁর নিকট একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন। তাতে তিনি নানা প্রসঙ্গের মধ্যে এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম প্রদেশগুলো সম্পর্কে একথাটিও লিখেছিলেন যে, 'এ মুসলিম শাসকগণ নিজেদের জাগতিক সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসের নিমিত্ত প্রদেশগুলোকে খৃস্টানদের কাছে বন্ধক রেখেছে। কাফেরদের নিকট থেকে উপঢৌকন, সোনা-চাঁদী আর অপহৃত মুসলিম যুবতীদের গ্রহণ করছে আর ইসলামের নাম ডুবিয়ে চলেছে। এ মুসলমানরা খৃস্টানদের চেয়েও বেশী অপবিত্র ও অধিক ভয়ংকর। ক্ষমতার নেশায় বুঁদ হয়ে আছে তারা। খৃস্টানরা ঢুকে পড়েছে তাদের একেবারে শিকড়ে। তাই খৃস্টানদের পরাজিত করার আগে প্রদেশগুলো কব্জা করে সালতানাতে ইসলামিয়ার সাথে একীভূত করে ফেলা এবং বাগদাদের খেলাফতের অধীনে নিয়ে আনা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া ইসলামের সুরক্ষা সম্ভব নয়।'

একদিনের ঘটনা। কার্ক থেকে মাইল কয়েক দূর দিয়ে পথ অতিক্রম করছে বিশাল এক কাফেলা। কাফেলায় আছে একশ'রও বেশী উট, আছে অসংখ্য ঘোড়া। উটের পিঠে বোঝাই ব্যবসায়ীদের পণ্য। আছে এমন একটি পরিবার, যার দু'সদস্য যুবতী মেয়ে। সম্পর্কে তারা বোন।

কার্ক থেকে মাইল কয়েক দূর দিয়ে অতিক্রম করছিল কাফেলাটি। এ সংবাদ পেয়ে গেছে খৃস্টানরা। সাথে সাথে এক দল সৈন্য পাঠিয়ে দেয় তারা। দিন দুপুরে হামলা করে বসে কাফেলার উপরে। আক্রমণ মোকাবেলা করে কাফেলার অশ্বারোহী যাত্রীরা। কিন্তু সংখ্যায় খৃস্টানরা অনেক। রক্তে লাল হয়ে যায় সেখানকার বালুকাময় ভূমি। কাফেলার শিশু-কিশোরদের পর্যন্ত রেহাই দেয়নি খৃস্টান দস্যুরা। যুদ্ধ শেষে এখন বেঁচে আছে মাত্র পনের-ষোলজন মুসলমান। বন্দী করে ফেলা হয় তাদের। আটক করা হয় মেয়ে দু'টোকে। উট-ঘোড়া ও মালামালসহ তাদের নিয়ে যাওয়া হয় কার্কে।

কাফেলা প্রবেশ করছে কার্কে। সম্মুখে মুসলিম বন্দীরা। তাদের পিছনে দু'টি ঘোড়ায় সওয়ার মেয়ে দু'টো। তাদের পোষাকই বলে দিচ্ছে, তারা মুসলমান। মেয়েদের পিছনে মুখোশপরিহিত খৃস্টান দস্যুরা। সর্ব পিছনে মাল বোঝাই উটের বহর।

মেয়ে দু'টো কাঁদছে। তামাশা দেখার জন্য রাস্তায় নেমে এসেছে কার্কের লোকজন। হাত তালি দিচ্ছে তারা। দাঁত বের করে খিলখিল করে হাসছে। কারণ, তারা জানে লুণ্ঠিত এ কাফেলাটি মুসলমানের। বন্দীরাও মুসলমান।

বন্দীদের একজনের নাম আফাক। বয়সে যুবক। অপহৃত মেয়ে দু'টো তার বোন। আফাক আহত। কপাল ও কাঁধ থেকে রক্ত ঝরছে দর্ দর্ করে। কাফেলার আগে আগে শহরে প্রবেশ করে সে। উৎফুল্ল জনতাকে উদ্দেশ করে উচ্চস্বরে সে বলে, কার্কের মুসলমানগণ! তোমরা আমাদের তামাশা দেখছ? গলায় রশি বেঁধে ডুবে মরতে পার না? ঐ মেয়ে দু'টোর প্রতি চেয়ে দেখ। ওরা শুধু আমার বোন নয়- তোমাদেরও বোন। ওরা মুসলমান।

পেছন থেকে আফাকের ঘাড়ে ধাক্কা মারে এক খৃস্টান। উপুড় হয়ে পড়ে যায় আফাক। হাত দু'টো তার রশি দিয়ে পিঠমোড়া করে বাঁধা। তাঁকে ধরে তুলে দেয় বন্দীদের একজন। চীৎকার করে আফাক। বলে, 'কার্কের মুসলমানগণ! এরা তোমাদের কন্যা...।' আর বলতে পারে না আফাক। পেটাতে শুরু করে তাকে দু'তিনজন মুখোশধারী। চীৎকার করে করে কাঁদছে তার বোনরা। তারা ফরিয়াদ করছে—'আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা আমার ভাইকে মের না। আমাদের সাথে তোমরা যেমন আচরণ করতে চাও,কর। তবু মের না আমাদের ভাইকে।'

এক বোন চীৎকার করে বলে,'চুপ হয়ে যাও আফাক! তুমি ওদের কিছু করতে পারবে না।' কিন্তু আফাক থামছে না।

কিছু মুসলমানও আছে উৎসুক জনতার মধ্যে। আগুন জ্বলছে তাদের গায়ে। কিন্তু তারা অসহায়। তাদের অনেকে যুবক। আছে ওসমান সারেমও। যুবক বন্ধুদের প্রতি তাকায় ওসমান। চোখগুলো লাল হয়ে গেছে তাদের সকলের। প্রতিশোধের আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে যেন তাদের চোখ থেকে।

অনেক দূর পর্যন্ত কাফেলার সাথে হেঁটে যায় ওসমান সারেম। এক জায়গায় রাস্তার পাশে বসে আছে এক মুচি। মানুষের জুতা সেলাই করছে সে। একজন মুসলমানের ঘরের আঙ্গিনায় রাত কাটায় লোকটা। সারাদিন বাইরে বসে জুতা সেলাই করে। এটা তার পেশা। কিন্তু আশ্চর্য, কাফেলাটি তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করল, আফাকের ডাক-চীৎকার তার কানে ঢুকল, শুনল মেয়ে দু'টোর আহাজারি। অথচ একটি মাত্র নজর চোখ তুলে তাকিয়ে সাথে সাথে মাথা নুইয়ে মন দিল নিজের কাজে। আবার জুতা সেলাই। যেন কিছুই দেখল না, কিছুই শুনল না লোকটা।

এই মুচিকে কেউ না দেখেছে মসজিদে যেতে, না দেখেছে গীর্জায়, না দেখেছে ইহুদীদের উপাসনালয়ে। কারো কোন কৌতূহল নেই তাকে নিয়ে। পায়ের জুতা ছিঁড়ে গেলেই তার কথা মনে পড়ে সকলের। লোকটাকে কেউ কখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলতে শুনেনি। সৃষ্টির এক আজব প্রাণী লোকটা। লোকটার না আছে ঐ খৃস্টানদের প্রতি কোন আগ্রহ, না আছে মুসলমানদের সাথে কোন সম্পর্ক।

কাফেলার সাথে হাঁটছে ওসমান সারেম। মুচির সন্নিকটে গিয়ে থেমে যায় সে। বন্দীরা চলে গেছে আগে। এখন যাচ্ছে উটের বহর। একেবারে পিছনের উটটাও অতিক্রম করে এগিয়ে গেছে। এবার পায়ের জুতা জোড়া খুলে নিয়ে রেখে দেয় মুচির সামনে। বসে পড়ে লোকটার সম্মুখে। মাথা নুইয়ে একজনের জুতা মেরামত করছিল মুচি। ওসমান সারেমের প্রতি মাথা তুলে তাকালও না সে। ওসমান ইতিউতি দৃষ্টিপাত করে ফিসফিসিয়ে বলে, 'মেয়ে দু'টোকে আজ রাতেই মুক্ত করতে হবে।'

'জান রাতে তারা কোথায় থাকবে?' মাথা না তুলেই ক্ষীণ কণ্ঠে ওসমানকে জিজ্ঞেস করে মুচি।

'জানি। থাকবে খৃস্টান সম্রাটদের কাছে। কিন্তু আমাদের কেউ সেই স্থানটি ভেতর থেকে দেখেনি।' জবাব দেয় ওসমান সারেম।

'আমি দেখেছি। সেখান থেকে মেয়েদের বের করে আনা সম্ভব নয়।' নিজের কাজে নিমগ্ন থেকে জবাব দেয় মুচি।

'তুমি তাহলে কোন্ ব্যধির দাওয়াই?' ওসমানের কণ্ঠে যেমন তীব্র আবেগ, তেমনি প্রচন্ড ক্ষোভ। বলে, 'তুমি আমাদের রাহ্‌বরী কর। আমরা যদি মেয়েদের পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে ধরা পড়ি, তাহলে মেয়ে দু'টোকে খুন করে ফেলব। তারপর যা হওয়ার হবে। খৃস্টানদের নিকট ওদেরকে জীবিত থাকতে দিব না।'

'তুমি ক'জন যুবকের কুরবানী দিতে চাও?' জিজ্ঞেস করে মুচি।

'যে ক'জন দরকার।'

'ঠিক আছে, কাল রাত।'

'না, আজ রাত। আজ রাতেই বারজিস! আজ রাতেই।

'ইমামের নিকট চলে যাও।' বলল মুচি।

'যুবক ক'জন?' জিজ্ঞেস করে ওসমান।

খানিক চিন্তা করে বারজিস বলল, আট... অস্ত্র শুনে নাও–খঞ্জর।

জুতো জোড়া পায়ে দিয়ে উঠে চলে যায় ওসমান সারেম।

✿ ✿ ✿

সূর্য এখনও ডুবেনি। ওসমান সারেম সাতজন বন্ধুকে ঘর থেকে ডেকে নেয়। ঈমাম সাহেবের নিকট যেতে বলে এবং নিজে ঈমামের ঘরে চলে যায়। ইনি সেই মসজিদের ঈমাম, যেখানে পাগলের সাথে সাক্ষাত হয়েছিল ওসমানের। ওমসানই ঈমামকে তার আন্ডারগ্রাউন্ড দলের নেতা হওয়ার প্রস্তাব করেছিল। দলের সব সদস্য বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিয়েছিল সে প্রস্তাব। এরা এক সময় একজনের ঘরে বসে মিটিং করছে এবং কর্মসূচী প্রস্তুত করছে। এখন তাদের সামনে অপহৃতা এই মেয়ে দু'টোর উদ্ধার করার পালা। ওসমান সারেম মেয়েদের উদ্ধারের সংকল্প নিয়েছে, যা মূলত আত্মহত্যার শামিল। মুচির কথা অনুযায়ী ইমামের ঘরে চলে গেছে সে।

অস্থিরচিত্তে ঘরের বারান্দায় পায়চারী করছেন ইমাম। ওসমান সারেমকে দেখেই তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন. 'তুমি কি ঐ বন্দী মুসলমানটার আহাজারি শুনেছ ওসমান?'

'আমি সেই ডাকে লাব্বাইক বলতেই এসেছি মহামান্য ইমাম! বারজিস আসছেন। আমার সাত বন্ধুও আসছে।' বলল ওসমান সারেম।

'তুমি কী করবে? করতে পারবেই বা কী? আমাদের অনেক মেয়েই তো কাফেরদের হাতে বন্দী। কিন্তু এ মেয়ে দু'টো আমাকে মহা এক পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে।' বললেন ইমাম। খানিক নীরব থেকে মাথাটা উপরে তুলে গভীর এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ইমাম আবার বললেন, 'ইয়া আল্লাহ! এই একটি রাতের জন্য তুমি আমায় যুবক বানিয়ে দাও, না হয় আজ রাতেই আমাকে তুমি তোমার কাছে নিয়ে যাও। বেঁচে থাকলে আজীবন মেয়ে দু'টোর আর্তচীকার আমার কানে বাজতেই থাকবে আর আমি পাগল হয়ে যাব।'

'আপনি আমাদের পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করুন। আমি আশা করি, এক রাতের বেশী আপনাকে অস্থির থাকবে দেব না।' বলল ওসমান সারেম।

ভিতরে প্রবেশ করে ওসমান সারেম-এর দু'সঙ্গী। ইমাম তাদের বসতে বলে তিনজনকেই উদ্দেশ করে বললেন–

'আজ আমার মনে হচ্ছে, আমার বিবেক-বুদ্ধি সব হারিয়ে গেছে। আমি আমার নিয়ন্ত্রণ হারিয়া ফেলেছি। কিন্তু কেউ যদি আত্মমর্যাদাবোধের কথা স্মরণ করিয়ে আহ্বান জানায়, তাহলে চেতনা ক্ষেপে উঠে আর তখনই তাকে শান্ত করার জন্য যুবক হতে হয়। কিন্তু বৎসরা! আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। এখন আর আমার সহনশক্তি নেই। তোমরা যা কিছু করতে চাও, সামলে কর।'

এক একজন করে সাত যুবকই সমবেত হয় ইমামের ঘরে। মুচিও এসে পড়ে খানিক পরে। হাতে তার বাক্স। ভিতরে পুরনো ছেড়া জুতো আর জুতা সেলাইয়ের যন্ত্রপাতি। ভিতরে ঢুকেই বাক্সটা এক ধারে রেখে কোমর সোজা করে দাঁড়ায় সে। এবার কে বলবে লোকটা দুনিয়ার সব কোলাহল– ঝক্কি-ঝামেলার সাথে সম্পর্কহীন একজন মুচি, যে রাস্তার পার্শ্বে বসে মানুষের ছেড়া জুতা সেলাই করে?

ইমাম সাহেবের রুদ্ধদ্বার ঘরে এখন সে মুচি নয়- বারজিস। আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বিভাগের গোপন শাখার একজন অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ গুপ্তচর। ইমামকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন–

'এ ছেলেটি আজই ঐ মেয়ে দু'টোকে খৃস্টানদের বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করে আনতে চায়। আমি মনে করি, এতে ধরা পড়ার কিংবা ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকিই নয়- মৃত্যুর ঝুঁকিও প্রায় ষোল আনা।'

'আমরা এ ঝুঁকি বরণ করে নিচ্ছি মোহতারাম বারজিস! আপনি এ বিদ্যার গুরু। আপনি আমাদের পথনির্দেশ করবেন।' বলল এক যুবক।

'তাহলে আমার পরামর্শ শোন'– বারজিস বললেন- 'খৃস্টানদের কাছে অনেক মুসলমান মেয়ে আছে। তাদের কতিপয়কে তারা শৈশবে বিভিন্ন কাফেলা ও বাড়ি-ঘর থেকে অপহরণ করে এনেছিল এবং তাদের মত করে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি ও তোমাদের চরিত্র-ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করছে। এই সব মেয়েকে তোমরা মুক্ত করাতে পারবে না। তোমরা যদি আমার বিদ্যা থেকে উপকৃত হতে চাও, তাহলে আমি বলব, দু'টি মাত্র মেয়ের জন্য আটটি যুবক কোরবান করে দেয়া বুদ্ধিমত্তা নয় এবং তোমাদের ধৈর্যের সাথে কাজ করা দরকার।'

'কিন্তু আমি কিভাবে ধৈর্যধারণ করতে পারি?' গর্জে উঠে ওসমান সারেম।

'আমার ন্যায়'– বারজিস বললেন–'আমি কি পেশাদার মুচি? আমি যখন মিসরে অবস্থান করি, তখন আমার সওয়ারীর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে আরবী ঘোড়া। আমার ঘরে আছে দু'টি চাকর। আর এখানে কিনা তিনটি মাস ধরে আমি মুচিগিরি করছি। রাস্তায় বসে মানুষের ময়লাযুক্ত পুরনো জুতা মেরামত করছি। আমি তোমাদেরকে সমগ্র কার্ক এবং তারপরেরও বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুক্ত করার জন্য জীবিত রাখতে চাই। তোমরা ধৈর্য ধর, অপেক্ষা কর।'

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে ওসমান সারেম ও তার সঙ্গীদের। তাদের কথা-বার্তায় বুঝা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে অপেক্ষা করার হিম্মত অবশিষ্ট নেই। কেউ রাহনুমায়ী না করলেও নিজেরাই সেখানে হামলা করতে প্রস্তুত। ইমামের কথাও মান্য করতে অস্বীকৃতি জানায় তারা। অগত্যা বারজিস তাদের জানায়, খৃস্টান সম্রাটগণ রাতে যে স্থানে সমবেত হন এবং যেখানে তাদের মদের আসর বসে, তার দু'গোয়েন্দা সেখানকার সাধারণ কর্মচারী। শোবক জয়ের পর সেখান থেকে পালিয়ে আসা খৃস্টানদের সাথে এসে এখানে এসেছিল তারা। এখন তারা খৃস্টান সরকারের চাকরী করছে আর সফল গুপ্তচরবৃত্তি করছে।

বৃটেন, ইটালী, ফ্রান্স ও জার্মানী প্রভৃতি দেশ থেকে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আসা খৃস্টান সম্রাটগণ যে প্রাসাদটিতে থাকেন, সেটি তোমরা অবশ্যই দেখেছ। প্রাসাদে বড় একটি কক্ষ আছে। সে কক্ষে সন্ধ্যার পর তারা একত্রিত হন এবং মদপান করেন। তাদের বিনোদনের জন্য থাকে অনেকগুলো সুন্দরী মেয়ে। আধা রাত পর্যন্ত চলে তাদের আসর।

স্থানটি খানিকটা উচুঁতে। সশস্ত্র পাহারাও থাকে। সেই ভবন পর্যন্ত পৌছানো তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, বিশিষ্ট কোন নাগরিকের পক্ষেও তার কাছে যাওয়া অসম্ভব। মেয়ে দু'টোকে কোথায় রাখা হয়েছে, সে খবর

আমি তোমাদের দিতে পারব। কিন্তু তাদের পর্যন্ত পৌঁছানোর একমাত্র পন্থা, আমাদের সৈন্যরা বাইরে থেকে এক্ষুণি হামলা করবে। তাহলে খৃস্টান সম্রাট ও সামরিক কর্মকর্তাগণ ভবন ছেড়ে চলে যাবে এবং হামলা প্রতিহত করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু হামলা যে আজ রাতে হবে না, তাতো নিশ্চিত। সালাহুদ্দীন আইউবী কবে হামলা করবেন, তারও কোন ঠিক নেই।

'প্রয়োজন হামলার, না? অর্থাৎ প্রয়োজন উক্ত প্রাসাদে যারা আছে, তাদের সেখান থেকে সরে যাওয়া এবং মেয়েগুলোর সেখানে অবস্থান করা। অমনটি হলে আমাদের এই যুবকরা প্রাসাদে ঢুকে পড়ে মেয়েগুলোকে তুলে আনবে। এই তো বলতে চাচ্ছেন আপনি?' বারজিসের পরিকল্পনাটা খোলাসা করে বুঝে নিতে চান ইমাম।

'জি হ্যা'– পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে জবাব দেন বারজিস– 'যদি শহরে মারাত্মক ধরনের কোন হাঙ্গামা সৃষ্টি করে দেয়া যায়– যেমন, কোথাও আগুন লাগিয়ে দেয়া হল আর সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ল খৃস্টানদের সমর সরঞ্জামাদিতে, তাহলে হয়ত সম্রাটগণ এবং অন্যান্যরা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে দুর্ঘটনাস্থলে চলে যাবেন। এই সুযোগে...।'

গভীর চিন্তায় হারিয়ে যান বারজিস। ওসমান সারেম ও তার সঙ্গীদের প্রতি এক এক করে দৃষ্টিপাত করেন তিনি। খানিক পরে বললেন,'হ্যা আমার মুজাহিদগণ! একটি জায়গায় যদি তোমরা আগুন লাগাতে পার, তাহলে মেয়েদের মুক্ত করার সুযোগ বেরিয়ে আসতে পারে।'

'জলদি বলুন, মোহতারাম! বলুন কোথায় আগুন লাগাতে হবে? আপনি বললে গোটা শহরেও আমরা আগুন ধরিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি।' অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে ওসমান সারেম।

'খৃস্টানদের সামরিক ঘোড়াগুলো কোথায় বাঁধা থাকে, তা তো তোমরা জান'–বারজিস বললেন– 'এ মুহূর্তে সেখানে অন্ততঃ ছয়শত ঘোড়া বাঁধা আছে। বাকীগুলো অন্যান্য স্থানে। নিকটেই বাঁধা আছে প্রায় সমপরিমাণ উট। তার খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে শুক্‌নো খড়ের বিশাল এক পাহাড়। তার থেকে সামান্য ব্যবধানে সেনা ছাউনির সারি। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো ঘোড়া-গাড়ী আর বিপুল পরিমাণ এমন কিছু সরঞ্জাম, যাতে সহজে আগুন ধরে যেতে পারে। কিন্তু চাইলেই সেখানে যাওয়া যায় না। অস্ত্র হাতে টহল দিচ্ছে সেন্ট্রিরা। রাতের বেলা সে পথে গমন করার অনুমতি নেই কারুর। তোমরা যদি এই খড়ের গাদা আর তাঁবুর সারিতে আগুন ধরিয়ে দিতে পার, তাহলে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, খৃস্টান সম্রাটগণ জগতের সবকিছু ভুলে গিয়ে তৎক্ষণাৎ প্রাসাদ ত্যাগ করে সেখানে ছুটে যাবে। আগুনের লেলিহান শিখা আকাশ স্পর্শ করবে। আতংক ছড়িয়ে পড়বে শহরময়। তাছাড়া আগুন লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে যদি তোমরা যত সম্ভব ঘোড়ার রশি খুলে দিতে পার, তাহলে আতংকিত ঘোড়াগুলো এদিক-ওদিক ছুটাছুটি শুরু করে সৃষ্টি করবে আরেক

প্রলয়কান্ড। মানুষজন পিষ্ট হবে তাদের পায়ের তলায়। কিন্তু আগুন কে লাগাবে, ঘোড়ার বাঁধন কে খুলবে এবং আগুন লাগাবার জন্য সেখানে কিভাবে পৌঁছুবে, তাই আগে ভাববার বিষয়।'

'ধরে নিন, আগুন লেগে গেছে। প্রাসাদও শূন্য হয়ে গেছে। এখন আমাদের করণীয় কি?' জিজ্ঞেস করে এক যুবক।

'আমি সঙ্গে থাকব'– জবাব দেন বারজিস–'উক্ত প্রাসাদে আমাকে ছাড়া তোমরা যেতে পারবে না। ওখানে আমার দু'জন সহকর্মী আছে। তারাই জানাবে, মেয়েরা কোথায় আছে। কিন্তু মেয়ে দু'টোকে উদ্ধার করে এনে রাখবে কোথায়? তাছাড়া ঘটনার পর কার্কের সাধারণ মুসলমানদের উপর যে কেয়ামত নেমে আসবে, তা-ও তোমাদের ভেবে দেখা দরকার। এ যে মুসলমান ছাড়া অন্য কারো কাজ নয়, খৃস্টানরা তা নিশ্চিতভাবেই বুঝে নেবে।'

'মুসলমানরা এখন কি সুখে আছে!' বললেন ইমাম– 'আমার পরামর্শ, কাজটা হয়ে যাক। খৃস্টানরা জানা দরকার যে, মুসলমান যতই নিরাশ্রয়, যতই অসহায় হোক না কেন, কারো গোলাম হয়ে থাকতে রাজী নয়। আর মুসলমানের আঘাত যে দুশমনের কলিজা ছেদিয়ে দেয়, তাও ওদের টের পাইয়ে দেয়া জরুরী।'

বারজিস কমান্ডো ধরনের গোয়েন্দা বটে। কিন্তু এ জাতীয় নাশকতামূলক অভিযানের সুযোগ তার কখনো ঘটেনি। এমন দুর্ধর্ষ অভিযান পরিচালনা করা তার মতেও আবশ্যক, যাতে খৃস্টানরা বুঝতে পারে যে, মুসলমান কেমন চীজ।

ওসমান সারেম ও তাঁর সঙ্গীদের কর্তব্য বুঝাতে শুরু করলেন বারজিস। দু'টি কাজ বেশী স্পর্শকাতর। প্রথমতঃ আগুন ধরানোর জন্য যাবে তিন-চারটি মেয়ে। সেনা প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার নাম করে সেন্ট্রির কাছে গিয়ে আলাপ জুড়ে দিয়ে এক পর্যায়ে সেন্টিকে খুন করে ফেলবে তারা। বারজিসের এ কাজের জন্য মেয়েদের নির্বাচন করার কারণ, মহিলারা, বিশেষত যুবতী মেয়েরা পুরুষের মনে যে প্রভাব ফেলতে পারে, তা পুরুষরা পারে না। দ্বিতীয়তঃ ক'জন যুবক সম্রাটদের প্রাসাদে আক্রমণ চালাবে। বারজিস ও ইমাম একমত হলেন যে, বেশী প্রয়োজন নেই–মাত্র এই আটজনই যথেষ্ট। কারণ, লোক বেশী হলে কেউ না কেউ ধরা পড়ে যাওয়ার আশংকা থাকবে।

প্রশ্ন আসে, এতগুলো সাহসী বুদ্ধিমতী মেয়ে পাওয়া যাবে কোথায়। ওসমান সারেম বলল, একজন থাকবে আমার বোন আন-নূর। আরেক যুবক বলল, আমার বোনকেও নেয়া যাবে। অপর ছয় যুবকের বোন নেই। তবে এরা দু'জন এদের বান্ধবীদের মধ্য থেকে একজন করে নিতে পারবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়। চারজনই যথেষ্ট। মেয়েদেরকে কাজ বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিজের হাতে রাখেন বারজিস।

সূর্য ডুবে গেছে। ইমাম সাহেব উঠে চলে গেছেন একদিকে। অন্যরা এক এক করে বেরিয়ে পড়ে ইমামের ঘর থেকে। সকলের শেষে বের হলেন বারজিস। এখন আবার তিনি মুচি। হাতে বাক্স। দুনিয়াটায় কি ঘটছে কিছু জানেন না। এঁকে-বেঁকে, হেলে-দুলে হাঁটছে। গায়ে এক ফোঁটা বল নেই যেন। জগতের সব বেদনা আর দুঃখ যেন এসে চেপে বসেছে তার ঘাড়ে।

❁ ❁ ❁

বাড়ি অভিমুখে রওনা হয়েছে ওসমান সারেম। ঘরে পৌঁছুতে এখনো খানিক দেরী। হঠাৎ রাইনি আলেকজান্ডার তার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে।

রাইনি ওসমানের বোন আন-নূরের বান্ধবী। এখন ভাই-বোন দু'জনই চায় মেয়েটা তাদের ঘরে না আসুক। কিন্তু হঠাৎ নিষেধ করে দিয়ে মেয়েটাকে সন্দেহে ফেলতে চাইছে না ওসমান সারেম। ওসমানের সঙ্গেও অকৃত্রিম হতে চায় রাইনি। ওসমানের ধারণা, এভাবে চরিত্র নষ্ট করে মেয়েটা তার ঈমানী চেতনা ধ্বংস করার চেষ্টা করছে।

আজ রাস্তায় রাইনির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওসমানের সন্ধ্যাবেলা। মুখে সামান্য হাসির রেশ টেনে না দাঁড়িয়ে মেয়েটাকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চেষ্টা করে ওসমান। কিন্তু ওসমানের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে যায় রাইনি। ওসমান সারেমের মনে এমন কোন ভয় নেই যে, একটি খৃস্টান মেয়ের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আলাপরত অবস্থায় ধরা পড়লে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। ইহুদী-খৃস্টানরা বরং খুশীই হবে যে, যাহোক তাদের একটি মেয়ে একজন সন্দেহভাজন মুসলমানকে আপন করে নিতে পেরেছে। অগত্যা দাঁড়িয়ে যায় ওসমান। বলে, 'এখন পথ ছাড়, বড্ড তাড়া আছে আমার রাইনি!'

'না, তোমার কোন তাড়া নেই ওসমান! এত সহজে তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারবে?' বন্ধুসুলভ কণ্ঠে বলল রাইনি।

'কই, তোমাকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছি নাকি আমি!' ওসমানের কণ্ঠে বিস্ময়।

'মিথ্যা বল না ওসমান!'– মুচকি হেসে বলল রাইনি– 'এই আমি তোমার ঘর থেকে আসলাম। তোমার বোন আমাকে পরিস্কার বলে দিল, আমি যেন তোমার ঘরে কম আসি। আমি আসলে নাকি ওসমান নারাজ হয়....। কেন ওসমান! কথাটা তুমি আমায় নিজে বললে না কেন?'

কোন জবাব দেয় না ওসমান। বোনের প্রতি রাগ আসে তার। এভাবে সরাসরি বলার তো কথা ছিল না। তাই রাইনির কথার জবাব দেয়া কঠিন হয়ে পড়েছে ওসমানের। ওসমানকে নীরব দেখে রাইনি বলে, 'আমাকে কারণটা তো বলবে যে, আমি কেন তোমার ঘরে আসব না?'

রাইনির কথাটা কানে পৌঁছে না ওসমান সারেমের। মন তার অন্যত্র। মেজাজ ক্ষিপ্ত। বড্ড ব্যস্ত। রাইনিকে একটা বুঝ দিয়ে চলে যাওয়ার মত উপযুক্ত কোন জবাব

মাথায় আসল না তার। অগত্যা সাদা-মাটা করে মনের আসল কথাটাই বলে ফেলে ওসমান। 'রাইনি! তুমি আমার ঘরে এস না' কথাটা কেন যে আমি তোমাকে বলতে পারলাম না, জানিনা। এখন শুনে নাও। আমাদের পরস্পর যত প্রেম-ভালবাসাই থাকুক, জাতীয় পরিচয়ে আমি-তুমি একে অপরের দুশমন। তুমি হয়ত বলবে, এ ভালবাসা আমাদের ব্যক্তিগত, জাতিগত সম্পর্ক এখানে অবান্তর। কিন্তু আমি জাতীয় ভালবাসায় বিশ্বাসী, যা ক্রুশ ও কুরআনের মাঝে কখনো সৃষ্টি হতে পারে না। এটা আমার জন্মভূমি, বাসভূমি। তোমার জাতি এখানে করছে কি? যতদিন পর্যন্ত তোমার জাতির সর্বশেষ ব্যক্তিটিও এ মাটিতে বর্তমান থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তোমর-আমার বন্ধুত্ব হতে পারে না। আমার মনের কথাটা আমি অকপটে তোমাকে বলে দিলাম। এবার যা বুঝ বুঝতে পার।'

'আর আমার মনে কী আছে, তাও তুমি শুনে নাও'– রাইনি বলল– 'আমার হৃদয় থেকে তোমার ভালবাসা না বের করতে পারবে ক্রুশ, না পারবে কুরআন। তোমাকে না দেখলে আমি মনে শান্তি পাইনা। তোমাকে হাসতে দেখলে আমার আত্মাও হেসে উঠে। শোন ওসমান! তুমি যদি আমাকে তোমার ঘরে অসতে বারণই কর, তাহলে ভাল হবে না।'

'তুমি আমাকে হুকুম দিতে পার। তুমি শাসক সম্প্রদায়ের কন্যা।' ঠান্ডা মাথায় বলল ওসমান।

'আমার মনে যদি ক্ষমতার দম্ভ থাকত, তাহলে এ মুহূর্তে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারতে না। অনেক আগ থেকেই তুমি পঁচে মরতে আমাদের বন্দীশালায়'– রাইনি বলল– 'তুমি কি ভাবছ, আমি তোমার তৎপরতা সম্পর্কে কিছু জানি না? বল, তোমার আন্ডারগ্রাইন্ড তৎপরতার বিস্তারিত বিবরণ আমি তোমাকে শুনিয়ে দিই। বল, তোমার ঘর থেকে সমস্ত খঞ্জর,তীর-ধনুক, গোলা-বারুদ বের করে নিই, যা তুমি তোমার ঘরে লুকিয়ে রেখেছ আমার জাতি ও আমার সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য, যা তোমার ঘরে রাখার অনুমতি নেই। আন-নূরকে যে তুমি তরবারী চালনা শিক্ষা দিচ্ছ, তা কি আমি জানিনা? তোমার দলে আর কে কে কাজ করছে, তাও কি আমার অজানা? কিন্তু ওসমান! তুমি হয়ত জান না যে, তোমার আর বন্দীশালার মাঝে যে বস্তুটি প্রতিবন্ধবতা সৃষ্টি করে রেখেছে, তা হল আমার অস্তিত্ব। তুমি তো জান, আমার পিতা কে। জান তো, তিনি কি জানেন না আর কি করতে পারেন না। এই পাঁচবার তিনি ঘরে বলেছেন, ওসমানকে গ্রেফতার কথা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আমি সব ক'বার তার নিকট তোমার জন্য বিনীত সুপারিশ করে বলেছি, ওসমানের বোন আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। তার বাবা একজন পঙ্গু মানুষ। আপনি ছেলেটাকে রেহাই দিন। বাবা দু'-তিনবার আমাকে ধমক দিয়ে বলেছেন, প্রয়োজনে

আমি তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করব, তবু ছেলেটাকে ছাড়া যাবে না। তিনি আমায় এ-ও বলেছেন যে, মুসলমানের সঙ্গে তোমার এত মাখামাখি-ঘনিষ্ঠতা ঠিক হচ্ছে না। এসব তুমি ছেড়ে দাও। কিন্তু যেহেতু আমি বাবা-মার একমাত্র কন্যা , আদরের দুলালী, তাই তিনি আমাকে অসন্তুষ্টও করতে চাচ্ছেন না।'

সূর্য ডুবে গেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিক। নিঃশব্দ দাঁড়িয়ে আছে ওসমান সারেম। মন তার অন্য কোথাও। এবার কোন উত্তর না দিয়েই হাঁটা দেয় সে। দু'পা-ও এগুতে পারল না ওসমান। রাইনি ছুটে গিয়ে সম্মুখ থেকে এমনভাবে তার পথ আগলে দাঁড়ায় যে, বুকটা তার লেগে গেছে ওসমানের বুকের সঙ্গে। আলতোভাবে হাত দু'টো রেখে দেয় ওসমানের দু'কাঁধের উপর। ওসমানের আরো ঘনিষ্ঠ হয় মেয়েটি। যৌবনভরা দেহের উষ্ণ পরশে ওসমানকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে রাইনি। রাইনির রেশম-কোমল চুলগুলো ছুয়ে যায় ওসমানের দু'গন্ড। কেঁপে উঠে ওসমান। শিকারীর ফাঁদ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য পিছনে সরে আসার চেষ্টা করে সে। বন্ধন ছেড়ে দেয় রাইনি।

'আমাকে মুক্তি দাও রাইনি! পাথরে পরিণত হতে দাও তুমি আমায়। আমার পথ এক, তোমার পথ আরেক। তোমার-আমার একপথে চলা সম্ভব নয় বোন!' ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলল ওসমান।

'ভালবাসা ত্যাগ চায়'– বলল রাইনি– 'কী ত্যাগ দিতে হবে বল আমায়। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, তোমার যা মনে চায় কর, আমি তোমাকে বন্দী হতে দেব না।'

'আর আমি তোমায় ওয়াদা দিচ্ছি'–কঠোর ভাষায় বলল ওসমান– 'আমার মন কি চায়, আমি কি করতে যাচ্ছি, কক্ষনো তা তোমায় বলব না। তোমার এই রূপসী শরীর আর রেশম-সুন্দর চুলের যাদুতে আমাকে আটকাতে পারবে না তুমি।'

'তারপরও আমার প্রমাণ দিতে হবে যে, তোমার জন্য আমি কি ত্যাগ দিতে পারি'– রাইনি বলল– 'তাড়া আছে তো যাও ওসমান! তবে তোমার ঘরে যাওয়া থেকে আমি বিরত হবনা বলে রাখছি। যাব, আগের চেয়ে বেশী যাব।'

আর দাঁড়ায় না ওসমান। ছুটে চলে সম্মুখপানে। রাইনি তাকিয়ে থাকে তার প্রতি। অন্ধকারে হারিয়ে যায় ওসমান। বেদনার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দেয় মেয়েটি।

❁ ❁ ❁

ওসমান ঘরে পৌঁছে দেখে বারজিস তার দেউরিতে বসা। সোজা ভিতরে চলে যায় ওসমান। বাবা-মা-বোনের কাছে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলে, আমি সঙ্গীদের নিয়ে মেয়ে দু'টোকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি। আমাদের এ অভিযানে আন-নূরকে প্রয়োজন।

ওসমান সারেমের বাবা পঙ্গু। যুবক বয়সে খৃষ্টানদের সঙ্গে লড়াই করে একটা পা ভেঙ্গে ফেলেছেন তিনি। পরবর্তী জীবনটা তিনি এই আফসোস করে করে কাটিয়ে দিয়েছেন যে, আহ! এখন আর আমার জিহাদ করার সামর্থ নেই। তিনি ওসমানকে বললেন– বৎস! এমন একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সংকল্প নিয়েই ফেলেছ যখন, তো আমার যেন একথা শুনতে না হয় যে, তুমি তোমার সঙ্গীদের সাথে গাদ্দারী করেছ। এ অভিযানে ধরা পড়ার আশংকাই বেশী। শোন, যদি তুমি ধরা পড়ে যাও আর তোমার সঙ্গীরা নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়, তাহলে জীবন দিয়ে দেবে, তবু সঙ্গীদের নাম বলবে না। আমি তোমাকে সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনীর সৈনিক হয়ে যুদ্ধ করার জন্য বড় করেছি। ভেবেছিলাম, তোমার বোনটার বিয়ের কাজটা সম্পন্ন করে তোমাকে বিদায় দেব। যা হোক, তুমি যাও, আমার আত্মাকে শান্তি দাও! আবার শুনে নাও, আমি কারো মুখে একথা শুনতে চাই না যে, ওসমানের শিরায় সারেমের রক্ত নেই।'

কন্যাকেও অনুমতি দিয়ে দেন পিতা। ওসমান সারেম জানায়, বারজিস দেউরীতে বসে আছেন। তিনিই এ অভিযানে আমাদের নেতত্ব দেবেন। বারজিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য দেউরীতে চলে যান ওসমানের পিতা।

ওসমান সারেম আন-নূরকে বলে, এক্ষুণি তুমি তোমার এমন দু'জন বান্ধবীকে ডেকে আন, যারা আমাদের এ অভিযানে অংশ নেয়ার সাহস রাখে। আন-নূর তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়ে এবং দু'বান্ধবীকে নিয়ে খানিক পরেই ফিরে আসে। এর মধ্যে ওসমান সারেমের এক সঙ্গী তার বোনকে সঙ্গে করে এসে উপস্থিত হয়।

এক এক করে এসে হাজির হয় ওসমান সারেমের সাত সঙ্গী। মেয়েরা কোন্ পথে কোথায় যাবে এবং কি করবে, বিষয়টা তাদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন বারজিস। বললেন, পথে একজন সেন্ট্রি তোমাদের পথ রোধ করবে। তোমরা তার কাছে উপরে যাওয়ার পথ কোন্ দিকে জিজ্ঞেস করবে। বলবে, সম্রাট রেনাল্ড আমাদের আসতে বলেছেন। কিন্তু আমরা পথটা ভুলে গেছি। তোমাদের একজন থাকবে চাকরানীর বেশে। তার মাথায় থাকবে টুকরি। সেন্ট্রিকে হত্যা করে আগুন লাগাতে হবে। আগুন লাগাবার উপাদান থাকবে চাকরানীর মাথার টুকরিতে। আগুন লাগাবার পর খঞ্জর দ্বারা উট-ঘোড়ার রশি কেটে দেবে। দু'চারটি ঘোড়াকে খঞ্জর দ্বারা আঘাত করতে হবে। আঘাত খেয়ে ঘোড়াগুলো চীৎকার করে উঠে ছুটাছুটি করতে শুরু করবে এবং তাদের দেখা-দেখি অন্যান্য ঘোড়ার মধ্যেও আতংক সৃষ্টি হবে।

অল্প সময়ের মধ্যে মেয়েদের বেশ-ভুষা ঠিক করে নিতে বলেন বারজিস। চাকরানী সাজিয়ে দেন একজনকে। তাকে ছেড়া-মলিন-পুরাতন পোশাক পরতে দেন। মুখমন্ডলে ছাই-কালি মাখিয়ে দেন।

ওসমান সারেম ও তার সঙ্গীদের দিক-নির্দেশনা দিতে শুরু করেন বারজিস। ওসমান সারেমের পিতাও কিছু পরামর্শ দেন। তারপর প্রত্যেকের হাতে তুলে দেয়া হল একটি করে খঞ্জর। এ সব কাজে কেটে যায় অনেক সময়। সব আয়োজন সম্পন্ন। কিন্তু রাত গভীর হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরো কিছুক্ষণ।

রওনা করার সময় হয়ে গেছে। আলাদা আলাদা গিয়ে নির্ধারিত এক স্থানে সমবেত হবে সকলে। মেয়েদের পথ আলাদা। কাজও ভিন্ন। আগুন লাগাবার দায়িত্ব তাদের। আগুন কখন লাগাবে, তার একটা নির্দিষ্ট সময় বলে দেয়া হয়েছে। ঠিক সে সময়ে আক্রমণের স্থানে উপস্থিত থাকতে হবে বারজিসের দলের। এ এক স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান। সময়ের সামন্য হেরফের কিংবা কারো একটুখানি ভুল হয়ে গেলে ফল বিপরীত। নির্ঘাত ধরা খাওয়া আর বন্দীশালার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হওয়া। তারপর জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করা। সবচে' বেশী ঝুঁকি মেয়েদের। কারণ ওরা নারী। ধরা খেয়ে গেলে তাদের পরিণতি কি হবে, তা অনুমান করা কঠিন নয়। আন-নূর বলল, ধরা পড়ে গেলে খঞ্জর দ্বারা আমরা আত্মহত্যা করে ফেলব। জীবিত যাব না কাফেরদের হাতে।

গভীর রাত। নীরব-নিস্তব্দ কার্ক শহর। কোথাও কেউ জেগে নেই। নেই কোন সাড়াশব্দ। এক ফোঁটা আলো দেখা যাচ্ছে না কোথাও। জেগে আছে শুধু একটি প্রাসাদ। খৃস্টানদের সম্মিলিত বাহিনীর হেডকোয়ার্টার। খৃস্টান সম্রাট ও উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তাদের আবাসও এটি। এটি তাদের পানশালা। শহর ঘুমিয়ে পড়ার পর জেগে ওঠে এ প্রাসাদ। রাত ভর চলে মদ-নারী আর নাচ-গানের আসর।

এক এক করে প্রাসাদের পানশালায় এসে উপস্থিত হয় সকলে। আসর জমে উঠে। আজকের আলোচ্য বিষয় অপহৃতা নতুন দুই মুসলিম নারী আর কাফেলা-লুণ্ঠিত সম্পদ। মেয়ে দু'টো আর কী কাজে আসতে পারে, জিজ্ঞেস করে একজন। জবাবে সেনা কমান্ডার বলে, এরা পরিণত বুদ্ধির মেয়ে। গুপ্তচরবৃত্তি ইত্যাদিতে এদের ব্যবহার করা যাবে না। একজনের বয়স ষোল-সতের, অপর জনের বাইশ-তেইশ। কিছুদিন আনন্দ-উপভোগে-ই ব্যবহার করা যেতে পারে শুধু।

'তারপর দু'জন সামরিক অফিসারের হাতে তুলে দিলেই হবে। তারা এদের বিয়ে করে নেবেন।' বলল পদস্থ এক সেনা অফিসার।

আসরে হাসি-ঠাট্টা আর অশ্লীল আলোচনা চলছে অপহৃতা এই দু'টো মুসলিম মেয়েকে নিয়ে। ঠাট্টা চলছে ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে। মেয়ে দু'টো অবস্থান করছে আলাদা আলাদা দু'টি কক্ষে। কাঁদতে কাঁদতে বেহাল হয়ে যাচ্ছে তারা। একজনের অবস্থা জানে না অন্যজন। দু'জনের কাছে দু'জন সেবিকা। মধ্যবয়সী

মহিলা। মেয়ে দু'টোকে গোসল করিয়েছে তারা। এখন রাতের পোশাক পরাচ্ছে। সাজাচ্ছে বধূসাজে। সেই থেকে কিছু-ই মুখে দেয়নি তারা। সামনে পড়ে আছে এমন এমন খাবার, যা এর আগে তারা কখনো স্বপ্নেও দেখেনি। কিন্তু তা ছুয়েও দেখেনি তারা।

দু'বোনের কে কোথায় আছে, কি হালে আছে, জানে না অপরজন। দু'জনকে স্বপ্নের সবুজ বাগান দেখাচ্ছে সেবিকারা। একজনকে বলা হল, ফ্রান্সের সম্রাট তোমাকে পছন্দ করেছেন। তুমি হবে রাণী। অপরজনকে বলা হল, জার্মানীর রাজার তোমাকে মনে ধরেছে, জীবনটা বদলে যাবে তোমার। পাশাপাশি সাদরে হুমকিও দেয়া হচ্ছে তাদের যে, সম্রাটদের যদি অসন্তুষ্ট কর, তাহলে তোমাদেরকে সৈন্যদের হাতে তুলে দেয়া হবে।

মেয়ে দু'টো মরু অঞ্চলের বাসিন্দা। ভীরু নয়। কিন্তু এখন তো অসহায়-নিরূপায়। আত্মরক্ষার জন্য কিছু-ই করার নেই তাদের। তাদের ইজ্জত রক্ষা করার-ই জন্য তাদের বাবা-মা ও বড় ভাই তাদের নিয়ে খৃস্টান অধ্যুষিত এলাকা ছেড়ে হিজরত করছিল। কিন্তু খৃস্টান হায়েনাদের-ই ফাঁদে পড়ে গেল তারা। বাবা-মা মারা গেলেন। ভাই বন্দী হল। আর তারা এসে পড়ল খৃস্টান সম্রাটদের হাতে। এখন তাদের সাহায্য করার আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই। বন্দীদশা থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগও দেখছে না তারা। বসে বসে তারা কাঁদছে, চোখের পানিতে বুক ভাসাচ্ছে আর আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করছে। ভাই আফাকের জন্যও অস্থির তারা। বেগার ক্যাম্পে ছট্‌ফট্ করছে আফাক। আফাক আহত। খৃস্টানরা খুব পিটিয়েছে তাকে।

আগের কয়েদীরা নিত্যদিনের খাটুনির পর ফিরে এসেছে ক্যাম্পে। নতুন বন্দীদের দেখতে পায় তারা। তাদের কাহিনী শোনে। সব ক'জনের মধ্যে আফাক-ই শুধু আহত। এ পর্যন্ত কেউ তার ব্যান্ডেজ করেনি। মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে আফাক। পুরাতন কয়েদীরা রাতে আফাকের জখম পরিস্কার করে। লুকিয়ে রাখা কিছু ঔষধ দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দেয় তাতে।

শরীরে এতগুলো জখম। কিন্তু কোন ব্যাথা অনুভব হচ্ছে না আফাকের। নিজের কথা ভুলে গিয়ে ভাবছে শুধু বোনদের কথা। বোন দু'টো কোথায় থাকতে পারে কয়েদীদের কাছে জানতে চায় আফাক। এখান থেকে কিভাবে পালানো যায়, তাও জিজ্ঞেস করে। বোনরা কোথায় থাকতে পারে, তাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ হয়ে থাকতে পারে, আফাককে স্পষ্ট ধারণা দেয় কয়েদীরা। কয়েদীরা তাকে জানায়, এ বন্দীশালার কোন দেয়াল নেই। কারো পায়ে বেড়ীও পরানো হয় না। তারপরও কেউ এখান থেকে পালাতে পারে না। কারণ, এখানে সারাক্ষণ প্রহরা থাকে। তাছাড়া কেউ

পালাতে পারলেও যাবে কোথায়। কোথাও না কোথাও ধরা পড়তেই হবে। পালাবার পর ধরা পড়লে এমন যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুবরণ করতে হবে, যা কল্পনাও করা যায় না। আফাককে জানানো হয়, এখানে বছরের পর বছর ধরে এমন অনেক কয়েদী পড়ে আছে, যারা কার্কের বাসিন্দা ছিল। কিন্তু পালাবার কোন সাহস তারা করতে পারছে না। তারা জানে যে, পালাবার পর যদি তারা ধরা না পড়ে, তাহলে তাদের গোটা পরিবার বন্দীশালায় নিক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু এতসব অপারগতা ও আশংকা সত্ত্বেও নিজের পলায়ন ও বোনদের উদ্ধারের কথা ভাবছে আফাক। অথচ, উঠে দাঁড়াবার শক্তিও নেই তার দেহে। সারাদিনের ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত কয়েদীরা শুয়ে পড়ে। গভীর নিদ্রায় তলিয়ে যায় তারা। জেগে আছে শুধু আফাক।

❁ ❁ ❁

'মেয়েগুলো ধরা না পড়লে-ই হল।' ফিস্‌ফিস্ করে বলল ওসমান সারেম।

'আল্লাহকে স্মরণ কর ওসমান!'– বারজিস বললেন– 'এ মুহূর্তে আমরা মৃত্যুর মুখে আছি। মন থেকে সব ভীতি ঝেড়ে ফেল, আল্লাহকে স্মরণ কর.......। আচ্ছা অপর মেয়েগুলোর উপর তোমার আস্থা কতটুকু?'

'একশ ভাগ'–ওসমান বলল–' এ ব্যাপারে আপনার ভাবতে হবে না। আমি ভাবছি, ওরা ধরা পড়ে যায় কিনা!'

'আল্লাহ আল্লাহ কর'–বারজিস বললেন–'আমরা চুরি করতে আসিনি। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন।'

অপহৃত মেয়ে দু'টোকে যে প্রাসাদে রাখা হয়েছে, তার থেকে সামান্য দূরে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে আছে ওসমান সারেম ও বারজিস। তার-ই সামান্য ব্যবধানে নির্দেশের অপেক্ষায় কানখাড়া করে বসে আছে তাদের অন্য সাথীরা। কোন্ সংকেতে কি করতে হবে, তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে আগেই।

ফৌজি সরঞ্জাম ও খড়ের গাদায় আগুন দিতে পাঠানো হয়েছে যে চারটি মেয়েকে, তাদের নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে ওসমান সারেম। বোন আন-নূরও তাদের একজন। এতক্ষণে আগুন ধরে যাওয়ার কথা। পরিকল্পনা সফল হলে আগুনের শিখা উঠবে, ছড়িয়ে পড়বে চারদিক। প্রাসাদের সব সম্রাট-কমান্ডার ছুটে যাবে সেদিকে। এ সুযোগে প্রাসাদে ঢুকে পড়ে মেয়ে দু'টোকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে ওসমান ও তার সঙ্গীরা। কিন্তু মেয়েরা গেল অনেক সময় হল। বোধ হয় সেন্ট্রি পথরোধ করে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে।

এখনো সেন্ট্রি পর্যন্ত পৌছুতে-ই পারেনি মেয়েরা। সেন্ট্রির সঙ্গে মেয়েদের যেখানে সাক্ষাৎ হওয়ার কথা, সেখানে কোন সেন্ট্রি নেই। সেন্ট্রিকে না পাওয়া আশংকার

ব্যাপার। কারণ, আগুন লাগাতে হবে সেন্ট্রিকে হত্যা করে। অন্যথায় আগুন লাগানো অবস্থায় মেয়েদের হাতেনাতে ধরা পড়ার আশংকা আছে।

সেন্ট্রিকে খুঁজতে শুরু করে মেয়েরা। শুক্‌নো খড়ের গাদার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তারা। অন্ধকারে তাঁবুর সারি চোখে পড়ছে না। চারজন হাঁটছে একত্রে। একস্থানে লাঠির মাথায় বাঁধা প্রদীপের শিখা দেখতে পায় তারা। এগিয়ে যায় সেদিকে। ঐ তো সেন্ট্রি। প্রদীপের কাছে সেন্ট্রিকে পেয়ে গেল মেয়েরা। প্রদীপের লাঠিটি মাটিতে গাড়া। সেন্ট্রি হাতে তুলে নেয় প্রদীপটি। এগিয়ে আসে মেয়েদের প্রতি। পথরোধ করে তাদের। সুসজ্জিত তিনটি সুন্দরী যুবতী মেয়ে। সঙ্গে একজন চাকরানী। মাথায় তার টুকরি। অল্পতে-ই কাবু হয়ে যায় সেন্ট্রি? প্রভাবিত হয়ে পড়ে মেয়েগুলোর প্রতি।

'তোমরা কারা? যাচ্ছ কোথায়?' জিজ্ঞেস করে সেন্ট্রি। কণ্ঠে তার নমনীয়তা।

'মনে হয় আমরা ভুল পথে এসে পড়েছি'– মুখে হৃদয়কাড়া হাসি টেনে বলল আন-নূর– 'সম্রাট রেনাল্ডের দাওয়াতপত্র পেয়েছিলাম। কথা ছিল আমরা রাতে আসব। ঘর থেকে বের হতে দেরী হয়ে গেল। একজন বলল, এ পথটা নাকি সোজা। কিন্তু সামনে দেখছি ঘোড়া বাঁধা। পথ কোন্ দিকে? কোন্ দিকে যাব?'

একজন সাধারণ সেন্ট্রিকে প্রভাবিত করতে সম্রাট রেনাল্ডের নাম-ই যথেষ্ট। খৃস্টান সম্রাটদের কার চরিত্র কেমন, সব তার জানা। রেনাল্ড যদি আমোদ করার জন্য এ মেয়েগুলোকে তলব করে থাকেন, তো বিচিত্র কিছু নয়। মেয়েগুলোর রূপ-লাবণ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, বয়স ও গঠন-আকৃতি সর্বোপরি আন-নূর এর নির্ভীক কণ্ঠ ও ভাব-ভঙ্গি-ই প্রমাণ করছে যে, এরা তার বড় স্যারদের মতলবের মেয়ে।

রেনাল্ডের ভবনের পথ দেখাতে শুরু করে সেন্ট্রি। তার পিছনে চলে যায় একটি মেয়ে। নষ্ট করার মত সময় তাদের হাতে নেই। এমনিতে-ই সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেক। খঞ্জরটা শক্ত করে ধারণ করে সে। নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তীব্র এক আঘাত হানে সেন্ট্রির পিঠে। এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যায় সেন্ট্রির দেহ। হৃদপিন্ড ভেদ করে খঞ্জরটা বেরিয়ে যায় সামনে দিয়ে। হাতের মশালটা ছুটে পড়ে যায় তার। দু'পা দ্বারা পিষ্ট করে প্রদীপের আগুন নিভিয়ে ফেলে আন-নূর। সেন্ট্রি লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। আঘাত হানে অন্য মেয়েরাও। আহ! বলার সুযোগও দেয়া হল না লোকটাকে। দম যেতে সময় লাগল না তেমন।

বারজিস বলেছিলেন, শুক্‌নো খড়ে আগুন ধরে গেলে তার আলোতে সেনা ছাউনির সারি ও গাড়ির বহর চোখে পড়বে। খড়ের গাদাগুলো দেখা যাচ্ছে অন্ধকারে-ই। চাকরানীবেশী মেয়েটি টুকরিটা নামায় মাথা থেকে। তাতে আগুন লাগাবার সরঞ্জাম। ডিবায় ভরা কেরসিন, দেয়াশলাই ইত্যাদি।

প্রথমে তারা খড়ের একটি গাদায় আগুন ধরায়। তারপর আরেকটিতে, তারপর

আরো একটিতে। এভাবে সবগুলোতে। মুহূর্তের মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠে সবগুলো খড়ের গাদায়। আলোকিত হয়ে উঠছে চারদিক। ঐ তো ছাউনিগুলো দেখা যায়, ঐ তো গাড়ির বহর। এবার তারা দেখতে পাচ্ছে সবকিছু।

তাঁবুগুলো কাপড়ের তৈরী। গাড়ীগুলোও একটার সঙ্গে একটা লাগানো। মেয়েগুলো দ্রুত দৌড়ে যায় সেদিকে। আগুন ধরিয়ে দেয় তাঁবুতে। জ্বলে উঠে কাপড়ের তাঁবুগুলো। অস্বাভাবিক আনন্দের ঢেউ জেগে উঠে মেয়েগুলোর মনে। তিন-চারটি গাড়ীতে কেরসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় তাতেও।

এতক্ষণে আকাশ ছুয়ে যেতে শুরু করেছে খড়ের আগুন। মেয়েগুলো দৌড়ে যায় ঘোড়ার আস্তাবলের দিকে। এখনো সজাগ হয়নি কেউ। মেয়েরা খঞ্জর দ্বারা কেটে দেয় ঘোড়ার রশিগুলো। এক রশিতে চল্লিশ-পঞ্চাশটি করে ঘোড়া বাঁধা। কাজেই সময় বেশী ব্যয় হল না। কয়েকটি ঘোড়ায় খঞ্জরের আঘাত হানে তারা। চীৎকার করে উঠে ঘোড়াগুলো। ভয়ানক শব্দে হ্রেষাধ্বনি দিয়ে ছুটাছুটি করতে শুরু করে পশুগুলো। উটগুলো আগে থেকেই খোলা। আগুনের লেলিহান শিখা আর ঘোড়ার ডাক-চীৎকার-ছুটাছুটি দেখে এলোপাতাড়ি ছুটতে শুরু করে সেগুলোও। বলতে না বলতে এক প্রলয়কান্ড ঘটে যায় সেখানে।

ছুটন্ত উট-ঘোড়ার কবলে পড়ে গেল মেয়ে চারটি। প্রজ্বলিত আগুনের তাপে দূর থেকে পুড়ছে তাদের দেহ। পশুগুলোর ডাক-চীৎকার আর পদশব্দে জেগে উঠে সৈন্যরা।

❁ ❁ ❁

বধূসাজে সাজানো হল অপহৃতা মেয়ে দু'টোকে। একই সময়ে একজন একজন করে পুরুষ প্রবেশ করে তাদের কক্ষে। এরা খৃস্টানদের সামরিক কর্মকর্তা। নেশাগ্রস্ত। পানশালা থেকে বেরিয়ে এসেছে এইমাত্র। সেবিকারা বেরিয়ে যায় কক্ষ থেকে।

হঠাৎ ভয়ে আতংকিত হয়ে উঠে মেয়ে দু'টো। হায়েনার কবল থেকে পালাবার পথ খুঁজতে শুরু করে তারা। এই মুহূর্তে একমাত্র আল্লাহ-ই তাদের ইজ্জতের হেফাজতকারী।

হাটু গেড়ে বসে পড়ে এক মেয়ে। হাতজোড় করে, কেঁদে কেঁদে সাহায্য প্রার্থনা করে আল্লাহর কাছে। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে লোকটি। লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায় মেয়েটির প্রতি...।

হঠাৎ বাইরে গোলযোগের শব্দ শুনতে পায় সে। অস্বাভাবিক এক শোরগোল, ডাক-চীৎকার। দরজা ফাঁক করে তাকায় বাইরের দিকে। একি! শহরে আগুন লেগে গেছে মনে হয়! কি ব্যাপার, উট-ঘোড়াগুলো এভাবে ছুটাছুটি করছে কেন!

নেশা কেটে যায় লোকটির। বেরিয়ে আসে বাইরে। অন্য কক্ষ থেকে বেরিয়ে

আসে অপরজনও। হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে আসে দু'তিনজন লোক। ভয়জড়িত কাঁপা কণ্ঠে বলে, খড়ের গাদা-তাঁবু-ঘোড়াগাড়ীতে আগুন লেগে গেছে। ছুটন্ত উট-ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়ে মারা গেছে কয়েকজন।

আগুন যদি লোকালয়ে, জনবসতিতে লাগত, তাহলে সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করত না এই শাসকমন্ডলী। কিন্তু এ অগ্নিকান্ড ঘটেছে যে তাদের ব্যারাকে, সামরিক সরঞ্জামে, সেনাছাউনিতে!

মুহূর্তের মধ্যে প্রাসাদে অবস্থানরত সকল সম্রাট, প্রশাসনিক ও সামরিক কর্মকর্তা-যে যেখানে ছিল ছুটে যান ঘটনাস্থলে। নিজ তত্ত্বাবধানে আগুন নির্বাপিত করার চেষ্টা করছে তারা। প্রাসাদের চারপাশের ডিউটিরত সশস্ত্র প্রহরীরা ছুটে যায় পিছনে পিছনে। এমনি একটি মুহূর্তের-ই অপেক্ষায় বসে আছেন বারজিস ও ওসমান। উচ্চশব্দে হাঁক দেন বারজিস। 'চল' বলে সংকেত দেন সহকর্মীকেদের। ছুটে যান প্রাসাদ অভিমুখে। সঙ্গে তাঁর ওসমান। পিছনে পিছনে ছুটে আসে অন্যরা। সকলের হাতে খঞ্জর।

প্রাসাদের অলিন্দে প্রবেশ করে বারজিস তাঁর সেই দু'সহকর্মীকে খুঁজতে শুরু করে, যারা খৃস্টান বেশে এখানে চাকুরী করছে। পাওয়া গেল একজনকে। বারজিস তাকে জিজ্ঞেস করেন, এই আজ যে মেয়ে দু'টোকে আনা হল, ওরা কোথায়? বিষয়টি পরিস্কার জানা ছিল না লোকটির। তবু হাতের ইশারায় দেখিয়ে দেয় একটি কক্ষ। নিজেও সঙ্গে যান বারজিসের। প্রাসাদে দায়িত্বশীল কেউ নেই। প্রহরীরা যারা আছে, এদিকে তাদের কোন খেয়াল নেই। আগুনের তামাশা দেখতেই ব্যস্ত সকলে।

খৃস্টান সম্রাট-কর্মকর্তাদের উপভোগের জন্য ধরে আনা মুসলিম মেয়েরা যেসব কক্ষে অবস্থান করে, সেই কক্ষগুলোর দিকে এগিয়ে যান বারজিস। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কর্মচারী। অলিন্দে দন্ডায়মান কয়েকটি মেয়ে। তাদের কেউ কেউ অর্ধনগ্ন। বারজিস তাদের জিজ্ঞেস করেন, আজ যে দু'টো মেয়েকে ধরে আনা হয়েছে, ওরা কোথায়? বলতে পারল না তারাও। অবশেষে একটি কক্ষে পাওয়া গেল একজনকে। বিহ্বলচিত্তে কক্ষে বসে আছে সে। ওসমান সারেম ও তার কয়েকজন সঙ্গী দিনের বেলা দেখেছিল মেয়েটিকে। বারজিসের দলটির সকলেই মুখোশপরিহিত। তাদের দেখে চীৎকার করে উঠে মেয়েটি। বারজিস তাকে জানায়, আমরা মুসলমান। আমরা তোমাদের দু'বোনকে উদ্ধার করতে এসেছি। কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না সন্ত্রস্ত মেয়েটির। বারজিসের হাতে ধরা দিচ্ছে না সে। কিন্তু সময় তো আর নষ্ট করা যাবে না। বারজিস জোরপূর্বক তুলে নেয় মেয়েটিকে।

আরেক কক্ষে পাওয়া গেল অপর মেয়েটিকে। একই প্রতিক্রিয়া দেখায় সেও। আগন্তুকদের দস্যু মনে করে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করতে শুরু করে সে। জোর করে

তুলে নেয়া হল তাকেও। এ দৃশ্য দেখে লোকগুলোকে ডাকাত ভেবে এদিক-ওদিক পালিয়ে যায় পুরনো মেয়েরা। চীৎকার করছে নতুন দু'জন। বারজিস রাগতঃ স্বরে তাদের বললেন, চুপ কর হতভাগীরা! আমরা মুসলমান। আমরা তোমাদের মুক্ত করে নিয়ে যাচ্ছি! বড় কষ্টে মেয়ে দু'টোকে থামানো হল। তাদের নিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেল জানবাজ মুসলিম কমান্ডোরা।

❁ ❁ ❁

বড় ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে আগুন। লকলকিয়ে আকাশ ছুয়ে যাচ্ছে আগুনের লেলিহান শিখা। চারদিক ছড়িয়ে পড়েছে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত। আরো ছড়াচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। শহরময় প্রলয় সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছে ধাবমান উট-ঘোড়াগুলো। জেগে উঠেছে গোটা শহর। পশুগুলোর পায়ে পিষ্ট হয়ে জীবন হারাবার ভয়ে ঘর থেকে বের হচ্ছে না কেউ। প্রায়-বার'শত উট-ঘোড়ার জ্ঞানশূন্য ছুটাছুটি যা তা ব্যাপার নয়। আগুনের ভয়ে ঘর ছেড়ে পালাবার প্রস্তুতিও নিতে শুরু করেছে অনেকে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দা আছে কার্কে। লোকগুলো সুযোগের সদ্ব্যবহারে বড় পাকা। তারা আগুন, উট-ঘোড়ার ছুটাছুটি ও হুলস্থুল কান্ড দেখে কি ঘটল, তার কোন তত্ত্ব-তালাশ না নিয়েই প্রচার করে দিল যে, সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনী শহরে ঢুকে পড়েছে এবং শহরে আগুন লাগিয়ে চলছে।

এই খবর একদিকে যেমন মুসলমানদের জন্য আশাব্যঞ্জক ও সাহসবর্ধক, তেমনি ইহুদী-খৃস্টানদের জন্য হতাশাব্যঞ্জক। আগুনের মতই মুহূর্তের মধ্যে শহরময় ছড়িয়ে পড়ে এ গুজব। পালাতে শুরু করে দেয় অমুসলিমরাও।

খৃস্টান সম্রাট ও কর্মকর্তাবৃন্দ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখেন কোন লোক নেই। তারাও ধরে নেন যে, মুসলিম বাহিনী দুর্গের প্রাচীর ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। দুর্গের প্রতিরক্ষার জন্য তৎক্ষণাৎ তাদের বাহিনীকে সমরবিন্যাসে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন। দুর্গের বাইরে চলে যাওয়ার জন্য আদেশ দেন একদল সৈনিককে।

দু'-তিনজন কমান্ডার দৌড়ে গিয়ে পাঁচিলের উপর উঠে তাকায় বাইরের দিকে। কিন্তু বাইরে কোন শব্দ-সাড়া নেই। কোন দিক থেকে আক্রমণ এসেছে বলে মনে হল না। রাতে দুর্গের ফটক খোলা হয় না কখনো। কিন্তু আজ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর কমান্ডো বাহিনী ভিতরে ঢুকে প্রলয় সৃষ্টি করেছে এই আশংকায় দুর্গের পিছনের ফটক খুলে দেয়া হল। এটি বাইরের আক্রমণের পূর্বাভাস। ঘটনা যদি এমন-ই হয়ে থাকে, তাহলে আইউবীর বাহিনীও এগিয়ে আসছে নিশ্চয়। তাই শহর থেকে দূরেই তাদের প্রতিহত করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করতে হবে।

আগুন বিস্তার লাভ করছে। ঘোড়াগাড়ী, রসদের স্তূপ আরো নানা রকম সরঞ্জাম। এগুলো রক্ষা করা প্রয়োজন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা আবশ্যক। কিন্তু পর্যাপ্ত পানি নেই! আশ-পাশে না আছে পুকুর, না আছে নদী-খাল। বেশ দূরে দু'চারটি কূপ আছে বটে,

কিন্তু পানি তুলে আনার লোক যে নেই! নগরবাসী কেউ তো এগিয়ে আসেনি। তাদের কেউ নিজ ঘরে ঘাপটি মেরে বসে আছে, কেউ বা পালাচ্ছে। ফটক তো খোলা। বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায় অপ্রতিরোধ্য গতিতে লোকজন বেরিয়ে যাচ্ছে শহর থেকে। সেনাবাহিনী তলব করা হল। এর মধ্যে একজনের মনে পড়ে গেল বেগার ক্যাম্পের মুসলমানদের কথা। ওদেরকে কাজে লাগানো যেতে পারে। নির্দেশ দেয়া হল, বেগার ক্যাম্পের কয়েদীদের নিয়ে আস। ঘোষণা দাও, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলে কাল সকালেই তাদের মুক্তি দেয়া হবে।

বাইরের কোলাহলে জেগে উঠেছিল কয়েদীরা। লাঠিপেটা করে করে তাদের শুয়ে যেতে বলছে সেন্ট্রি। এর মধ্যে ঘোষণা দেয়া হল, কয়েদীদের আগুন নেভানোর জন্য নিয়ে চল। অভিযানে সফল হলে সকালে মুক্তি দেয়ার ঘোষণাও শোনানো হল।

আফাকও আছে তাদের মধ্যে। জখমের ব্যাথায় কাতরাচ্ছে সে। ঘোষণা শুনে আফাক এক কয়েদীকে বলল, 'খৃস্টানদের গোটা সাম্রাজ্য পুড়ে গেলেও আমি আগুন নেভাতে যাব না। বেটারা পেয়েছে কি?

'পাগল নাকি!'– বলল কয়েদী–'ওরা ঘোষণা করেছে, আগুন নিয়ন্ত্রণে এনে দিতে পারলে কাল সবাইকে মুক্ত করে দেবে। আমি জানি এটি সম্পূর্ণ ধোঁকা। কাফেররা মিথ্যা বলায় বড় পাকা। তবু তুমি আমাদের সঙ্গে চল, সুযোগ বুঝে পালিয়ে যেও। আমাদের পালাবার সুযোগ নেই। কারণ, ওরা আমাদের ঘর-বাড়ী চেনে। তুমি বেরিয়ে যাও।'

'কিন্তু যাব কোথায়?' আফাকের কণ্ঠে হতাশা।

কয়েদী আফাককে নিজের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে বলল, 'সুযোগমত আমি তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে রেখে আসব। কিন্তু সেখানে বেশী দিন থাকবে না। খৃস্টানরা জানতে পারলে আমার গোটা পরিবারকে তছনছ করে দেবে।'

আগুন নিভানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয় কয়েদীদের। দলে দলে বিভক্ত করে বিভিন্ন কূপে পাঠিয়ে দেয়া হয় তাদের। সেনা সদস্যরা কূপ থেকে মশক ভরে ভরে পানি তুলে দিচ্ছে আর তারা পানি নিয়ে নিয়ে আগুনের উপর ছিটিয়ে দিচ্ছে। দু'এক চক্কর তাদের সঙ্গে যাওয়া-আসা করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সেন্ট্রি। দ্রুত দৌড়া-দৌড়ি করে কিছুক্ষণ পানি বহন করার পর নির্জীব হয়ে পড়ে বলহীন কয়েদীরা। ক্লান্ত হয়ে পড়ে সেনাসদস্যরাও । বেহাল হয়ে পড়ে সবাই। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। ভীত-সন্ত্রস্ত খৃস্টান কমান্ডার অশ্লীল ভাষায় গালি দিতে শুরু করে সকলকে। হঠাৎ একদিক থেকে ছুটে আসে আতংকিত একপাল ঘোড়া। আগুন নির্বাপনকারী কয়েদী ও সেনাসদস্যরা পড়ে যায় ঘোড়াগুলোর কবলে। এদিক-ওদিক পালাতে শুরু করে তারা। ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষ্টও হয় অনেকে। এ সুযোগে আফাককে সঙ্গে করে কেটে পড়ে সেই পুরাতন কয়েদী।

শহরের মুসলমানদের মনে কোন শংকা নেই। তারা জানে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজ এসে পড়েছে। আফাককে নিয়ে নিজের ঘরে চলে যায় কয়েদী। ঘরের সব মানুষ জাগ্রত। তাকে দেখে আনন্দিত হয় সকলে। কিন্তু সে আফাককে তাদের হাতে তুলে দিয়ে বলে, 'একে আপাততঃ লুকিয়ে রাখুন এবং অল্প সময়ের মধ্যে শহর ত্যাগ করে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। খৃস্টানরা ওয়াদা দিয়েছে, কাল সকালে আমাদের মুক্তি দেবে। একে এখনো কেউ চেনে না, এসেছে মাত্র একদিন হতে চলল। আমি থেকে গেলে আমার কারণে হয়ত ক্যাম্পের একজনও মুক্তি পাবে না।'

'আচ্ছা, সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজ নাকি শহরে ঢুকে পড়েছে, কথাটা কি সত্য?' জিজ্ঞেস করে কয়েদীর পিতা।

'জানি না'– জবাব দেয় কয়েদী– 'আগুন মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। ঠিক নেই, কবে নিভবে।'

'আমাদের ফৌজ যদি না-ই এসে থাকে, তাহলে আমরা এই ঝুঁকি মাথায় নেই কিভাবে?' বললেন কয়েদীর পিতা।

'ইনি নিজেই বের হয়ে যাবেন'– কয়েদী বলল– 'কাল-ই ইনি এখান থেকে বেরিয়ে যাবেন।'

'না, এর ব্যাপারে আমাদের কোন ভয় নেই'– কয়েদীর পিতা বললেন– 'এই একটু আগে তোমার ছোট ভাই দু'টি মুসলিম মেয়েকে নিয়ে এসেছে। ও, সারেমের পুত্র ওসমান এবং তাদের আরো কয়েকজন সঙ্গী মিলে মেয়ে দু'টোকে খৃস্টাদের রাজপ্রাসাদ থেকে উদ্ধার করে এনেছে। দু'জনকে আমরা আমাদের ঘরে লুকিয়ে রেখেছি।

'কারা ওরা?' জিজ্ঞেস করে কয়েদী।

'ওরা বলছে, গতকাল একটি কাফেলা থেকে খৃস্টানরা ওদেরকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছিল'– পিতা জবাব দেন– 'ওদের এক ভাই নাকি বন্দী অবস্থায় আছে।'

হঠাৎ চমকে উঠে আফাক। জিজ্ঞেস করে, 'কই, ওরা কোথায়?'

খানিক পর।

দু'বোনকে বুকে জড়িয়ে রেখেছে আফাক। তিনজনের চোখেই আনন্দের অশ্রু। বুকভরা কৃতজ্ঞতা। সে এক আবেগঘন দৃশ্য। বাবা-মা মারা গেছেন খৃস্টান দস্যুদের হাতে। লুণ্ঠিত হয়ে বন্দী হয়েছিল তিন ভাই-বোন। সাহায্য করার মত কেউ ছিল না তাদের। ফরিয়াদ করেছিল আল্লাহর দরবারে। আল্লাহ তাদের আকুতি কবুল করেছেন। এই অবিশ্বাস্য মিলন ছিল তাদের কল্পনারও অতীত।

কয়েদী আর দাঁড়ায় না। দ্রুত বেরিয়ে পড়ে সে। আবার গিয়ে হাজিরা দিতে হবে

তাকে বেগার ক্যাম্পে। বন্দীদশা থেকে পালাবার ইচ্ছে নেই তার।

কয়েদীর ছোট ভাই এ অভিযানে ছিল বারজিস ও ওসমান সারেমের সঙ্গে। মেয়ে দু'টোকে ঘরে রেখে-ই কোথাও চলে গেছে সে।

হঠাৎ ঘরে ফেরে আসে ছেলেটা। মেয়েদের বলে, 'এক্ষুণি উঠে আসুন, শহর থেকে বের হওয়ার সুযোগ পেয়ে গেছি।' আফাকের সংবাদটা জানানো হল তাকে। তাকেও সঙ্গে নিয়ে নিল সে। বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে।

বাইরে তিনটি ঘোড়া দন্ডায়মান। এ ব্যবস্থাপনা বারজিসের। দু'বোনকে দু'টি ঘোড়ায় চড়িয়ে বসান তিনি। নিজে যখন তৃতীয়টিতে আরোহণ করতে উদ্ধত হন, তখন আফাকের কথা বলা হল তাকে। আফাককে নিজের ঘোড়ায় তুলে নেন বারজিস।

শহরের পিছনের ফটক অভিমুখে ছুটে চলে তিনটি ঘোড়া। আতংকিত নগরবাসী পালাচ্ছে দলে দলে। বেরিয়ে যাচ্ছে শহর থেকে। কিন্তু বারজিস তখন মেয়েদের নিয়ে ফটকের নিকটে পৌঁছে, তখন ফটক বন্ধ হয়ে গেল বলে। বিপুল পরিমাণ জনতা আটকা পড়ে যায় ফটকের মুখে। হুলস্থুল পড়ে যায় ফটকের মুখে। বারজিস পিছন থেকে চীৎকার করে বলতে শুরু করে, 'পিছন থেকে ফৌজ আসছে। ফটক খুলে দাও। পালাও, মুসলমানরা আসছে।'

জনতার ভীড় ধাক্কা মারে সামনের দিকে। বন্ধ হতে হতেও খুলে যায় ফটক। ঢলের মত বিপুল লোক এক ঠেলায় বেরিযে যায় ফটক অতিক্রম করে।

ফটক পার হয়ে বেরিয়ে এসে বারজিস আফাককে বলল, তুমি তোমার এক বোনের ঘোড়ায় চড়ে বস। দু'জন পুরুষের ভার বহন করা এক ঘোড়ার পক্ষে কষ্টকর হবে। আমাদের সফর অনেক দীর্ঘ।

এক বোনের পিছনে চড়ে বসে আফাক। অপর বোনকে বলে, ভয়ের কিছু নেই, ঘোড়া তোমায় ফেলবে না। ঘোড়া হাঁকায় তারা।

পথে স্থানে স্থানে খৃষ্টানদের চৌকি বসানো আছে, তা জানা আছে বারজিসের। কোন্ পথে গেলে খৃষ্টান সেনাদের নজরে পড়তে হবে না, তাও তিনি জানেন। সেই পথ ধরে-ই এগুতে শুরু করেন তিনি।

কার্ক থেকে পালিয়ে আসা মানুষজন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এদিক-সেদিক। লেলিহান আগুনে আলোকিত হয়ে গেছে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত।

আফাক ও তার বোনেরা জানে না, তারা কিভাবে মুক্তি পেল। বারজিস বলছে না কিছু-ই। মাঝে-মধ্যে মুখ খুললেও আফাকের পার্শ্বে এসে তার কুশল জিজ্ঞেস করছে আর তার একাকী সওয়ার মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করছে, ভয় পাচ্ছ বোন!

পিছনে সরে যাচ্ছে কার্কের লেলিহান অগ্নিশিখা। ধাবমান ঘোড়াগুলোর গতির তালে কেটে যাচ্ছে রাত।

❁ ❁ ❁

রাত শেষে ভোর হল। সূর্যোদয়ের আগেই সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনীর এলাকায় পৌঁছে যান বারসিজ। এক কমান্ডারের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে সুলতান কোথায় আছেন জানতে চান তিনি। কমান্ডার বারজিসকে নিয়ে যান সিনিয়র এক কমান্ডারের নিকট। সুলতান এ মুহূর্তে কোথায় থাকতে পারেন বারজিসকে ধারণা দেন কমান্ডার। বারজিস উৎফুল্ল। অভিযান তাঁর ফুলসাক্সেস। তিনি শুধু দু'টো মেয়েকেই খৃস্টানদের কবল থেকে মুক্ত করেননি– কার্কে আগুন লাগানোর মত নাশকতামূলক অভিযান চালিয়ে খৃস্টান ফৌজ ও নাগরিক সাধারণের মনে চরম এক ভীতিও সঞ্চার করে এসেছেন। তিনি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরামর্শ দিতে চান যে, এক্ষুণি কার্ক আক্রমণ করা হোক।

কার্কের সকালটা ছিল নিদারুণ ভয়ানক। দাবানল নিভে গেছে বটে, তবে আগুন জ্বলছে এখনো। ধোঁয়ার কুন্ডলীও দেখা যাচ্ছে মাঝে-মধ্যে। খৃস্টান বাহিনীর সমুদয় রসদ উট-ঘোড়ার খাদ্য পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। জ্বলে গেছে সেনা ছাউনি ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ-সরঞ্জাম। রাতভর ছুটাছুটি করা ক্লান্ত-অবসন্ন উট-ঘোড়াগুলো এখন লা-ওয়ারিশ ঘুরে ফিরছে দিগ্বিদিক। স্থানে স্থানে পড়ে আছে অসংখ্য মানুষের লাশ। রাতে উট-ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষে মারা গেছে এরা। সেনাসদস্য ও বেগার ক্যাম্পের কয়েদীরা কূপ থেকে পানি তুলে আগুন নেভানোর কসরত চালিয়ে যাচ্ছে এখনো।

খৃস্টান নেতৃবর্গের এখনো ধারণা, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজ শহরে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কোন আলামত। দুর্গের প্রাচীর পরীক্ষা করে দেখে তারা। কিন্তু কই, ইসলামী ফৌজ তো দেখা যাচ্ছে না দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত কোথাও। চারপার্শ্বে ঘোরাফেরা করছে শুধু খৃস্টান ফৌজ। এবার তদন্তের পালা, আগুন লাগল কিভাবে।

আগুন লাগানোর প্রাক্কালে মেয়েরা খঞ্জরের আঘাতে যে সেন্ট্রিকে হত্যা করেছিল, পাওয়া গেল তার মৃতদেহ। কিন্তু উট-ঘোড়ার পেষা খেয়ে লাশটি এমনভাবে থেতলে গেছে যে, খঞ্জরের জখম ধরা যাচ্ছে না। সেখান থেকে সমান্য দূরে পাওয়া গেল আরো চারটি লাশ– চারটি মেয়ের লাশ। খৃস্টানদের উট-ঘোড়া বাঁধার স্থানে পড়ে আছে লাশগুলো। তদন্ত করছেন গোয়েন্দা প্রধান হরমুন।

হরমুন লাশগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ান। তাকিয়ে আছেন অপলক নেত্রে। অশ্বক্ষুরের পেষা খেয়ে খেয়ে বিকৃত হয়ে গেছে লাশের মুখমন্ডল। অক্ষত নেই শরীরের কোন অংশ। লাশগুলো পড়ে আছে একটি থেকে আরেকটি দূরে দূরে। ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে পরিধানের পোষাক। রক্ত-মাটি মেখে আছে কাপড়গুলোতে।

আসল রং বুঝবার কোন উপায় নেই। শুধু এতটুকু বুঝা যাচ্ছে যে, এগুলো মহিলার পোষাক। লাশ দেখেও বুঝা যায় যে, এরা নারী। সব ক'জনের সমস্ত দেহের চামড়া ছিলে গেছে। গোশত আলগা হয়ে গেছে কোন কোন স্থানে। হাড় দেখা যাচ্ছে কোথাও কোথাও। প্রতিটি লাশের গলায় একটি করে চেইন। চেইনের সঙ্গে বাঁধা আছে একটি ছোট্ট ক্রুশ। ক্রুশ প্রমাণ করছে মেয়েগুলো খৃস্টান।

হরমুন ও খৃস্টান সেনা অফিসারগণ বিস্মিত হয়ে পড়েন যে, নারীর লাশ পড়ে আছে কেন এখানে! এটি তো সামরিক এলাকা। কোন নাগরিকের তো এখানের আসার অনুমতি নেই! সাধারণ মানুষের চলাচলের পথও তো নয় এটি! এ তো পশু বাঁধা, রসদ রাখার জায়গা! নারীর লাশ কেন এখানে?

সেখানে পড়ে আছে আরো কয়েকটি লাশ। এগুলো সেনাসদস্যদের। রাতের আঁধারে মেয়েগুলো এখানে কেন এসেছিল, জবাব আছে এ প্রশ্নের। কিন্তু জবাবদাতা নেই কেউ।

যাক, এ প্রশ্ন মুখ্য নয়। আসল প্রশ্ন হল, আগুন লাগল কিভাবে? শহরের মুসলমানদের উপর সন্দেহ করা যায়। স্বাভাবিক। কিন্তু অপরাধীদের খুঁজে বের করা সহজ নয়। হানা শুরু হয়ে গেল সন্দেহভাজন মুসলমানদের ঘরে ঘরে। মসজিদে-মসজিদে, মাদ্রাসায়-মাদ্রাসায়। গ্রেফতারকৃতদের সংখ্যা বাড়তে লাগল দিন দিন। জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতন। তারপর জেল।

আন-নূর ও তার বান্ধবীদের পরিজন বেজায় পেরেশান। মেয়েগুলো ফিরে আসল না এখনো। তা হলে কি তারা ধরা পড়ে গেল? তারা তাদের কর্তব্য পালন করেছে পূর্ণ সাফল্যের সাথে। কিন্তু এখনো তারা নিখোঁজ। ঘরের কোণে আত্মগোপন করেনি ওসমান সারেম ও তার সঙ্গীরা। তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে, তথ্য সংগ্রহ করছে।

আগুন লাগার স্থানে উৎসুক জনতার প্রচন্ড ভীড়। বন্ধুদের নিয়ে ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে ওসমান সারেম। শুনতে পায়, চারটি মেয়ের লাশ পাওয়া গেছে।

খানিক পরে জনতার উদ্দেশ্যে ঘোষণা হল, লাশ চারটি অমুক স্থানে রেখে দেয়া হয়েছে। লাশগুলো দেখে তোমরা সনাক্ত করার চেষ্টা কর। জনতার ভীড় চলে যায় সে দিকে। একত্রিতভাবে রাখা লাশ চারটি দেখে ওসমান সারেম ও তার সঙ্গীরা। ক্রুশগুলো রেখে দেয়া হয়েছে লাশের বুকের উপর। কেউ চিনল না এরা কারা। যারা চিনল, তারা কি বলবে, এরা কারা? না, জীবন গেলেও নয়।

দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসে ওসমান সারেমের। ঝর ঝর করে নেমে আসে অশ্রু। ওসমান বেরিয়ে আসে জনতার ভীড় থেকে। বন্ধুরাও এসে মিলিত হয় তার সঙ্গে।

তারা জানে, লাশগুলো কাদের। ওসমান সারেমের বোন আন-নূর এর লাশও আছে এখানে। অবশিষ্ট তিনটি লাশ তার বান্ধবীদের। রাতে কর্তব্য পালন করে শহীদ হয়ে গেছে চারজন। তাদের শাহাদাতের চাক্ষুষ সাক্ষী নেই কেউ। লাশের সুরতহাল যে কাহিনী বর্ণনা করছে, তার বিবরণ অনেকটা হতে পারে এ রকম–

সেন্ট্রিকে হত্যা করে মেয়েরা আগুন লাগায়। তারপর ঘোড়ার রশি কাটে। তারপর তারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য ছুটন্ত ঘোড়ার কবলে পড়ে যায়। অবশেষে ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়ে নির্মমভাবে প্রাণ হারায় । আল্লাহ্ মালুম, কত শত উট-ঘোড়া দলিত করেছে লাশগুলো।

দু'টি মেয়ের ইজ্জত রক্ষা করার জন্য জীবন দিল চারটি মেয়ে। নিজ হাতে মেয়েগুলোর গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে দিয়েছিল বারজিস, যাতে প্রয়োজনে তারা দাবি করতে পারে, আমরা খৃস্টান।

মেয়েগুলোর জানাযা হল না। খৃস্টান মনে করে ক্রুসেডাররা তাদের-ই গোরস্তানে তাদের রীতি অনুসারে দাফন করে রাখে লাশগুলো। কেউ বিলাপ করল না তাদের জন্য। তবে, ঈসালে সাওয়ারের জন্য কুরআন পাঠ করা হল, গায়েবানা জানাযা পড়া হল ঘরে ঘরে গোপনে।

মুসলমানদের ঘরে তল্লাশী শুরু করে খৃস্টানরা। সক্রিয়-নিষ্ক্রিয়, মুজাহিদ-অমুজাহিদ কারো ঘর-ই বাদ পড়ল না অভিযান থেকে। প্রবলভাবে দু'টি আশংকা দেখা দিল। প্রথমতঃ মুসলমানরা ঘরে ঘরে যেসব অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিল, তল্লাশীতে ধরা পড়ে যাবে সব। তাই ভিটার মাটি খুড়ে খুড়ে অস্ত্রগুলো দাফন করে রাখল তারা। দ্বিতীয় আশংকা এই ছিল যে, যে চারটি মেয়ে শহীদ হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে জবাব দেয়া কঠিন হয়ে পড়বে যে, তারা কোথায়। আগুন লাগার রাতের পরদিন-ই ইমাম সাহেবকে যখন মেয়েদের শাহাদাতের সংবাদ দেয়া হল, তখন শুনে তিনি প্রথম কথাটি এই বললেন যে, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে মেয়েগুলো কোথায়, তাহলে জবাব কি দেবে?'

ইমাম সাহেব অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী মানুষ। প্রশ্নটা মুখ থেকে বের করে-ই মাথাটা নীচু করে, চোখ দু'টো অর্ধমুদ্রিত করে গভীর চিন্তায় হারিয়ে যান। খানিক পর মাথা তুলে চোখ খুলে বললেন, মেয়েগুলোর 'বাপ-ভাইদের আমার কাছে নিয়ে আস।'

সংবাদ পেয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে চলে আসে শাহাদাতপ্রাপ্ত চার মেয়ের পিতা ও ভাইয়েরা। তাদের সামনে প্রশ্নটা পুনর্ব্যক্ত করে ইমাম সাহেব তাদের একটি বুদ্ধি শিখিয়ে দেন এবং সকলকে নিয়ে খৃস্টান পুলিশ প্রশাসনের অফিসে চলে যান। অনুমতি নিয়ে পুলিশ প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও আবেগজড়িত কণ্ঠে বললেন–

'আমি এদের ইমাম। মসজিদে নামায পড়াই। গত রাতে যখন শহরে আগুন লাগে, তখন এরা আগুন নেভানোর জন্য ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। রাতভর এরা কূপ থেকে পানি তুলে আগুনে ছিটাতে থাকে। শহরে হুলস্থুল কান্ড ঘটে গিয়েছিল। কারো কোন হুঁশ-জ্ঞান ছিলনা। সকালে ঘরে ফিরে এরা জানতে পায় যে, আপনার লোকেরা এদের ঘরে ঢুকে এই চার ব্যক্তির চারটি যুবতী মেয়েকে তুলে নিয়ে গেছে। আমরা মেয়েগুলোর এখন পর্যন্ত কোন খোঁজ পাইনি।'

'আমাদের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করার আগে ভাল করে ভেবে দেখুন ইমাম সাহেব! আপনি একজন দায়িত্বশীল মানুষ। ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে পরে নিজে-ই ফেঁসে যাবেন।' কঠোর ভাষায় বলল পুলিশ প্রধান।

'আমি একজন ধর্মীয় নেতা জনাব! আপনার দরবারে আমি মিথ্যা বলতে আসিনি'– বললেন ইমাম সাহেব– 'আমি আপনাকে জানিয়ে যেতে চাই যে, আপনি আমাদের ধমক দিতে পারেন, আপনার পুলিশ বাহিনীকে নির্দোষ বলতে পারেন। কিন্তু আল্লাহর নিকট থেকে সত্যকে গোপন রাখতে পারেন না। আপনি আমাদের শাসক–খোদা নন। এ লোকগুলো আপনাদের রক্ষা করার জন্য সারা রাত আগুনের সাথে যুদ্ধ করল, আর আপনি কিনা তার পুরস্কার এই দিচ্ছেন যে, আপনার পুলিশ মেয়েগুলোকে তুলে নিয়ে গেল আর আপনি তার স্বীকৃতিটুকু পর্যন্ত দিচ্ছেন না! এই কি আপনাদের নীতি?'

দীর্ঘ তর্ক-বিতর্কের পর পুলিশ প্রধান বললেন, 'ঠিক আছে, আমি খুঁজে দেখব।' এতটুকু প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেয়া-ই ছিল ইমাম সাহেবের উদ্দেশ্য।

বাইরে এসে ইমাম বলে দিলেন, তোমরা প্রচার করে দাও যে, পুলিশ রাতে আমাদের মেয়েদের অপহরণ করে নিয়ে গেছে। তারা তা-ই করল। প্রতিবেশী অমুসলিমরা কথাটা বিশ্বাস করে নিল। বস্তুত রাতের শহরের অবস্থা এমন-ই ছিল যে, চারটি মেয়ে অপহরণ হওয়া ছিল স্বাভাবিক।

বারজিস সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর তাঁবুতে বসে আছেন। আফাকের ব্যাণ্ডেজ-চিকিৎসা সেরে ফেলেছেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ডাক্তার। আফাকের বোন দু'টিও তাঁবুতে বসা। সুলতানকে রাতের ঘটনাপ্রবাহ শোনাচ্ছেন বারজিস। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বারবার দৃষ্টিপাত করছেন মেয়ে দু'টোর প্রতি। চোখ দু'টো লাল হয়ে গেছে তাঁর।

বারজিস জানান, কার্ক শহরকে তিনি এমন এক অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে রেখে এসেছেন যে, এক্ষুণি যদি হামলা করা যায়, তাহলে হামলা সফল হতে পারে। শহরে সেনাবাহিনীর রসদ নেই। উট-ঘোড়ার খাদ্যও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পশুগুলো ভীত-সন্ত্রস্ত। জনগণ আতংকিত। ভয়ে সেনাবাহিনীও কাঁপছে থরথর করে।

গভীর ভাবনায় হারিয়ে যান সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। দীর্ঘক্ষণ পর মাথা তুলে নায়েব-উপদেষ্টাদের তলব করেন। আদেশ দেন, 'মেয়ে দু'টো ও তার ভাইকে কায়রো পাঠিয়ে দাও এবং তাদের ভাতা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দাও।'

'আমার বোন দু'টোকে আপনি আপনার হেফাজতে নিয়ে নিন'– আফাক বলল– 'আমি আপনার সঙ্গে থাকব। আমাকে আপনি সেনাবাহিনীতে ভর্তি করিয়ে নিন। আমি আমার বাবা-মায়ের খুনের প্রতিশোধ নেব। যদি আমাকে কার্ক পাঠিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আমি খৃস্টানদের আরো অস্থির করে তুলব।'

'যুদ্ধ আবেগ দিয়ে লড়া যায় না'– সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বললেন–'মুজাহিদ হতে হলে দীর্ঘ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। তুমি তো শুধু তোমার পিতা-মাতার খুনের বদলা নেয়ার জন্য উদগ্রীব হয়েছ। আর আমার নিতে হবে, সেইসব পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-কন্যাদের রক্তের বদলা, যারা জীবন-সম্ভ্রম খুইয়েছে খৃস্টান হায়েনাদের নির্যাতনের শিকার হয়ে। তুমি শান্ত হও। ভেবে-চিন্তে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ কর।'

আবেগ প্রশমিত হচ্ছে না আফাকের। যুদ্ধে যাওয়ার জন্য জিদ্ ধরেছে ছেলেটা। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বাধ্য করছেন তাকে বোনদের সাথে কায়রো চলে যেতে। সুলতান তাকে বললেন, 'কায়রো গিয়ে আগে নিজের চিকিৎসা করাও। সুস্থ হও। তারপর আমি তোমার আকাংখা পূরণ করব।'

ইত্যবসরে এসে উপস্থিত হন নায়েব সালার ও চীফ কমান্ডার। গোয়েন্দা উপ-প্রধান জাহেদানও আছেন তাদের সঙ্গে। আফাক ও তার বোনদের বাইরে পাঠিয়ে দেন। তাদের নিয়ে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বৈঠকে বসেন।

বৈঠকের আলোচ্য বিষয় উপস্থাপন করলেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। এক্ষুণি কার্ক অবরোধ করার পরামর্শ দিয়েছে বারজিস। এ ব্যাপারে আপনারা যার যার মতামত বলুন। কার্কের সর্বশেষ পরিস্থিতির বিবরণ দিলেন সুলতান। আলোচনা শুরু হল।

মুখ খুললেন জাহেদান। নিজ গোয়েন্দাদের রিপোর্টের আলোকে তিনি বললেন, খৃস্টান বাহিনী কেবল কার্ক দুর্গে-ই নয়- বাইরেও অবস্থান করছে। তাদের একটি অংশ বাইরে থেকে আমাদের অবরোধ ভেঙ্গে দেয়ার মত পজিশন নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। তারা রসদ সরবরাহে নিরাপত্তা বিধানের জন্য পর্যাপ্ত সৈন্য প্রস্তুত করে রেখেছে। সাময়িকের জন্য রসদের কিছু ঘাটতি দেখা দিলেও এ জন্য আমাদের আক্রমণ সফল হবে ধারণা করা আত্মপ্রবঞ্চনার শামিল। পুড়ে যাওয়া রসদ-সরঞ্জাম ছাড়াও তাদের আরো বিপুল আয়োজন রয়েছে। তাদের প্রত্যেক সৈনিকের সঙ্গে পর্যাপ্ত রসদ-সরঞ্জাম থাকে সব সময়। তাছাড়া তাদের সৈন্যসংখ্যাও আমাদের চেয়ে পাঁচ-ছয়গুণ বেশী। নিজ নিজ অভিমত পেশ করে বৈঠকে উপস্থিত অন্যরাও। অধিকাংশের অভিমত, বিলম্ব না করে এক্ষুণি আক্রমণ করা হোক। আরো কিছুদিন অপেক্ষা করার পরামর্শ

দেন কেউ কেউ। সকলের পরামর্শ মনোযোগ দিয়ে শুনেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। কমান্ডারের তীব্র স্পৃহা দেখে যারপরনাই প্রীত হন সুলতান। তাদের অধিকাংশের পরামর্শ হল, হামলা এক্ষুণি হোক বা ক'দিন পরে হোক, হামলা করে একথা যেন শুনতে না হয়, অবরোধ তুলে নাও। চুপচাপ সকলের পরামর্শ শুনতে থাকেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। অবশেষে ফৌজের মানসিক ও অন্যান্য অবস্থা জানতে চাইলেন তিনি। সন্তোষজনক জবাব পেলেন সুলতান।

'আমি অবিলম্বে হামলা করতে চাই'– সবশেষে বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী- 'তবে আমি তাড়াহুড়ার পক্ষে নই। দুর্গের শক্ত প্রাচীর-ই কেবল আমাদের প্রতিবন্ধক নয়–বাইরে ছড়িয়ে থাকা খৃস্টান বাহিনীর সঙ্গেও মোকাবেলা করে আমাদের বিজয় অর্জন করতে হবে। জাহেদান ঠিক-ই বলেছে যে, কার্কের ভিতরের ধ্বংসযজ্ঞে আমাদের প্রবঞ্চিত হওয়া যাবে না। তথাপি হামলা হবে অবিলম্বে। দূরত্ব তো বেশী নয়। একরাতে-ই আমাদের বাহিনী কার্ক পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারবে। কিন্তু একটি লড়াই তাদের দুর্গের বাইরে লড়তে হবে। রওনা হওয়ার আগে কার্কের মুসলমানদের প্রস্তুত করে নিতে হবে। আমি ভিতরের যেসব তাজা খবর পেয়েছি, তা হল, সেখানকার মুসলমানরা তলে তলে সংঘবদ্ধ হয়ে গেছে। আশা করা যায় আমরা দুর্গ অবরোধ করলে তারা ভিতরে নাশকতা চালিয়ে যাবে। তাদের বোন-কন্যারাও মাঠে নেমে এসেছে। চারটি মাত্র মেয়ে খৃস্টানদের যে পরিমাণ ক্ষতিসাধন করেছে, পঞ্চাশ সদস্যের চারটি বাহিনীর পক্ষেও তা সম্ভব ছিল না। আমরা শহরে আমাদের কমান্ডো ঢুকিয়ে দেয়ারও চেষ্টা করব।'

'কমান্ডো যদি পাঠাতে-ই হয়, তাহলে এক্ষুণি প্রেরণ করুন। আগুনের ভয়ে কার্কের যেসব নাগরিক পালিয়ে এসেছিল, তারা অবশ্যই ফিরে যাবে। তাদের ছদ্মাবরণে আমরা শহরে কমান্ডো ঢুকিয়ে দিতে পারি। এরপর কিন্তু সম্ভব হবে না। অনুমতি দিন, তাদের নিয়ে আজই আমি রওনা হয়ে যাই। সঙ্গে কোন অস্ত্র নিতে হবেনা। অস্ত্র ওখান থেকেই সংগ্রহ করা যাবে।' সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বলার মাঝে বলে উঠলেন বারজিস।

সিদ্ধান্ত হল, আজ রাতে-ই বারজিসের নেতৃত্বে কমান্ডো রওনা হয়ে যাবে। যতদূর পর্যন্ত ঘোড়া নিয়ে যাওয়া সম্ভব, ঘোড়ায় চড়ে যাবে। তার পরে পায়ে হেঁটে। সঙ্গে কিছু অতিরিক্ত লোক যাবে। তারা ঘোড়াগুলোকে মাঝ পথ থেকে ফিরিয়ে আনবে।

তৎক্ষণাৎ জাহেদানকে নির্দেশ দেয়া হল, বারজিসের নির্দেশনা মোতাবেক কমান্ডোদের অসামরিক পোশাকের ব্যবস্থা কর এবং সন্ধ্যার পর রওনা করিয়ে দাও।

সেনা কমান্ডারদের জরুরী নির্দেশনা দিতে শুরু করেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। বললেন–

'তোমাদের মনে রাখতে হবে, যে বাহিনীটি দিয়ে আমরা কার্ক আক্রমণ করাতে যাচ্ছি, এটি সেই বাহিনী নয়, যারা শোবক জয় করেছিল। এরা মিসর থেকে আগত সেইসব সৈনিক, যাদের মধ্যে দুশমন অস্থিরতা সৃষ্টি করে রেখেছিল। অবরোধ করে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা তাদের নেই। কাজেই সর্বক্ষণ কমান্ডারদের সতর্ক থাকতে হবে। আমার তো এ-ও সন্দেহ হচ্ছে যে, এ বাহিনীর মধ্যে বিকৃত চিন্তার সৈন্যও আছে। যে বাহিনীটিকে আমি নিজের হাতে রেখেছি, তারা তুর্কী ও শামী। নুরুদ্দীন জঙ্গীর প্রেরিত বাহিনীটিকেও আমি আমার কাছে রিজার্ভ রাখব। পরিস্থিতি তোমাদের প্রতিকূলে চলে গেলে ভয় পেয়ে পিছনে সরে এস না। আমি তোমাদের পিছনে থাকব। আর হ্যা, তোমরা কার্কের মুসলমানদের আশায় বসে থেক না। আমি তাদের জন্য যে পয়গাম প্রেরণ করব, তা কক্ষনো এমন হবে না যে, তার এমন ঝুঁকিবরণ করে নেবে যে, তাদের মহিলাদের ইজ্জতও নিরাপদ থাকবে না। আমি তাদের কাছে এত বেশী কোরবানী চাইব না। তারা খৃস্টানদের শাসনাধীন, অসহায়, অপারগ। নির্যাতনের শিকার। আমরা যাচ্ছি তাদের আযাদী ও মুক্তির জন্য- তাদের ভরসায় নয়।

❁ ❁ ❁

কার্কের মুসলমানদের ঘরে ঘরে খৃস্টানদের হানা অব্যাহত থাকে পাঁচদিন পর্যন্ত। সন্দেহবশতঃ গ্রেফতার হয় বেশ ক'জন মুসলমান। বেগার ক্যাম্পের যে কয়েদীদের মুক্তি দেয়ার ওয়াদা দিয়ে আগুন নেভাতে নেয়া হয়েছিল, মুক্তি দেয়া হয়নি তাদের। মুসলিম নির্যাতনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে খৃস্টানরা। অগ্নিকান্ডে তাদের ক্ষয়ক্ষতি ছিল অস্বাভাবিক। তাদের জানা ছিল যে, মুসলমান ছাড়া এমন দুঃসাহসী অভিযান চালাতে পারে না অন্য কেউ।

গ্রেফতারকৃতদের দু'জন হল ওসমান সারেমের বন্ধু। মেয়েদের মুক্তি অভিযানে শরীক ছিল তারা। নির্মম নির্যাতন চালানো হয় তাদের উপর। তবু কোন তথ্য মিলছে না খৃস্টানদের। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে এই দু'যুবকের হৃদয়ে লুকায়িত আছে সব তথ্য। কিন্তু মুখ তাদের বন্ধ। নির্মম নির্যাতনে শরীরের জোড়াগুলো আলগা হয়ে গেছে তাদের। তবু মুখ খুলছে না তারা।

অবশেষে নিজে কয়েদখানায় এসে উপস্থিত হন হরমুন। দৃষ্টি তার এই দু'যুবকের উপর। হরমুনের মুসলমান গুপ্তচররা জানিয়েছে যে, এরা দু'জন আগুন লাগানোর ঘটনায় জড়িত। সংবাদদাতা দু'জন মুসলমান। দু'জন-ই এ দু'যুবকের প্রতিবেশী। অর্থে-বংশে সাধারণ মানুষ। কিন্তু এখন চলে ঘোড়াগাড়ীতে করে। খৃস্টানদের দরবারে তাদের অবাধ যাতায়াত। এক একজনের দু'-তিনটি করে বউ। মদ চলে রীতিমত।

গ্রেফতারকৃত এই দু'যুবককে তারা আগুন লাগার ঘটনার রাতে কোথাও সন্দেহজনক অবস্থায় দেখেছিল। তারা-ই ধরিয়ে দিয়েছে যুবকদের।

কয়েদখানায় এসে যুবকদের অবস্থা দেখে হরমুন বুঝতে পারলেন যে, নির্যাতনে মুমূর্ষু অবস্থায় এসেও যুবকরা যখন কিছু বলছে না, তো এদের নিকট থেকে আর তথ্য পাওয়ার আশা করা যায় না। নির্যাতন এদের গা-সহা হয়ে গেছে।

যুবকদের সঙ্গে করে নিয়ে যান হরমুন। উন্নত খাবার খাওয়ান। মমতা দেখান তাদের প্রতি। ডাক্তার এনে চিকিৎসা করান, ঔষধ খাওয়ান । তারপর তাদের শুইয়ে দেন আরাম বিছানায়। মুহূর্তের মধ্যে তারা গভীর নিদ্রায় তলিয়ে যায়।

হরমুন বসে পড়েন দু'জনের মধ্যখানে। কিছুক্ষণ পর বিড়বিড় করে উঠে একজন। ঘুমের ঘোরে স্পষ্ট ভাষায় বলতে শুরু করে, 'আমি কিছু জানি না। আমার দেহটা কেটে টুকরো টুকরো করে ফেল। আমি কিছুই বলতে পারব না। কোন কথা জানা থাকলেও বলব না। তোমরা তোমাদের গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে রাখ আর আমি আমার গলায় বেঁধে রেখেছি পাক কুরআন।'

'তুমি আগুন লাগিয়েছ'– হরমুন বললেন– 'তুমি খৃস্টানদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছ। তুমি বাহাদুর। মরে গেলে মানুষ তোমাকে শহীদ বলবে।'

'আমি যদি মরে যাই'- আবার বিড়বিড় করে যুবক– 'আমি যদি মরে যাই, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দেহে প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানও থাকবে। প্রাণ বের হয়ে যাবে তো ঈমান বের হবে না।

যুবকের ঘুমন্ত মস্তিষ্কে নিজের মনের কথা ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন হরমুন। কিন্তু যুবকের মস্তিষ্ক কোন কথা-ই গ্রহণ করছে না তার।

এমন সময়ে বিড়বিড় করে উঠে অপর যুবকও। এবার তার প্রতি মনোনিবেশ করেন হরমুন। ঘুমের ঘোরে তার থেকেও কথা নেয়ার চেষ্টা করেন তিনি। সঙ্গে তার আরো তিন-চারজন গোয়েন্দা। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর হতাশার নিঃশ্বাস ছেড়ে হরমুন বললেন, 'আর চেষ্টা করা বৃথা। এদের মুখ থেকে তোমরা কোন কথা বের করতে পারবে না। মনে হয় লোকগুলো নির্দোষ। তবে কিন্তু আপন বিশ্বাস ও চেতনায় বড় পাকা। তৈলাক্ত খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে আমি এদেরকে যে পরিমাণ হাশীশ খাইয়েছি, তা যদি একটি ঘোড়াকে খাওয়াতাম, তাহলে ঘোড়া কথা বলতে শুরু করত। কিন্তু এদের উপর কোন ক্রিয়া-ই হল না। তার অর্থ, এদের জাতীয় চেতনা– এরা যাকে ঈমান বলে– এদের আত্মায় ঢুকে পড়েছে। আর এদের আত্মার উপর তোমরা নেশা প্রয়োগ করতে পারবে না। অন্যথায় বলতে হবে এরা নির্দোষ, ঘটনার সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই।'

ঠিক-ই এরা নির্দোষ। খৃস্টানরা যাকে অপরাধ মনে করে, এই মুসলমান যুবকদের কাছে তা সওয়াবের কাজ। খৃস্টানদের দৃষ্টিতে যা সন্ত্রাস, এই মুসলমানদের কাছে তা জিহাদ। আগুন লাগানো ও অপহৃত মেয়ে দু'টোর উদ্ধার অভিযানের এরা সক্রিয় কর্মী। তবে এরা নিরপরাধ।

হাশীশ তাদের অজ্ঞান করে তুলেছিল। নেশার প্রভাবে বিবেক ঘুমিয়ে পড়েছিল তাদের। কিন্তু তাদের আত্মা ছিল সজাগ। তাদের মুখ থেকে সামান্য ইংগিতও নিতে পারেনি খৃস্টানরা। অগত্য তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ছেলেগুলো বে-কসুর।

যুবক দু'টোর যখন চোখ খুলে, তখন জনমানবহীন একস্থানে পড়ে আছে তারা। অচেতন অবস্থায় খৃস্টানরা তাদের সেখানে ফেলে এসেছিল। জাগ্রত হয়ে চোখাচোখী করে দু'জন। তারপর উঠে চলে আসে যার যার বাড়ীতে।

কার্কের পরিস্থিতি এখন শান্ত। আগুনও নিভে গেছে। মুসলিম বাহিনীর আক্রমণ সংবাদেরও সত্যতা পাওয়া যায়নি। এবার দলে দলে ফিরে আসতে শুরু করেছে পালিয়ে যাওয়া নাগরিকরা। দুর্গের ফটক খুলে দেয়া হল। স্রোতের মত ঢুকতে শুরু করল জনতা। এদের-ই সঙ্গে ঢুকে পড়েছিলেন বারজিস। সঙ্গে তার পনেরজন কমান্ডো।

কার্কের মানুষ দেখল, নিতান্ত সরল-সোজা যে মুচি রাস্তায় বসে মানুষের জুতা মেরামত করত, তিনদিনের অনুপস্থিতির পর আবার এসে বসে পড়েছে রাস্তায়। পনেরজন কমান্ডোকে ওসমান সারেম ও তার বন্ধুদের সহযোগিতায় রাতারাতি মুসলমানদের ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলেন তিনি। তাদের কেউ এখন দোকানের কর্মচারী। কেউ খৃস্টানদের আস্তাবলের সহিস। কেউ মসজিদের খাদেম।

এবার তাদের দেখতে হবে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী শহর আক্রমণ করলে ভিতর থেকে তারা কি সহযোগিতা করতে পারবে। খুঁজে-পেতে কর্তব্য স্থির করে তারা। তা হল, কোন এক স্থান দিয়ে দুর্গের প্রাচীর ভেঙ্গে সুলতানের বাহিনীকে ভিতরে প্রবেশ করার সুযোগ করে দেয়া। এ কাজের জন্য পরিবেশ তৈরি করতে শুরু করেছে তারা।

যুব সংগঠনের সদস্য বৃদ্ধি করেছে ওসমান। প্রস্তুত করে তুলেছে অনেক মেয়েকে। কিন্তু ছায়ার মত তার পিছনে লেগে আছে রাইনি আলেকজান্ডার। রাইনি পথ আগলে ধরছে ওসমান সারেমের। ঘন ঘন যাওয়া আসা করছে তার বাড়িতে। একদিন কৌতূহলবশত মেয়েটি ওসমান সারেমকে জিজ্ঞেস করে বসে, 'আন-নূর কোথায় ওসমান?'

'তোমার জাতির কোন এক পাপিষ্টের কাছে'–জবাব দেয় ওসমান– 'ওর উপর আল্লাহর লানত।'

'লানত' নয়– 'রহমত' বল ওসমান'– রাইনি বলল– 'যারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করে, তাদের তোমরা শহীদ বল। আন-নূর শহীদ হয়ে গেছে।'

হঠাৎ চমকে উঠে ওসমান। কোন জবাব খুঁজে পেল না সে।

'আর মেয়ে দু'টোকে উদ্ধার করে আনার কাজে তুমিও ছিলে'– রাইনি বলল– 'তবে এখনো তুমি গ্রেফতার হওনি। আমি না বলেছিলাম, তোমার ও কয়েদখানার মাঝে আমার অস্তিত্ব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। বল, ওসমান! আর কত ত্যাগ চাও তুমি!'

ওসমান সারেম যুবক। দেহে জোশ-জযবা যতটুকু, বুদ্ধি-বিবেক ততটুকু নেই। বিচক্ষণতা অভাব আছে ছেলেটার। রাইনির কথাগুলো অস্থির করে তুলে তাকে। মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করে, 'রাইনি! আমার কাছে কি চাও তুমি?'

'প্রথমতঃ তুমি আমার ভালবাসা বরণ করে নাও। দ্বিতীয়তঃ এসব গোপন সন্ত্রাসী তৎপরতা থেকে ফিরে আস।' জবাব দেয় রাইনি।

'তুমি তোমার সরকার ও তোমার জাতিকে ভালবাস। তোমার হৃদয়ে আমার ভালবাসা যদি এতই গভীর হয়ে থাকে, তাহলে আমার জাতির প্রতি সমবেদনা দেখাচ্ছ না কেন?' বলল ওসমান সারেম।

'আমার না নিজ জাতির প্রতি ভালবাসা আছে, না তোমার জাতির প্রতি'– বলল রাইনি– 'আমি বুঝি শুধু তোমাকে। এসব ভয়ংকর তৎপরতা থেকে আমি তোমাকে ফিরে আসতে বলছি এজন্য যে, তুমি মারা যাবে। অর্জন হবে না কিছুই। আমি আবেগতাড়িত নই। যা বাস্তব, তা-ই শুধু তোমাকে বলছি। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী কার্ক জয় করতে পারবেন না। আমি আব্বার নিকট থেকে শুনে বলছি। এবার যুদ্ধ অবরোধের হবে না। যুদ্ধ হবে কার্কের বাইরে অনেক দূরে। আমাদের কমান্ডাররা আইউবীর কৌশল ধরে ফেলেছেন। শোবকের পরাজয় থেকে তারা শিক্ষা নিয়েছেন। আইউবীর বাহিনী এবার দুর্গ অবরোধের সুযোগ-ই পাবে না। এমতাবস্থায় তোমরা যদি শহরের ভিতর থেকে কোন তৎপরতা চালাও, তা হলে ফল একটা-ই। তোমরা হয়ত মারা পড়বে কিংবা ধরা খেয়ে অবশিষ্ট জীবন আমাদের বন্দীশালার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ধুঁকে ধুঁকে অতিবাহিত করবে। আমি তোমাকে শুধু জীবিত ও নিরাপদ দেখতে চাই।'

মনোযোগ সহকারে রাইনির কথাগুলো শোনে ওসমান সারেম। তারপর অবনত মস্তকে হাঁটা দেয় সেখান থেকে। আবারো রাইনির কণ্ঠ শুনতে পায় ওসমান। 'ভেবে দেখ ওসমান, ভেবে দেখ। বিধর্মী মেয়ে বলে আমার কথাগুলো ফেলে দিও না ভাই!'

❁ ❁ ❁

'আমি আপনাদের আবারো স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কার্ক আর শোবক এক নয়'– শেষবারের মত নির্দেশনা দিতে গিয়ে কমান্ডারদের উদ্দেশে বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী– 'খৃস্টানরা এখন আগের চে' বেশী সজাগ ও সতর্ক। আমি গুপ্তচর মারফত জানতে পেরেছি যে, একটি যুদ্ধ আমাদের কার্কের বাইরে লড়তে

হবে। শহরের ভিতর থেকে মুসলমানরা যদিও কোন গোপন তৎপরতা চালায়, বোধ হয় তা আমাদের উপকারে আসবে না। তার পরিণতি এ-ও হতে পারে যে, লোকগুলোর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে। আমি তাদেরকে এত কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে চাই না। তীব্র আক্রমণ-ই তাদের রক্ষা করার একমাত্র পথ।'

এরূপ আরো কিছু জরুরী নির্দেশ-উপদেশ দিয়ে কার্ক অবরোধকারী সৈন্যদের রওনা করার আদেশ দেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

সূর্যাস্তের পর বাহিনী রওনা হল। দূরত্ব বেশী নয়। সোবহে সাদেকের আগে আগে-ই শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে যায় বাহিনী। অবরোধের বিন্যাসে সম্মুখে অগ্রসর হয় এখান থেকে।

পথে কোন খৃস্টান সৈনিক চোখে পড়ল না তাদের। এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তারা শুনেছিল, খৃস্টান বাহিনী শহরের বাইরে ছাউনি ফেলে অবস্থান নিয়ে আছে।

কার্ক দুর্গ অবরোধ করে ফেলে মুসলিম বাহিনী। দুর্গের প্রাচীরের উপর থেকে তীরবর্ষণ শুরু হয়। তীব্র জবাবী হামলা থেকে বিরত থাকে মুসলিম বাহিনী। কোথায় প্রাচীর ভেঙ্গে বা ছিদ্র করে ভিতরে প্রবেশ করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে কমান্ডাররা। তীরান্দাজদেরও বিরত রাখেন তারা। কার্ক সম্পর্কে অভিজ্ঞ গুপ্তচররা শহরের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছে কমান্ডারদের।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনী দুর্গ অবরোধ করেছে, এ সংবাদ এখনো পায়নি নগরবাসী। অবরোধ এখনো সম্পন্ন হয়নি। পিছনটা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। দু'টি ফটক আছে সেদিকটায়।

হঠাৎ অগ্নিগোলা নিক্ষিপ্ত হতে শুরু করে দুর্গের ভিতরে সেনা অবস্থানের উপর। মিনজানিকের মাধ্যমে বাইরে থেকে নিক্ষেপ করা হচ্ছে সেগুলো। এটি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর আবিষ্কার।

টের পেয়ে গেছে নগরবাসী। তারা দেখতে পাচ্ছে, তাদের সৈন্যরা দুর্গের প্রাচীরে উঠে বাইরের দিকে তীর ছুড়ছে সমানে। আতংক ছড়িয়ে পড়ে জনমনে। নিজ নিজ ঘরে লুকিয়ে পড়ে ইহুদী ও খৃস্টান নাগরিকরা। সেজদায় পড়ে যায় মুসলমানরা। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিজয়ের জন্য দু'আ করছে তারা। বিপদজ্জনক তৎপরতায় লিপ্ত কিছু মুসলমান। তারা সমাজের যুবক শ্রেণী। মেয়েরাও আছে এদের মধ্যে। আছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর পনেরজন কমান্ডো। নগরবাসীদের অস্থিরতার সুযোগে একস্থানে সমবেত হয়েছে। এ দুর্গের প্রধান ফটক খুলে দেয়ার কিংবা ভেঙ্গে ফেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে তারা।

ফটক ভাঙ্গার জন্য গোলা ছুড়ল মুসলিম বাহিনী। মোটা কাঠের তৈরী মজবুত ফটক। কাঠের উপর লোহার পাত মোড়ানো। গোলার আঘাতে ভাঙ্গল না দুর্গের ফটক। উপর থেকে বৃষ্টির মত তীর ছুড়ে চলেছে খৃস্টানরা। অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে

আঘাত হানছে তীর। কামানের সাহায্যে গোলা নিক্ষেপ করা হচ্ছে যেখান থেকে, তীর পৌঁছে যাচ্ছে সে পর্যন্ত। তীরের আঘাতে শহীদ হয়ে গেছে কয়েকজন মুসলিম সৈনিক। আহত হয়ে পড়েছে অনেকে। আত্মরক্ষার জন্য কামানগুলো সরিয়ে নেয়া হয় আরো পিছনে। ব্যর্থ হয়ে পড়ে গোলা নিক্ষেপের প্রক্রিয়া।

প্রাচীরের উপর অবস্থিত দুশমনদের উপর তীর নিক্ষেপ করার নির্দেশ পায় মুসলিম সৈনিকরা। উপর দিক থেকে তীর ছোড়াছুড়ি চলতে থাকে দিনভর। শূন্যে তীর উড়তে-ই দেখা যাচ্ছে শুধু । ক্ষয়-ক্ষতি বেশী হচ্ছে মুসলমানদের।

প্রচীর ভাঙ্গার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে মুসলমানরা। বিশেষজ্ঞরা ঘুবে-ফিরে দেখার চেষ্টা করে চারদিক। কিন্তু তীরের জন্য কাছে ভিড়তে পারছে না তারা।

সন্ধার খানিক আগে আটজনের একটি দল এগিয়ে যায় সামনের দিকে। এখনো প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছুতে পারেনি তারা। হঠাৎ ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে আসে উপর থেকে। সেই সাথে আসে বর্শা। শহীদ হয়ে যায় আটজন জানবাজের সব ক'জন। একাধিক তীর-বর্শা বিদ্ধ হয় তাদের এক একজনের গায়ে।

রাতের প্রথম প্রহর। রাইনি তার ঘরে বসা। অবসন্ন দেহে ঘরে আসে তার পিতা। 'রাতে-ই আমার ডিউটি আছে, তাড়াতাড়ি উঠতে হবে' বলেই বিছানায় গা এলিয়ে দেন তিনি। বালিশে মাথা রেখে তিনি বললেন, 'সংবাদ পেয়েছি, শহরের মুসলমানরা ভিতর থেকে ভয়ানক কিছু একটা করতে যাচ্ছে। প্রতিটি মুসলিম পরিবারের উপর নজর রাখতে হচ্ছে।' বলেই ঘুমিয়ে পড়ে রাইনির পিতা।

কিছুক্ষণ পর করাঘাত পড়ে দরজায়। চাকরের পরিবর্তে উঠে গিয়ে দরজা খুলে রাইনি। একজন বিত্তশালী মুসলমান বাইরে দাঁড়িয়ে। নতুন বড় লোক। খৃস্টানদের দালালী করে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ। রাইনি লোকটাকে চিনে। তাই আগমনের হেতু জিজ্ঞেস না করে-ই বলল, আব্বা এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছেন। জাগবেন কিছুক্ষণ পর। সংবাদটা আমাকে বলে যান, আমি আব্বাকে বলব। আগন্তুক বলল, না, ওনার সঙ্গে আমার সরাসরি কথা বলতে হবে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে।

'কথাটা আমি জানতে পারি কি?' জিজ্ঞেস করে রাইনি।

'মুসলমানদের বেশ কিছু যুবক-যুবতী এই আজ রাতে ভিতর থেকে প্রাচীর ভেঙ্গে আইউবীর বাহিনীকে ভিতরে ঢোকবার সুযোগ করে দেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে'– জবাব দেয় আগন্তুক– 'আমি বন্ধু সেজে তাদের কাছে গিয়ে এ তথ্য সংগ্রহ করেছি। আমি আরো সংবাদ পেয়েছি যে, এদের সঙ্গে বাইরে থেকে আসা কমান্ডোও আছে। সবচে' চাঞ্চল্যকর তথ্য হল, ঐ যে মুচিটি রাস্তায় বসে জুতা মেরামত করে, লোকটা আইউবীর গুপ্তচর। নাম বারজিস। তথ্যগুলো আমি তোমার পিতাকে জানাতে চাই, যাতে সময় থাকতে তিনি ব্যবস্থা নিতে পারেন।'

রাইনি কয়েকজন মুসলমানের নাম উল্লেখ করে ওসমানের নাম বলে জিজ্ঞেস করল, 'এ ছেলেটাও কি অভিযানে আছে?'

'আছে মানে? সারেমের পুত্র ওসমান-ই তো এ দলের নেতা। আর তার নেতা হল ইমাম রাজী।' জবাব দেয় আগন্তুক।

'আপনি খানিক পরে আবার আসুন। আব্বাকে একটু ঘুমুতে দিন।' অনুযোগের স্বরে বলল রাইনি।

কিন্তু যেতে চাচ্ছে না দালালটা। খৃস্টানদের খুশী করে পুরস্কার গ্রহণ করার এটি তার এক মোক্ষম সুযোগ। সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইছে না লোকটা। লোকটা যে কুরআনের পরিবর্তে ক্রুশের অফাদার, বিষয়টা জানে না মুসলমানরা।

তথ্যটা ভুল নয়। আজ রাত-ই প্রাচীর ভাঙ্গার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে মুসলিম যুবক ও কমান্ডোরা। এ গোপন বৈঠকে উপস্থিত ছিল বেশ ক'জন আলেম-ইমাম। ছিল এই দালাল মুসলমানটাও। সবচে' বেশী আবেগ জাহির করেছিল এই লোকটা। লোকটা দুশমনের পোষা সাপ হতে পারে কল্পনাও করেনি কেউ।

ফিরে যেতে চাইছে না লোকটা। ভাবনায় পড়ে গেল রাইনি। মনে বুদ্ধি আঁটে মেয়েটা। তাকে ভিতরে বসতে না দিয়ে 'চলুন' বলে হাতের ইশারায় নিয়ে যায় বাইরে। 'ঘটনাটা বিস্তারিত বলুন' বলে লোকটার পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করে মেয়েটা। নিয়ে যায় একটি কূপের ধারে।

রোমাঞ্চ অনুভব করে লোকটি। এত বড় একজন অফিসারের একটি রূপসী মেয়ে হাঁটছে তার পাশাপাশি! লোকটা ভাগ্যবান মনে করে নিজেকে।

কূপের পাড়ে গিয়ে দাঁড়ায় রাইনি। লোকটাও দাঁড়িয়ে আছে তার পাশ ঘেঁষে। কথা বলছে দু'জনে। দু'জনেই তাকিয়ে আছে কূপের প্রতি। আলতো পরশে লোকটার কাঁধের উপর নিজের ডান হাতটা রাখে রাইনি। উষ্ণতা অনুভব করে লোকটা। মুখের কথা বন্ধ হয়ে যায় তার। চলে যায় অন্য জগতে।

কাঁধ থেকে হাতটা আস্তে আস্তে নীচে নামিয়ে আনে রাইনি। লোকটার পিঠ বরাবর এসে থেমে যায়। নিজে খানিকটা সরে আসে পিছনে। অমনি একটা ঠেলা। লোকটা পড়ে যায় কূপের ভিতর। কূপটা যেমন নোংরা, তেমনি গভীর। একটা চীৎকার ভেসে আসে রাইনির কানে। 'ধড়াম' শব্দের সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে যায় তার আর্তচীৎকার।

বিজয়ের হাসি ফুটে উঠে রাইনির মুখে। ওসমান সারেমকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করতে পারত এমন একটি তথ্য কূপের গভীরে ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে এ-ই তার আনন্দ।

❁ ❁ ❁

সেখান থেকে-ই রাইনি দ্রুত ছুটে যায় ওসমান সারেমের ঘরে। ওসমান ঘরে নেই। জিজ্ঞেস করে মাকে। ওসমানের মা জানালেন, ছেলেটা সন্ধ্যার পরপরই কোথায় যেন গেল, এখনো ফিরেনি। ঘটনাটা বুঝে ফেলে রাইনি। বন্ধুদের নিয়ে প্রাচীর ভাঙ্গার অভিযানে-ই গেছে ওসমান। ওসমানকে বারণ করতে এসেছিল রাইনি। এক দালাল শেষ হয়েছে ঠিক, ওদের ভিতরে আরো কেউ দালাল যে নেই, তার গ্যারান্টি কি? অন্য কেউ যদি খৃস্টানদের কাছে তথ্যটা জানিয়ে দেয়, তবে তো ধরা পড়ে যাবে ওসমান।

হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে রাইনি। দুর্গের যেদিক থেকে ওসমানরা প্রাচীর ভাঙ্গার পরিকল্পনা নিয়েছিল, ছুটে যায় সেদিকে। যে মুসলমানটিকে রাইনি কূপে নিক্ষেপ করে এসেছে, সে তাকে বলেছিল, আইউবীর কমান্ডোরা প্রাচীরের উপরে উঠে তীরান্দাজ খৃস্টানদের এমনভাবে হত্যা করে ফেলবে যে, কেউ টের-ই পাবে না। যুবক-যুবতী নীচ থেকে খুড়ে খুড়ে প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলবে। দুর্গের প্রাচীর মাটির তৈরী। এত চওড়া যে, দু'টি ঘোড়া পাশাপাশি দৌড়াতে পারে অনায়াসে। এই প্রাচীর খুড়ে খুড়ে ভেঙ্গে ফেলা শুধু কষ্টসাধ্য-ই নয়- দুঃসাধ্যও বটে।

প্রয়োজনে যুদ্ধ করার প্রস্তুতিও নিয়ে রেখেছে ওসমান বাহিনী। সঙ্গে আছে তাদের খঞ্জর ও বর্শা। সে এক দুঃসাহসী অভিযান, যা ব্যর্থ হওয়ার আশংকা-ই প্রবল। প্রাচীর ভাঙ্গার জন্য তারা প্রাচীরের এমন একটি স্থান নির্বাচন করে নিয়েছে, যেখানে ধরা পড়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম।

নির্দিষ্ট স্থান অভিমুখে রওনা হয়ে গেছে ওসমান বাহিনী। রাইনিও ছুটে চলেছে সেদিকে। ওসমান সারেমকে এ বিপজ্জনক অভিযান থেকে ফেরাতেই হবে রাইনির। রাইনি নিশ্চিত, লোকগুলো ধরা পড়বে আর ওসমান সারেম মারা যাবে।

ওসমান বাহিনী যাচ্ছে এক পথে আর রাইনি ধরেছে অন্য পথ। ওরা যাচ্ছে ধীরগতিতে সন্তর্পণে আর রাইনি যাচ্ছে দৌড়িয়ে। ওসমানদের আগেই গন্তব্য পৌঁছে যায় রাইনি।

অন্ধকারে এদিক-ওদিক তাকায় রাইনি। পাগলের মত হয়ে গেছে মেয়েটা। হঠাৎ পেছন থেকে কে একজন ধরে ফেলে তাকে। টেনে নিয়ে যায় আড়ালে। লোকটা একজন খৃস্টান ফৌজি। রাইনির পরিচয় জানতে চায় ফৌজি। পিতার নাম উল্লেখ করে পরিচয় দেয় রাইনি। তাকে সেখান থেকে সরে যেতে বলে ফৌজি। কিন্তু রাইনি নড়ছে না এক পা-ও। ওসমানকে বাঁচাতে-ই হবে তার।

খৃস্টানদের বিশাল এক বাহিনী লুকিয়ে আছে এখানে। ফৌজি রাইনিকে বলে, মুসলমানদের একটি দল দেয়াল ভাঙ্গার জন্য রাতে এখানে আসার কথা। ওদের ধরার জন্য আমরা ওঁত পেতেছি...। অপর এক মুসলমান চর খৃস্টানদের কানে দিয়েছে সংবাদটা।

খৃস্টান সৈনিকদের এখান থেকে চলে যেতে বলতে পারে না রাইনি। তার উদ্দেশ্য ওসমানকে রক্ষা করা। একজন মুসলমান যুবকের ভালবাসা অন্ধ করে তুলেছে মেয়েটাকে। ইত্যবসরে একজন সৈনিক বলে উঠল, 'তথ্য ভুল নয়, ওরা আসছে।'

কেঁপে উঠে রাইনি। চীৎকার করে বলে, 'ওসমান! ফিরে যাও, ফিরে যাও বলছি ওসমান!'

রাইনির মুখে হাত চেপে ধরে কমান্ডার। বলে, 'মেয়েটা গুপ্তচর মনে হয়। একে বন্দী কর।'

কিন্তু রাইনিকে গ্রেফতার করার সুযোগ আর পেলনা খৃস্টানরা। প্রচন্ড কোলাহল ভেসে এল দূর থেকে।

খৃস্টানদের ফাঁদে এসে আটকা পড়েছে ওসমান বাহিনী। সংখ্যায় খৃস্টানরা বিপুল। জানবাজ মুসলিম বাহিনীটি নিজেদের সামলে নেয়ার আগেই বেষ্টনীতে পড়ে গেছে খৃস্টানদের। প্রদীপ জ্বলে উঠে চারদিকে। আলোকিত হয়ে যায় সমগ্র এলাকা। মুসলমানদের হাতে খনন-যন্ত্র, বর্শা ও খঞ্জর। পালাবার কোন সুযোগ নেই তাদের। গ্যাড়াকলে আটকা পড়ে গেছে দুঃসাহসী এই মুসলিম জানবাজ বাহিনীটি। এগারজন মেয়ে আছে দলে। খৃস্টান কমান্ডার উচ্চকণ্ঠে বলল, ' 'মেয়েগুলোকে জীবিত গ্রেফতার করে নাও।' জানবাজদের একজন ঘোষণা করল, 'মুজাহিদগণ! পালাবে না কিন্তু। মেয়েগুলোকে একজন একজন করে সঙ্গে রেখে লড়াই চালিয়ে যাও।'

দু'দলে যুদ্ধ শুরু হল। তীব্র এক রক্তক্ষয়ী লড়াই। মুসলমানদের সব ক'জনই প্রশিক্ষিত লড়াকু। সংখ্যায় নগন্য হওয়া সত্ত্বেও তারা খৃস্টানদের অস্থির করে তুলে। বীর বিক্রমে লড়াই করছে মেয়েরাও। উত্তেজিত করছে যুবকদের। তাদের ধরতে আসা বেশ ক'জন খৃস্টানকে খঞ্জরের আঘাতে যমের হাতে তুলে দেয় তারা।

ইতিমধ্যে এসে পড়ে খৃস্টানদের আরো দু'প্লাটুন সৈনিক। যুদ্ধ চলছে ঘোরতর। ভেসে আসে উচ্চকিত এক নারীকণ্ঠ। 'বেরিয়ে যাও ওসমান! ওসমান তুমি যে করে হোক পালাও।'

এটি রাইনির কণ্ঠ। প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছে ওসমান। একজন খৃস্টান চলে আসে তার সামনে। ওসমানের হাতে খঞ্জর আর খৃস্টান সৈনিকটির হাতে তরবারী। এই বুঝি শেষ হয়ে গেল ওসমান। হঠাৎ– নিতান্ত-ই হঠাৎ একটি খঞ্জর এসে ঢুকে যায় খৃস্টান সৈনিকের পিঠে। খৃস্টান লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। ছুটে পড়ে যায় হাতের তরবারীটা। এটি রাইনির খঞ্জর। ওসমানকে তরবারীর আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য রাইনি খঞ্জর সেঁধিয়ে দিল তার এক স্বজাতির পিঠে। ছুটে আসে আরেক

খৃস্টান। তুলে নেয় মাটিতে পড়ে থাকা তরবারীটা। ঝাপিয়ে পড়ে রাইনির উপর।

রাইনির সাহায্যে এগিয়ে যায় ওসমান। মোড় ঘুরিয়ে দাঁড়ায় খৃস্টান। আঘাত হানে ওসমানের উপর। তরবারীর আঘাত খেয়ে ওসমান পড়ে যায় মাটিতে। শহীদ হয়ে যায় ওসমান।

একজন একজন করে শহীদ হয়ে গেছে সব ক'জন জানবাজ। বেঁচে আছে শুধু দু'জন। দু'টি মেয়ে। খৃস্টানদের ঘেরাওয়ে এখন আবদ্ধ তারা। হাতে তাদের খঞ্জর। ঘেরাও সংকীর্ণ হয়ে আসে ধীরে ধীরে। খৃস্টানরা অস্ত্রসমর্পণ করতে বলে তাদের। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে অসহায় মেয়ে দু'টো। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে চোখের ইশারায়। জীবন্ত ধরা খাওয়া যাবে না। আত্মহত্যা করে হলেও খৃস্টান পশুদের হাত থেকে সম্ভ্রম রক্ষা করতে হবে। রক্ষা করতে হবে সতীর্থদের।

মুহূর্তের মধ্যে হাতের খঞ্জর বুকে স্থাপন করে মেয়ে দু'টো। তারপর সেঁধিয়ে দেয় নিজ নিজ হৃদপিন্ডে। একই সময়ে দু'জন ধড়াম করে পড়ে যায় মাটিতে।

খৃস্টানদের হাতে আহত অবস্থায় বন্দী হয় রাইনি। ওসমানকে বাঁচাতে পারল না মেয়েটি। এই দুঃখে পাগলের মত হয়ে গেছে সে।

দুর্গের দেয়াল ভাঙ্গার আশা শেষ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে ভিতরের মুসলমানদের তৎপরতা। শহীদ হয়ে গেছে আইউবীর প্রেরিত পনেরজন জানবাজ। শাহাদাতবরণ করেছেন বারজিস।

কিন্তু শুধু এ ক'জন-ই সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর একমাত্র ভরসা নয়। কার্ক দুর্গের পতন ঘটিয়ে-ই ছাড়বেন তিনি। অবরোধের সবেমাত্র দ্বিতীয় দিন। অপরদিকে খৃস্টনরাও সংকল্পবদ্ধ। কার্ক দুর্গের দখল তারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর হাতে ছাড়বে না কিছুতে-ই।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত
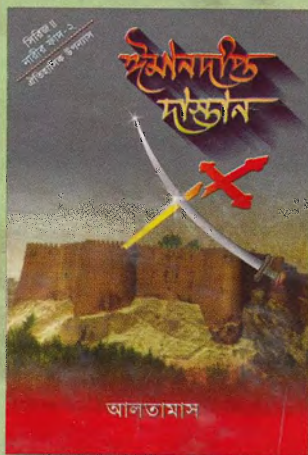
দুনিয়া থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃষ্টানরা। অর্থ-মদ আর রূপসী নারীর ফাঁদে আটকিয়ে ঈমান ক্রয় করতে শুরু করে মুসলিম আমীর ও শাসকদের। একদল গাদ্দার তৈরী করে নিতে সক্ষম হয় তারা সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে। সেই স্বজাতীয় গাদ্দার ও বিজাতীয় ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যান ইতিহাসশ্রেষ্ঠ বিজয়ী বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তাঁর সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবিরাম যুদ্ধের নিখুঁত শব্দ চিত্রায়ন 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'। বইটি শুরু করার পর শেষ না করে স্বস্তি নেই। সব বয়সের সকল পাঠকের সুখপাঠ্য বই। ইতিহাসের জ্ঞান ও উপন্যাসের অনাবিল স্বাদ। উজ্জীবিত মুমিনের ঈমান আলোকিত উপাদান

আবাবীল পাবলিকেশন্স